বিদেশী
লৌকিক অলৌকিক গল্প

বিদেশী লৌকিক গল্প অলৌকিক গল্প

ভাষান্তর - সুবোধ চক্রবর্তী

কামিনী প্রকাশালয়
১১৬ আখিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা - ৯

প্রকাশক :
শ্রীশ্যামাপদ সরকার
১১৫, অখিলমিস্ত্রী লেন
কলিকাতা ৬০০০ ০৯

প্রকাশকাল :
শুভ ১লা বৈশাখ—১৩৯৮
দ্বিতীয় প্রকাশকাল :
শুভ ১লা বৈশাখ—১৪০০

প্রচ্ছদ :
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

অলংকরণ :
অমল চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর :
শ্রীবিষ্ণুপদ সামন্ত
নিউ মহাপ্রভু প্রেস
১০।১এ, ঈশ্বর ঠাকুর লেন
কলিকাতা—৭০০০ ০৬

প্রকাশকের নিবেদন

লৌকিক জগতে লোক আর লৌকিকতা নিয়েই আমরা আছি। কিন্তু প্রতিদিনের টানাপোড়েনে মাঝে মাঝে বড় হাঁপ ধরে যায়—বড় একঘেয়ে মনে হয় জীবন। আর তখনই লোক-লৌকিকতার আবহাওয়ায় থেকেই খানিকটা বৈচিত্র্যের স্বাদ পেতে উন্মুখ হয়ে ওঠে মন। অতি-বাস্তব এভাবেই হাতছানি দেয় অবাস্তবতার রহস্যঘেরা জগৎ ও জীবনকে। লোকজীবনে শুরু হয় অলৌকিকের পদচারণা।

অলৌকিকের আকর্ষণ সনাতন—অমোঘ। তাই সভ্যতার উষালগ্ন থেকে শুরু করে আজও পর্যন্ত দেশে ও বিদেশে অলৌকিক গল্পের সৃষ্টি রয়েছে অব্যাহত। এমনি কিছু বাছাই করা বিদেশী অলৌকিক স্বাদের গল্প সাজিয়েই প্রকাশ করা হল 'বিদেশী লৌকিক অলৌকিক গল্প সংগ্রহ। আশাকরি অতিবাস্তববাদী পাঠক বন্ধুদের কাছেও গল্পগুলি সমাদৃত হবে।

—শ্যামাপদ সরকার

ঃ এতে যা আছে ঃ

অদৃশ্য মানব	...	১
ভুতুড়ে বাড়ির রহস্য	...	৩৬
ভয়ঙ্কর সে লোকটা		৮০
নেকড়ের প্রেতাত্মা		৯২
পাশের বাড়ির আতঙ্ক	...	১০৩
ভালোবাসার বন্ধন		১৩৭
অভিশপ্ত আত্মা	...	১৪৮
কফিন বাহক	...	১৬৭
আর্তনাদ	...	১৭৯
রাজমুকুট রহস্য	...	১৯১

এইচ জি ওয়েলস্

আইপিং শহরে যেতে হলে ব্রাম্বলহার্স্ট স্টেশনে নামতে হয়। এদিক থেকে স্টেশনটার গুরুত্ব কম নয়। ফেব্রুয়ারীর গোড়ার দিক, ঠাণ্ডাও পড়েছে খুবই রেষারেষি করে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতে না আসতেই স্থানীয় লোকেরা ঠাণ্ডার ভয়ে যে যার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। রেলস্টেশনেও যাত্রীর ভিড় নেই। স্টেশন মাষ্টার ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে একান্তে টারেটক্কা করে টেলিগ্রাফ আদান প্রদান করছেন।

স্টেশন পোর্টারের ঘন্টাধ্বনি নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ট্রেন আসার সংকেত দিল। দু'টার ট্রেন আজ এক ঘন্টা দেরি করে আসছে। বিকট গর্জন করতে করতে দৈত্যাকৃতি ইঞ্জিনটা বিরতির জন্য দাঁড়াল অন্ধকার প্লাটফর্মে। একজনমাত্র যাত্রী ট্রেন থেকে নামল। পোর্টার ড্রাইভার ও গার্ডকে আলো দেখিয়ে এগিয়ে আসতেই যাত্রীটির মুখোমুখি হল। দেখল বিচিত্র পোষাকে সজ্জিত একটি লোক ফাঁকা প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে। লম্বাচওড়া চেহারা। প্রায় গোড়ালি পর্যন্ত নেমে আসা একটি কালো ওভারকোট তার গায়ে। মাথার টুপিটিকে টেনে দেয়া। চোখে নীল কাঁচের চশমা, আর হাতে দস্তানা।

পোর্টার কিছু বলার আগেই রহস্যজনক লোকটি একটি টিকিট তার

দিকে বাড়িয়ে ধ'রে বিশ্রী স্বরে ব'লে উঠল—'আচ্ছা, আইপিং শহরের ভাল হোটেল কোন্‌টি বলতে পার ?

পোর্টার বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে রইল। তার প্রশ্নটি আদৌ শুনতে পেয়েছে কিনা, বুঝা গেল না।

যাত্রীটি আবার পূর্বস্বরেই বলল—'আইপিং শহরের ভাল কোন হোটেলের খোঁজ দিতে পার কি ভাই ?'

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে পোর্টারটি জবাব দিল—'কোচ এ্যান্ড হর্সেস'-এ উঠতে পারেন। এ-অঞ্চলের অভিজাত সরাইখানা ব'লে এর যথেষ্ট নাম-ডাক রয়েছে। হোটেল বলতে কিছু নেই এখানে।

আমার মালগুলো যদি দয়া ক'রে স্টেশনের ঘরে রাখার ব্যবস্থা কর তবে খুবই উপকার হয়। হোটেল থেকে কাউকে পাঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করব।

স্টেশন মাষ্টারের ঘরে মালপত্র গচ্ছিত রেখে বিচিত্র পোষাকে সজ্জিত লোকটা সরাইখানার উদ্দেশে পা-বাড়াল। বরফ পড়ছে। গুঁড়ো গুঁড়ো বরফে তার কোট ও টুপি ওপর সাদা আস্তরণ জমে গেল। অন্ধকার রাত্রে কোনরকমে রথ হাতড়ে হাতড়ে সে মিসেস হল-এর সরাইখানায় হাজির হ'ল। খদ্দেররা চুল্লির কাছে ব'সে আগুন পোহাচ্ছে দেখল। মিসেস হল সদর দরজার কাছে চেয়ার পেতে ব'সে অতিথিদের আপ্যায়নে ব্যস্ত। মনটা বিষন্ন। মিঃ হল সেই কখন সওদা করতে গেছেন। ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছেন খুবই। এখনও ফিরে আসেন নি।

অদ্ভূত পোষাকে সজ্জিত লোকটা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। ঘরের সবাই বিস্ময় ভরা চোখে আগন্তুকের দিকে তাকাল। তার বিচিত্র পোষাক-আসাকের দিকেই সবার কৌতূহল। মিসেস হল চেয়ায় ছেড়ে উঠে তাকে অভ্যর্থনা ক'রে ভেতরে নিয়ে গেলেন। ওপর তলার একটা ঘর খুলে দিয়ে বললেন—'এখানে আপনি থাকবেন। আহারাদি নীচে গিয়ে করতে হবে। আর নীচে যে হলঘরটা দেখে এলেন সেখানে বিশ্রাম ও অন্য দশজনের সঙ্গে গল্পসল্প করার অধিকার আপনারও থাকবে। জামা-কাপড় বদলে একটু আয়েশ ক'রে বসুন। সময় মত খাবার ঘরে ডাক পড়বে।'

আগন্তুক সংক্ষেপে উত্তর দিল—'ধন্যবাদ'। সরাইওয়ালী চটির খট্‌ খট্‌ আওয়াজ তুলে এক তলায় চলে যাবার উদ্যোগ করলেন। আগন্তুক দ্বিতীয় কোন কথা না বলে তাঁর দিকে দুটো মোহর এগিয়ে দিল। কোন

দর কষাকষি না ক'রে আগাম দুটো মোহর দেয়ায় সরাইওয়ালী খুবই অবাক হলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তিনি ভাবতে লাগলেন—লোকটার দরাজ দিল। এমন একটা খদ্দের বহুদিন পরে পাওয়া গেল। একটু তোয়াজ টোয়াজ করে দু' চারদিনের বেশী রাখার চেষ্টা করতে হবে লোকটাকে।

কিছুক্ষণ পরে মিসেস হল পরিচালকদের ওপর দায়িত্ব না দিয়ে নিজেই চল্‌লেন রহস্যজনক খদ্দেরটাকে খাবার ঘরে নিয়ে আসার জন্য। অন্যের ওপর দায়িত্ব দিতে ভরসা হল না। কোনক্রমে অশিষ্ট আচরণ করে বসলে অসন্তুষ্ট হয়ে সকালেই হয়ত হাঁটা দেবে। তবেই সমূহ ক্ষতি।

ঘরে ঢুকেই মিসেস হল অবাক হয়ে গেলেন। চোখের সামনে চুল্লিতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। কিন্তু আশ্চর্য লোকটা না খুলেছে মাথার টুপি, না খুলেছে গায়ের এভার কোটটা। এমন কি ভেজা দস্তানা দুটোও পরাই রয়েছে। এ-অবস্থাতেই জানালায় দাঁড়িয়ে সার্শির ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আরও আশ্চর্য হলেন তার কাঁধে জমে থাকা বরফ আগুনের তাপে গলে টস্‌ টস্‌ ক'রে পড়ছে। মিসেস হল কয়েক মুহূর্ত সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে বললেন—'শুনছেন, যদি বলেন ত রান্নাঘর থেকে আপনার কোট আর টুপি শুকিয়ে নিয়ে আসি।'

লোকটা জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই ছোট্ট ক'রে জবাব দিল—'না। ধন্যবাদ। এরকমটাই আমার ভাল লাগে।' কথাটা বলেই মুখটাকে মুহূর্তের জন্য ঘোরাল। মিসেস হল তার মুখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলেন। এমন কুৎসিৎ কদর্য মুখ জীবনে দ্বিতীয়টা দেখেন নি। চোখে নীল কাঁচের চশমা। লম্বা সাদা ঝুলফি গাল ছাড়িয়ে নেমে এসেছে কোটের কলারের কাছাকাছি। মুখের আসল চেহারা বোঝে সাধ্য কার! কেবল লম্বা নাকটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কোটের বরফ গলা জলে কার্পেট ভিজে যাচ্ছে তবুও কোর্টটা খুলবে না। ব্যাপার দেখে মিসেস হল-এর গায়ে জ্বালা ধরে গেল। কাহাতক সহ্য করা যায়! অথচ মোহর দুটোর মায়ায় কড়া কথা বলতে পারছে না। এবার একটু বেশ চড়া গলায়ই বলে উঠলেন,—'মশাই' খাবার দেয়া হয়েছে। দয়া ক'রে নীচে চলুন।'

লোকটা আবার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল—'ধন্যবাদ'। মিসেস হল চটির খট্‌খট্‌ আওয়াজ তুলে সিঁড়ি-বেয়ে নামতে শুরু করলে লোকটা ফিরে

দাঁড়াল। লম্বা লম্বা পায়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে এল।

আগন্তুক খাবার ঘরে আসতে দেরী করায়, অপেক্ষা ক'রে ক'রে নিজেই থালায় খাবার সাজিয়ে মিসেস হল ওপর-তলায় নিয়ে চললেন। এমন একটা দিল দরিয়া খদ্দের, কিছুদিন থাকার মতলব নিয়েই এসেছে বোধ হয়। তোয়াজ ত একটু করতেই হবে। ঘরে ঢুকেই তিনি দেখতে পেলেন অতিথি আচমকা সরে বসল মনে হ'ল। কোন একটা কিছুকে আড়াল করার জন্যই বোধ হয় হঠাৎ এমন আচরণ করল। মুহূর্তের জন্য টেবিলের তলায় সাদামত কি যেন দেখলেন। ব্যস. পরমুহূর্তেই ভোঁ ভোঁ। চোখের পলকে উবে গেল।

আগন্তুক ইতিমধ্যে টুপি ও ওভারকোটটা খুলে ফেলেছে। চুল্লির কাছে একটা চেয়ারে মেলে দিয়েছে। চুল্লির ঢাকনার ওপর তার জবজবে ভিজে জুতো জোড়া রেখেছে শুকোবার জন্য। মিসেস হল এর বুকটা ধড়াক্ করে উঠল। কী কেলেঙ্কারীরে বাবা! ইস্পাতের ঢাকনার ওপর ভেজা জুতো! সামান্য এগিয়ে বল্লেন—'এমন ভেজা জিনিসগুলো নিয়ে রান্নাঘর থেকে শুকিয়ে নিয়ে আসি, কেমন?' লোকটা কাঁপা-কাঁপা গলায় ছোট উত্তর দিল টুপিটা নেবেন না।' তার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেই মিসেস হল সচকিত হয়ে পড়লেন। আচমকা একটা হোঁচট খেলেন যেন। কথা বলার শক্তিটুকুও হারিয়ে বসেছেন। এমন কি দেখলেন হঠাৎ? দেখলেন আগন্তুক মুখের নীচের দিকটা একটা তোয়ালে চাপা দিয়ে রেখেছে। এটা হোটেলের নয়। তার নিজেরই। গলা দুটো ও চিবুক পুরোপুরি ঢেকে রাখার চেষ্টা বুঝতে অসুবিধে হ'ল না তাঁর। আর অবাক হলেন, যখন দেখলেন, নীল-চশমাটা বাদ দিয়ে গোটা কপালটাই ব্যাণ্ডেজের কাপড় জড়ানো। আবার দুটো ব্যাণ্ডেজ কান দুটাকেও ঢেকে দিয়েছে। কেবল লম্বা-উঁচু নাকটা চকচক ঝকঝক করছে। সব মিলিয়ে লোকটার মুখশ্রী কল্পনাতীত অদ্ভুত আকৃতি ধারণ করেছে। এরকম কিম্ভুতকিমাকার মুখ চোখের সামনে দেখবেন, স্বপ্নেও ভাবেন নি তিনি। আগন্তুক আবার বলল—'টুপিটা থাক।'

টুপিটা চেয়ারে রাখতে রাখতে মিসেস হল কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করলেন—'আমি কি ছাই জানতাম মশাই—'এবার কি বলবেন গুছিয়ে উঠতে না পেরে তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। তিনি একটু অন্ততঃ লক্ষ্য করলেন, আগন্তুক শুষ্ক কন্ঠে বিরক্তির সঙ্গে কথাটা বলেই অবার

জানালার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

মিসেস হল টুপিটা নেবার চেষ্টা করলেন না। কোটটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বললেন—'এটা এক্ষুনি রান্নাঘর থেকে শুকিয়ে নিয়ে আসছি। দরজা দিয়ে বেরোতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, আগন্তুক তোয়ালে দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কপালটাকে আড়াল করার চেষ্টা করছে। সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে আপন মনে ব'লে উঠলেন—'এ কী অদ্ভুত কাণ্ডরে বাবা! এরকম ত বাপের জন্মেও দেখিনি।'

আগন্তুক নিশ্চল নিথর পাথরের মূর্তির মত ঠায় বসে। সরাইওয়ালীর পায়ের শব্দের দিকে উৎকর্ণ হয়ে রইল। অবাঞ্ছিত চটির শব্দটি মিলিয়ে যেতে সে মুখের তোয়ালেটা সরিয়ে ফেলল। এবার আহারে মন দিল। এক সময় হাতের চামচটা রেখে আচমকা উঠে দাঁড়াল। জানালাটা বন্ধ করল। দরজায় শিটকিনি টেনে দিল। এবার নিশ্চিন্তে আহার করতে লাগল।

মিসেস হল রান্নাঘরে কাজ করতে করতে নতুন খদ্দেরটার কথা ভাবতে লাগল—'বেচারী নির্ঘাৎ দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল। তবে ত কাটাকাটি করতে হয়েছিল! খুবই কষ্ট গেছে! ব্যান্ডেজটা দেখে আমার বুকের মধ্যে একেবারে ধড়াস ক'রে উঠেছিল! ঐ নীল-চশমাটা! সব মিলিয়ে তাকে মানুষের মতই লাগছিল না। ঠিক যেন একটা ডুবুরি পোষাক পরে সামনে দাঁড়িয়ে। আর মুখে? হ্যাঁ, মুখেও অস্ত্র চালাতে হয়েছিল। নইলে তোয়ালেটাকে কিছুতেই সরাচ্ছিল না কেন?

মিসেস হল কৌতূহল বশতঃ আবার পা টিপে টিপে আগন্তুকের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। দরজার ফাঁকে চোখ লাগিয়ে দেখলেন—লোকটা চেয়ারটাকে ঘরের একেবারে কোণে নিয়ে গিয়ে জানালার দিকে মুখ ক'রে বসে। চুল্লির আগুনের আলো তার চশমার নীল-কাঁচে পড়ে অদ্ভুত দেখাচ্ছে ভাবলেন, মারাত্মক রকমই জখম হয়েছে মুখটা। নইলে চুরুট খাওয়ার সময়ও তোয়ালেটা মুখ থেকে সরাচ্ছে না কেন? ব্যাণ্ডেজের কাপড়ে যাতে আগুন না লাগে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে, বুঝতে পারলেন।

দরজার কড়া নাড়লেন এবার। আগন্তুক চেয়ার ছেড়ে উঠে শিটকিনি নামিয়ে দরজা খুলে দিল। মিসেস হল হাতের কোটটা আগন্তুকের দিকে

এগিয়ে দিলেন।

আগন্তুক তেমনি কর্কশ স্বরে বল্‌ল—'স্টেশনে আমার কিছু মালপত্র রয়েছে। কাউকে একটা গাড়ী দিয়ে পাঠিয়ে সেগুলো আনিয়ে দিলে উপকার হয়।

' কাল সকালে আনা যাবেখন। একে দুর্যোগের রাত্রি। তার ওপর কেমন ঘন ঘন চড়াই-উৎড়াই, দেখেছেনই ত। যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।' দুর্ঘটনার কথাটা তিনি জোর করেই টেনে আনলেন যেন।

'—হ্যাঁ, বলেছেন ঠিকই। দুর্ঘটনা ঘটে। যে কোন মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে। আর সারতে কতদিন লাগবে কে বলতে পারে?'

'—আমার বোন-পো টম এর কথাই ধরুন না। কাস্তে দিয়ে হাতটা ফেলল কেটে। মাস খানেক হাতটা বেঁধেই রাখতে হয়। আমি ত ভেবেছিলাম, বুঝি অস্ত্রই করতে হবে।

আচমকা একটা খ্যাক্‌ খ্যাক্‌ শব্দ মিসেস হল-এর কানে এল। কিসের শব্দ? বুঝতে বেশ দেরীই হল, সে আগন্তুক এমন বিচ্ছিরি শব্দ করে হাসছে। একবার নিজেকে একটু সামলে নিয়ে মিসেস হল বললেন—হাসির কথা নয় মশাই। সেই থেকে ব্যাণ্ডেজ সম্বন্ধে ভাল ধারণা হয়ে গেছে আমার।

লোকটার সব কিছুই অদ্ভুত। যতসব বিশ্রী স্বভাব রপ্ত ক'রে নিয়েছে। হঠাৎ অদ্ভুত স্বরে ব'লে উঠল—'একটা দেশলাই এনে দেবেন? চুরুটটা নিভে গেল দেখছি।

মিসেস হল মনে মনে ব'লে উঠলেন—'কী অভদ্র লোক রে বাবা। দেশলাই ছাড়া এমন একটা মুহূর্তে আর কোন কথাই খুঁজে পেল না! পরমুহূর্তেই নগদ দুটো মোহরের কথা মনে পড়ে গেল। ছুটলেন দেশলাই আনতে।

দেশলাই পেয়ে আগন্তুক মিসেস হলকে ছোট্ট করে ধন্যবাদ দিল সত্য! কিন্তু তার ভাইপো টম-এর দুর্ঘটনার কথা উত্থাপনের সুযোগ দিল না। মোটেই। মিসেস হল বুঝলেন, ঝোপ বুঝে কোপটা দিয়েছেন তিনি। ব্যাণ্ডেজের প্রসঙ্গ উঠতেই লোকটা মিইয়ে যায়।

পাখীর ডাকে সকাল হ'ল। মিসেস হল লোক পাঠিয়ে স্টেশন থেকে আগন্তুকের মালপত্র আনিয়েছেন। মালপত্র বলতে দুটো কাঠের বাক্স।

গায়ে খড় লেগে রয়েছে। কাঁচের শিশি বোতল আছে হয়ত। মিসেস হল ব্যস্ত পায়ে আগন্তুককে খবরটা দেয়ার জন্য ছুটলেন। সিঁড়ির কাছে যেতেই তাঁর নিকটতম প্রতিবেশী মিঃ ফারেনসাইট-এর সঙ্গে দেখা। সঙ্গে কুকুর নিয়ে বেড়াতে এসেছেন। কুকুরটা রোজ যখন তখন সরাইখানায় আসে। খায় শুয়েও থাকে দীর্ঘ সময় ধরে। আজ কিন্তু একটা বিশ্রী কাণ্ড করে বসল। বিচিত্র পোষাক পরা আগন্তুকটির পা কামড়ে ধরল। লোকটা উপায়ন্তর না দেখে তার পেটে সজোরে এক লাথি বসিয়ে দিল। ব্যাপার দেখে মিঃ ফারেনসাইট হাতের লাঠিটা দিয়ে কুকুরটাকে মারতে লাগলেন। কুকুরটা দৌড়ে খড়ের গাদার নীচে গিয়ে ঘাপটি মেরে রইল। মিসেস হল-এর স্বামী অনেক রাত্রে ফিরেছিলেন। তাই একটু বেলা পর্যন্ত নাকে-মুখে কম্বলচাপা দিয়ে আয়েশ করছিলেন। চীৎকার চেঁচামেচি শুনে বিছানা ছেড়ে দৌড়ে সেখানে এলেন। ব্যাপার শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে যেতে যেতে বললেন—কী কেলেঙ্কারী কাণ্ড। দেখি কি ব্যাপার। দরকার হলে এক্ষুনি ডাক্তার ডাকতে হবে।' ঘরের সামনে হাজির হলেন। দরজা বন্ধ। সামান্য ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকলেন তিনি। আচমকা ঘরের ভেতরে দৃষ্টি ফেরাতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দেখলেন কোন অবলম্বন ছাড়াই একটা জামা ঝুলছে। শুধু কি এ-ই! পর মুহূর্তেই জামাটা অবিশ্বাস্য ভাবে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক সময় জামাটা তাঁর দিকে এগিয়ে এসে তাঁর মুখে আচমকা ঝাপ্‌টা মেরে বসল। তিনি আপন মনে ব'লে উঠলেন—'একী ভূতুরে কাণ্ডরে বাবা! দ্বিতীয় বার ধাক্কা খেয়ে তিনি একেবারে দরজার বাইরে গিয়ে পড়লেন। ব্যস, তাঁকে অবাক ক'রে দিয়ে দরজাটা রহস্যজনক ভাবে বন্ধ হয়ে গেল। ভীত-সন্ত্রস্ত পায়ে তিনটি ক'রে সিঁড়ির এক সঙ্গে ডিঙিয়ে তিনি নীচে নেমে এলেন। ভূ ভূ—উ ছাড়া আর একটা অক্ষরও বাড়িতে উচ্চারণ করতে পারলেন না।

মিঃ হলকে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে আসতে দেখে সবাই আতঙ্কিত হয়ে ছুটে এলেন। ঘরে ঢুকেই মিঃ হল আরাম কেদারায় শরীর এলিয়ে দিলেন।

সংজ্ঞা হারিয়ে ফেল্‌লেন। অনেক চেষ্টা করে, ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে তাঁকে চাঙ্গা করে তোলা হল। অবিশ্বাস্য ব্যাপার, সবাই বললেন। ভূত সে জামাটার ওপর ভর ক'রে তাকে ধাক্কা মেরে ঘরের বাইরে ফেলে দিয়েছে

একথা বলতেও দ্বিধা করলেন না তিনি। তাঁর কথা সবাই হেসে উড়িয়ে দিলেন। তার স্ত্রী ঝাজালো গলায় বলে উঠলেন—'বুড়ো মানুষ ভূত ভূত করে মরল দেখছি। যাকে দেখতে গেলে কেমন দেখলে তাকে। ক্ষতস্থান দিয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে কি? তার কথা শেষ হতে না হতেই কুকুরটা আবার খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ শুরু করে দিল। দেখা গেল, আগন্তুক পোষাক বদলে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। মিসেস হল চোখে উৎকণ্ঠার ছাপ এঁকে বল্লেন—'ভাল আছেন ত? তেমন কিছুই হয়নি ত আপনার।'

'—ধ্যুৎ, এসবে আমার কিছু হয় না।' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে লোকটা বলল। কুলীকে মালপত্র সমেত কাঠের পেটী দুটো ওপরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে আবার সে ওপরে উঠে গেল।

সকাল আটটায় মিসেস হল প্রাতঃরাশ নিয়ে ঘরে ঢুকে চমকে উঠলেন। দেখলেন, ঘরের মেঝে চেয়ার ও টেবিলে সর্বত্র বিভিন্ন মাপের শিশি-বোতল ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তিনি খাবারের ট্রেটা রাখার জায়গা পর্যন্ত ফাঁকা পেলেন না। অদ্ভুত পোষাক পরিহিত আগন্তুক জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ মিসেস হল-এর দিকে মুখ ফেরাতেই দেখতে পেলেন. তার চোখে নীল চশমাটা এখন আর নেই। ব্যস্ত হাতে চশমাটা চোখে পরতে-পরতে বেশ কড়া সুরেই বল্ল—'আপনাকে ত কালই বলে দিয়েছিলাম। আমার অনুমতি ছাড়া কেউ যেন এ ঘরে না ঢোকে।

মিসেস হল জোর ক'রে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে বল্লেন—'অনুমতি ঠিকই চেয়েছিলাম। আপনি হয়ত শুনতে পাননি।'

—ঠিক আছে। এবার আমাকে একটু কাজ করার সুযোগ দিলে উপকৃত হ'ব।' মিসেস হল চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাইরে যেতে না যেতেই সশব্দে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

তিনি সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতে গিয়েও থমকে গেলেন। হঠাৎ ঘরের ভেতরে শিশি বোতল ভাঙার ঘন ঘন আওয়াজ হতে লাগল। আর ঘরের ভেতর থেকে টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসতে লাগল—'না, আর পারছি না আমি! 'এত ধৈর্য আমার নেই।' এবার কি কথা হ'ল মিসেস হল বুঝলেন না। এবার শুনলেন—'অসম্ভব! আমি পারব না।' 'তবে আমাকে এর হাত থেকে কে রক্ষা করবে?' ব্যস, তারপরই সব চুপচাপ।

বিকেলে চা-এর কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে মিসেস হল চৌকাঠের

কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দেখেন ঘরময় ভাঙা শিশি-বোতল ছড়ানো। চোখে-মুখে বিরক্তির ছাপ এঁকে তিনি বললেন—'এ-ত মহা সমস্যায় পড়া গেল দেখছি মশাই! সকালে দেখলাম, ঘর ভর্তি শিশি-বোতল। আবার এখন দেখছি মুড়ি-মুড়কির মত কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে রেখেছেন। এমন করলে কি করে পারা যাবে, বলুন ত!

নির্বিকার স্বরেই আগন্তুক জবাব দিল—'আপনার ঘরের ক্ষতি হলে বলুন। কত ক্ষতি পূরণ দিতে হবে বিল পাঠিয়ে দেবেন। কানাকড়ি পর্যন্ত মিটিয়ে দেব।'

'—ক্ষতি পূরণের কথা নয়। উচিত—অনুচিতের কথা বলছি মশাই।' কথা বলতে বলতে মিসেস হল সশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

গ্রাম্য ঘড়ির কারিগর মিঃ হামফ্রে আর মিঃ ফারেনসাইট কথা বলছেন। ফারেনসাইট কথা প্রসঙ্গে বললেন—'আমার বিশ্বাস, লোকটার গায়ের রঙ কাফ্রিদের চেয়ে কোন অংশে কম কালো নয়। সকালে আমার কুকুরটা কামড়ে তার প্যাণ্টের অনেকখানি ছিঁড়ে দিয়েছিল। তখন সে-ফাঁক দিয়ে তার গায়ের রঙ দেখতে পেয়েছিলাম। নাকটা লালচে। ঘোড়ার গায়ে যেমন ছোপ ছোপ থাকে ঠিক সেরকম। জ্ঞান—বুদ্ধিও ঘোড়ারই মত বটে।

এদিকে নবাগত অতিথি 'কোচ এ্যাণ্ড হর্সেস' সরাইখানায় মহাসুখে দিন কাটাতে লাগল। তার অসঙ্গত আচরণের জন্য মিসেস হল-এর সঙ্গে ছোটখাট মতবিরোধ ও কথা কাটাকাটি হয় মাঝে মাঝে। তবে তার কাজ-কর্মের অসুবিধা তেমন কিছু হয় না। কিন্তু তার কি কাজ, বোঝার উপায় নেই। নিতান্ত প্রয়োজনে একমাত্র মিসেস হল'কে তার ঘরে যাবার অনুমতি দেয়া আছে। কাজ সেরেই চলে যেতে হবে। এক মুহূর্ত অতিরিক্ত সময় থাকলে বিরক্ত হয়। মিসেস হল যেটুকু বুঝেছেন, তার যত কাজ শিশি-বোতল নিয়ে। তবে বোতলগুলো খালি নয়। গুঁড়ো, ছোট-ছোট বিভিন্ন রঙের দানা বা তরল কিছু না কিছু প্রত্যেকটাতে আছেই। শিশি-বোতল ছাড়া কিছু বিভিন্ন মাপের কাঁচের দণ্ড, টেষ্ট-টিউব, বকযন্ত্র, দাড়িপাল্লা প্রভৃতির সংখ্যাও কম নয়। টেষ্ট টিউবে তরল ঢেলে স্পিরিট ল্যাম্পে জ্বাল দেয় দীর্ঘ সময় ধরে আবার

আবার টেস্ট টিউবে কিছু গুঁড়ো নিয়ে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে। দীর্ঘ সময় ধরে। পরমুহূর্তেই ঝন্‌ঝন্‌ করে শিশি-বোতল ভাঙার শব্দ শোনা যায়। রুক্ষ-রুষ্ঠ পুরুষকণ্ঠ শোনা যায়, বিলে তুলে দাও। তুমি দাও বলছি।

এদিকে আইপিং-এ একটা গুজব ছড়িয়ে পড়েছে 'কোচ এ্যাণ্ড হর্সেস' সরাইখানায় এক ফেরারী আসামী আত্মগোপন ক'রে রয়েছে। মারাত্মক অপরাধের আসামী সে। সে চোখে নীল-চশমা আর ব্যাণ্ডেজে মুখ বেঁধে পুলিশের চোখে ধুলো দেবার চমৎকার তলব ফেঁদেছে লোকটা।

একদল যুবক স্থির করল সরাইখানার রহস্যময় লোকটার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে নালিশ করবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা জিজ্ঞেস করলে কি জবাব দেবে? তবে এটুকু ত বলা যায় —জুলফি, ব্যাণ্ডে আর নীল-চশমায় মুখ ঢেকে রেখে লোকটা সবার মনে রহস্যের সঞ্চার করছে। গবেষক বলে সবাইকে ধোঁকা দিচ্ছে। কিন্তু এসব ধোঁকা টিকবে কি? গত কয়েক মাস ধরে কাছে কোথাও কোন হত্যাকাণ্ড ঘটেনি। বড় রকমের ডাকাতির খবরও নেই। এসব ভেবে কেউ আর পুলিশের কাছে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত হ'ল না। অতএব লোকটা নিশ্চিন্তে স্পিরিট ল্যাম্প জেলে মনের আনন্দে শিশি-বোতল নাড়াচাড়া করতে লাগল। আবার এদিকে প্রাপ্যের চেয়ে বেশী অর্থ দিয়ে মিসেস হল-এর মুখ বন্ধ করে রেখেছে। তিনি তার খদ্দেরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে গিয়ে বলেন—ব্যাণ্ডেজ আছে ত কি হয়েছে? নানা বিস্ফোরক পদার্থ নিয়ে গবেষণা করতে গেলে যেকোন সময় মুখ পুড়ে যেতেই পারে। তার প্রতি সহানুভূতি না জানিয়ে তোমরা তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে নিষ্ঠুরতারই পরিচয় দিচ্ছ।' এরকম ঝাঁঝালো কথা তিনি কেবলমাত্র যুবকদের উদ্দেশ্যেই নয়, ফারেনসাইট ও হামফ্রে প্রভৃতি প্রবীণ ব্যক্তিদেরও এরকম কড়া কথা বলতেও দ্বিধা করলেন না। এবার আইপিং-এর ওষুধ-ব্যবসায়ী মিঃ কাস যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। হোটেলের আগন্তুক গবেষককে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে তার মুখোশ খুলে দেবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন তিনি।

মিসেস হল-এর কাছে মিঃ কাস তাঁর উদ্দেশ্যের কথা বললে তিনি তেমন আপত্তি করলেন না। তবে তাঁকে সতর্ক ক'রে দিতে গিয়ে

বললেন—'তা যা-ই করুণ মশাই, সাবধানে কাজ করবেন। লোকটা খুবই বদ-মেজাজের। একবার চটে গেলে আর রক্ষে থাকবে না! আর কিছু না হোক একটা বোতল ছুঁড়ে মারলেও অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। সাবধানে থাকবেন।

এদিকে একটা সুযোগ অপ্রত্যাশিতভাবে মিঃ কাস-এর হাতে এল। ছোট্ট একটা হাসপাতাল আইপিং-এ রয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোন নার্স হাসপাতালের জন্য দিচ্ছেন না। তাই স্থানীয় অধিবাসীরা চাঁদা তুলে একজন নার্স নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ওষুধের দোকানদার হিসাবে মিঃ কাস-এর ওপর অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব রয়েছে। চাঁদা চাওয়ার অজুহাতে সরাইখানার রহস্যময় লোকটার কাছে হাজির হবেন মনস্থ করলেন তিনি। যেকোন লোকের কাছেই এরকম একটা মহৎ কাজের জন্য চাঁদা চাইতে যাওয়া যায়। এ নিয়ে রোষ প্রকাশের কোন সুযোগ নেই। তবে চাঁদা দেয়া না দেয়ার ব্যাপারটা তার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে, সত্য বটে। তিনি চাঁদা চাইতে যাওয়ার আগে মিসেস হল এর কাছে লোকটার নাম জিজ্ঞেস করলেন। ভদ্রমহিলা পড়লেন, মহাফাঁপড়ে। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য ত বটেই। সরাইখানায় এতদিন রয়েছে লোকটা। অথচ তার নামটা পর্যন্ত জানা নেই, কথাটা বলতেও কেমন শোনায়। মিঃ কাস বললেন—'ঠিক আছে, আমি কৌশলে তার নামটা জেনে নেব'খন।'

অদ্ভুত পোষাকধারী লোকটার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মিঃ কাস বললেন—'অনধিকার প্রবেশের জন্য ক্ষমা করবেন।' কথা বলতে বলতে চৌকাঠ ডিঙিয়ে তিনি ভেতরে ঢোকামাত্র দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। মিসেস হল গুটিগুটি এসে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। দরজায় কান লাগিয়ে তিনি শুনলেন হঠাৎ কে যেন চীৎকার ক'রে উঠল। চেয়ার ছুঁড়ে মারার বিকট শব্দ হ'ল। পরমুহূর্তেই কর্কশ হাসির শব্দ শোনা গেল। তারপরই ছিন্ন-বিছিন্ন বেশ বাস নিয়ে সন্ত্রস্ত চোখে মিঃ কাস দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এলেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে রীতিমত হাঁপাতে লাগলেন। বাইরে দাঁড়ানো মিসেস হলকে একটা কথা না বলেই উর্দ্ধশ্বাসে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

মিসেস হল শুনলেন, ঘরের ভেতরে তাঁর খদ্দের বিকট স্বরে অনর্গল হেসেই চলেছে। সে একবার দরজার কাছে চলে এসেছিল। কিন্তু আশ্চর্য

ব্যাপার ! তার মুখটা মোটেই দেখতে পেলেন না ।

এদিক মিঃ কাস সরাইখানা থেকে বেরিয়ে লম্বা লম্বা পায়ে গীর্জার পাদরী বার্নটিং-এর কাছে ছুটলেন, তাঁর সামনে হাজির হয়ে কোনরকম ভূমিকা না করে বলে উঠলেন—'আমাকে দেখে কি পাগল বলে মনে হচ্ছে ?'

—'কি ? কি ব্যাপার বল ত ?'' পাদরী মশাই বললেন ।

'—বলছি তবে শুনুন, কোচ এ্যান্ড হর্সেস' সরাইখানায় গিয়েছিলাম । সরাইয়ের মালিকানি সে লোকটার নাম পর্যন্ত জানেন না । অথচ লোকটা একমাসের ওপরে তাঁর কাছে রয়েছে । অবাক কান্ড ! যাই হোক আমি গুটি গুটি তার ঘরে ঢুকে গেলাম । আমি চাঁদার কথা পাড়লাম লোকটার কাছে । আমাকে দেখেই হতচ্ছাড়াটা হাত দুটো পকেটে ঢুকিয়ে দিল । ব্যাপারটা এমন আমি যেন তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে জোর ক'রে চাঁদা আদায় করব । আমি হাসপাতাল সরকার নার্স দিতে নারাজ, চাঁদা তুলে নাম রাখার পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করতেই লোকটা নাক দিয়ে অসভ্যের মত বিশ্রী একটা শব্দ করল । আমি তবু তোয়াজ করতে লাগলাম 'শুনেছি, আপনি একজন বৈজ্ঞানিক । এবার মুখে কর্কশ শব্দ করল কি ? ও হ্যাঁ । ব্যস আবার সেই নাকের শব্দ । খুব সর্দি হলে যেমন হয় । সে কী নাক টানা ! আবার নার্সের কথায় ফিরে গেলাম । আর চোখের মণি দুটো ঘরময় ঘুরিয়ে সব কিছু দেখে নিতে লাগলাম । দেখলাম, কেবল শিশি-বোতলের ছড়াছড়ি । লোকটা তেমনি কর্কশ স্বরে এবার —'ঠিক আছে ভেবে দেখি ।' আমি এবার সাহসে ভর ক'রে বলে উঠলাম —'গবেষণা করছেন বুঝি ? লোকটার মুখে গভীর বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠল । আমি বললাম—'কিসের গবেষণা ? ডাক্তারী ব্যাপার স্যাপার বুঝি ? ব্যস আর যাবে কোথায় ! লোকটা এবার রীতিমত গর্জে উঠল —'কি ব্যাপার, বলুন ত মশাই ! কি জানতে চাইছেন ? আবার বিশ্রী স্বরে নাক টানল । খোলা জানালা দিয়ে দমকা বাতাস এসে টেবিল থেকে একটা কাগজ উড়িয়ে নিচ্ছিল । লোকটা ব্যস্ত হয়ে হাত উঁচু করে কাগজটা ধরার চেষ্টা করল ।

পাদরী বার্নটিং বললেন—'হাত উচু করে কাগজটা ধরার মধ্যে কোন বিশেষত্ব ছিল বলে কি তোমার মনে হয় ?'

—'দেখুন জামার হাতার মধ্যে হাত থাকলে অনেক সময় কারো তেমন

তেমন কিছু লক্ষ্য করার মত থাকে না। কিন্তু হাতের পরিবর্তে যদি কেবল মাত্র একটা আস্তিন যদি সোজা ওপরে উঠতে থাকে? তবে? তবে কি ব্যাপারটা আতঙ্কের সঞ্চয় করে না?

'এবার বুঝছি, কেন তুমি একটু আগে জিজ্ঞেস করেছিলে, তোমাকে পাগলের মত দেখাচ্ছে কিনা? এখন বলছি, পাগলের মতই কথা বলছ তুমি।'

'—তা আপনি বলতে পারেন। কিন্তু আমি কানা নই। পরিষ্কার দেখেছিলাম, কেবল একটা খালি আস্তিন সোজা ওপরে উঠে গিয়েছিল। মানুষের হাত বা পা না থাকাটা একেবারে অস্বাভাবিক কিছু নয়। দুর্ঘটনায় কাটা পড়তে পারে। কিন্তু আস্তিনের ভেতরে কাঠের হাত পর্যন্ত ছিল না। খালি আস্তিনটা খাড়াভাবে ওপরে উঠে গিয়েছিল।'

'পাদরী বার্নটিং বিদ্রূপাত্মক সুরে বললেন—খালি আস্তিন বুঝি।

মিঃ কাম ব'লে চললেন—'যাক, যে কথা বলছিলাম, আস্তিনটা উড়ন্ত কাগজটাকে ধরতে পারল না। সেটা উড়তে উড়তে ওপরের দিকে উঠে হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। ব্যস, লোকটি গর্জে উঠল—কাগজটা গেল ত! আমার দুর্বুদ্ধি মাথায় চাপল। ব'লে উঠলাম—'ঈশ্বরের রক্ষা করুণ! লোকটা এবার যেন আমার দিকে নজর দেয়ার সুযোগ পেল। চশমার ফাঁক দিয়ে কটমট ক'রে তাকাল। আমি কাণ্ড জ্ঞান হারিয়ে এবার আরও বোকামির পরিচয় দিলাম—'অবশ্যই কোন ডাকিনী শক্তির সাহায্যে আপনি খালি আস্তিনটা এমন অদ্ভুত ভাবে শূন্যে তুলেছিলেন, বলবেন কি?'

রীতিমত রাগত স্বরেই লোকটা জবাব দিল—'তাই নাকি? খালি আস্তিন, ভালভাবে দেখেছিলেন কি? অ্যাঁ? —বলছেন কি মশাই! কথা বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমিও আতঙ্কিত হয়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালাম। লোকটা ধীর পায়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে পড়ল। তেমনি বিশ্রীভাবে নাকে আওয়াজ করল। কর্কশ স্বরে বলে উঠল আপনি তবে বলছেন, আস্তিনের ভেতরে কিছু নেই! কথা বলতে-বলতে পকেট থেকে আস্তিন টেনে বের করল। সোজা ওপরের দিক তুলে দিয়ে এবার বলল 'দেখুন ত, কিছু আছে কিনা ভেতরে? আমি ভয়ে ভয়ে বললাম—'নেই-ই ত। কিছুই নেই।' লোকটা তীব্র আওয়াজ করে নাক টানল। ব্যস, অতর্কিতে খালি আস্তিনটা আমার দিকে

বাড়িয়ে দিল। জোর করে মনে সাহস আনলাম। মুহূর্তের মধ্যে যেন আস্তিনের মধ্যে থেকে দুটো আঙুল বেরিয়ে এসে আমার নাকটাকে সজোরে চেপে ধরল। ভয়ে আমি মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম।

পাদরী বার্নটিং তাঁর কথায় ফিক করে হেসে ফেললেন। মিঃ কাস রেগেমেগে বলে উঠলেন—'আশ্চর্য ব্যাপার ত। খালি আস্তিনের ভেতর থেকে দুটো আঙুল বেরিয়ে এসে আমার নাকটাকে টেনে উপড়ে আনার জোগাড় করল। আর আপনি কিনা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। আমার মত পরিস্থিতিতে পড়লে পিতৃপুরুষের নাম ভুলে যেতেন। আমিও ছেড়ে কথা বলিনি। আস্তিনের ওপর সজোরে এক ঘুষি ঝেড়ে সোজা দৌড় মারলাম। সত্যি বলতে কি, মনে হল রক্ত মাংসের হাতের ওপরই যেন ঘুষিটা মারলাম।

পাদরি হেসে বল্‌লেন—'গল্পটা রোমাঞ্চকরই বটে। বেশ জমাটে। আসলে বার্নটিং একজন পাদরী। ভূত-প্রেতে বিশ্বাস মোটে নেই। অতএব সত্য যতই থাক, বিশ্বাস করা তাঁর পক্ষে মুশকিল। মিঃ কাস হতাশ মনে গীর্জা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। এবার ওষুধের দোকানে বসেই আইপিং এর লোকের কাছে কাহিনীটা বার বার বলতে লাগলেন। অবিশ্বাসী কিছু লোক থাকলেও অধিকাংশ লোকই তাঁর কথা বিশ্বাস করল। গ্রাম বাসীদের মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মাল। সরাইখানায় অদ্ভুত পোষাকধারী লোকটা অবশ্যই মানুষ—ভূত। ভৌতিক কাণ্ডকারখানা প্রতিনিয়ত ঘটিয়ে চলেছে।

মাঝ-রাত্রি। পাদরী বার্নটিং গভীর নিদ্রায় মগ্ন। আচমকা একটা আওয়াজে তার ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি লণ্ঠন জেবলে বাইরে বেরিয়ে এলেন ভীত সন্ত্রস্ত পায়ে। ভাবলেন, নির্ঘাৎ চোরটোরের ব্যাপার। খালি হাতে অগ্রসর হওয়া ঠিক হবে না। ঘরের কোন থেকে পাকা বাঁশের লাঠিটা নিয়ে এলেন। বারান্দা দিয়ে কিছুটা অগ্রসর হতেই অতর্কিতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। ঠিক তখনই অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটে গেল। পাদরী বার্নটিং-এর পড়ার ঘরের তালা নিজে থেকেই কড় কড় ক'রে খুলে গেল। এবার টেবিলে ড্রয়ারটা গেল আচমকা আলগা হয়ে। ঘটল আরও অবিশ্বাস্য কাণ্ড। টেবিল থেকে কয়েকটি নোট শূন্যে উড়ে গেল। শূন্যের দলা পাকালো। ব্যস, চোখের পলকে কোথায় মিলিয়ে গেল। ব্যাপারটা দেখে পাদরী সাহেব তখনও মনকে শক্ত করে

বেঁধে রেখেছেন। দেখাই যাক না শেষ পর্যন্ত কি হয়। ব্যস, তিনি হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন। কিছু বুঝবার আগেই কে যেন দ্রুত চলে গেল। হাতের লণ্ঠনটা ছিঁটকে দূরে গিয়ে পড়ল। কতক্ষণ তিনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়েছিলেন, বলা মুশকিল। যখন চোখ মেলে তাকালেন তার আগেই সূর্যের আলো বারান্দায় এসে পড়েছিল।

এদিকে মিঃ হল অভ্যাস মত খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠলেন। কৌতূহল বশতঃ ওপর তলায় গিয়ে দেখেন, অদ্ভুত লোকটার ঘর খোলা। ভাবলেন লোকটা হয়ত কাজের ঝোঁকে রাত্রে দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন। সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় অদ্ভুত একটা কাণ্ড তাঁর চোখে পড়ল। সদর দরজাটা খোলা। তাঁর স্পষ্ট মনে আছে, রাত্রে শোবার সময় নিজে হাতে দরজার খিল দিয়েছিলেন। এত ভোরে এটা তবে খুললই বা কে? তবে কি তাঁর অদ্ভূত-স্বভাবের খদ্দেরটা ঘরে নেই? আবার তার ঘরের দরজায় ফিরে গিয়ে বললেন—'ভেতরে আসব কি?' কোন জবাব নেই। কৌতূহল ও উৎকণ্ঠার সঙ্গে দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিতেই তার আত্মা খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম হল। লোকটা জামা, প্যাণ্ট, কোট সবই টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে। এমন কি মুখ বাঁধবার ব্যাণ্ডেজ ও চশমা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। লম্বা লম্বা পায়ে নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে তিনি স্ত্রীকে সব বললেন। স্বামী স্ত্রী আবার তার ঘরের দিকে ছুটলেন। হঠাৎ সদর-দরজা বন্ধ করার শব্দ শোনা গেল। তাঁরা ব্যাপারটাকে আমল না দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে লোকটার ঘরে গেলেন। হঠাৎ পিছন থেকে কার হাঁচির আওয়াজ শুনলেন মিসেস হল। ভাবলেন এটা তাঁর স্বামীরই কাজ। তিনি এবার লোকটার বিছানায় হাত দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাতটা টেনে নিতে হ'ল। বরফের মত টাণ্ডা সেটা। আচমকা ঘটে গেল রোমাঞ্চকর একটা ঘটনা। বিছানার চাদরটা লাফিয়ে শূন্যে উঠে গেল। বার কয়েক ঘুরপাক খেয়ে আবার মাটিতে পড়ল। তিড়িং তিড়িং করে লাফাল কিছুক্ষণ ধরে। এবার চেয়ারের ওপর থেকে টুপিটা উঠে শূন্যে নেচে বেড়াতে লাগল অদ্ভূত ভাবে। পরমুহূর্তেই মিসেস হল-এর দিকে তেড়ে এল সেটা। মিসেস হল দৌড়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। ব্যস, দরজাটা দড়াম্ করে বন্ধ হয়ে গেল। মিসেস হল সংজ্ঞা হারিয়ে দরজার কাছে পড়ে গেলেন। মিঃ হল দৌড়ে গিয়ে স্মেলিং সল্টের শিশিটা এনে তাঁর নাকের কাছে ধরলেন।

মিসেস হল চোখ মেলে তাকিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় ব'লে উঠলেন – ভূত! ভুল করে ভূতকে ঘর ভাড়া দিয়ে এখন নাকানি-চোবানি খেতে হচ্ছে। তা না হ'লে টুপি কখনও শূন্যে নাচানাচি করতে পারে কখনও! ব্যাপার সুবিধের বুঝছি না বাপা। স্বামীর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন —'তুমি খোঁজ খবর করে একজন ভাল ওঝাকে ডেকে আন। নইলে ভূতের নামে সরাইখানা উইল ক'রে দিয়ে আমাদের বিরাগী হয়ে কোনদিকে চলে যেতে হবে।'

মিঃ হল মুহূর্তমাত্র দেরী না করে ছুটলেন ওঝার খোঁজে। দশ-বারোটা গ্রামের মধ্যে ওঝা বলতে একজনই। নাম তার ওয়েজার্স। তাকে বলে কয়ে মিঃ হল নিয়ে এলেন সরাইখানায়। সে মিসেস হল-এর মুখ থেকে সব বৃত্তান্ত খুটিয়ে খুটিয়ে শুনল! সব শুনে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বলল—'দেখুন না কি করি এবার! ভূততো দূরের কথা, ভূতের বাবা-ঠাকুর্দা পর্যন্ত পালিয়ে যেতে পথ পাবে না! চলুন, হতচ্ছাড়াটার ঘরে যাওয়া যাক। মিঃ হল চোখ দুটো কপালে তুলে বল্‌লেন—'আমি না বাবা। আমার কথা শুনুন মিঃ ওয়েজার্স, ভূতটা আমার ওপর রেগে একেবারে কাঁই হয়ে আছে। তাই বলছি কি আমি না গেলেই ভাল হয়? কথা বলতে বলতে তিনি এক পা দু'পা ক'রে পিছোতে লাগলেন।

ওয়েজার্স কণ্ঠস্বরে কৃত্রিম তাচ্ছিল্য ক'রে, বার কয়েক ঢোক গিলে বল্‌ল—"সে না হয় আমি একাই যেতাম। কিন্তু আইনের কথা ভাবছি। একা গেলে নচ্ছাড়টা হয়ত পরে বলবে, আমার ঘরে এত হাজার ডলার ছিল, এত হাজার গিনি ছিল ইত্যাদি। তখন আমাকেও ফ্যাসাদে পড়তে হবে।

ঠিক এমন অদ্ভুত পোষাকে সজ্জিত লোকটা সিঁড়ি দিয়ে কিছুটা নেমে এল। পরমুহূর্তেই দ্রুত ওপরে উঠে গেল।

জামার কলার নাচিয়ে ওয়েজার্স বল্‌ল—'দেখলেন ত? আমি যে এসেছি নচ্ছাড় ভূতটা বুঝতে পেরে গেছে। দেখলেনই ত, কেমন কাঁপা-কাঁপি দাপাদাপি শুরু ক'রে দিয়েছে। একটু অপেক্ষা কর বাপধন। এক্ষুণি যাচ্ছি। তোমার পিণ্ড চটকে ছাড়ব। ভূতের বাপ-ঠাকুরদার দফা নিকেশ ক'রে ছেড়েছি। তুই ত কোন ছাড়! চলুন মিঃ হল, ওপরে যাওয়া যাক।'

মিঃ হল স্ত্রীর কাছে ধমক খেয়ে কাঁপতে কাঁপতে ওঝা ওয়েজার্স-এর

পিছন পিছন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন।

দরজার কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল—'কে? কি চাই? বার কয়েক ঢোক গিলে আলতো আলতো করে ওয়েজার্স বল্‌ল—'আমি। আমি ভূত তাড়াতে এসেছি। দয়া ক'রে দরজাটা খুলুন।'

আবার গম্ভীর কর্কশ স্বর ভেতর থেকে ভেসে এল—'ওঝাই হও আর যে-ই হও, পালাও এখান থেকে। হুজ্জুতি করতে এলে ফল ভাল হবে না। ওঝা ওয়েজার্স চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ এঁকে বল্‌ল—'আমি ত বাপু, চেষ্টার ত্রুটি করিনি। ঘরের দরজা যখন খোলা থাকবে, ডাকবেন। দেখবেন, ভূত কি ভাবে তাড়াতে হয়।' কথা বলতে বলতে সেলম্বা লম্বা পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

গোড়ার দিকে মিসেস হল অদ্ভুত পোষাকধারী অতিথির প্রতি মনে মনে সন্তুষ্টই ছিলেন। মুখে একটু-আধটু ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বটে। কিন্তু তার দেওয়া গিনিগুলোর কথা মনে পড়তে মনটা খুশীতে নেচে উঠত। কিন্তু ইদানিং অর্থাগমে ভাঁটা পড়েছে। লোকটা এক সপ্তাহ একটা কানা কড়িও ঠেকায় নি। দ্বিতীয় সপ্তাহও যেতে বসেছে। এভাবে কয়েক সপ্তাহের টাকা বাকী রেখে রাত্রির অন্ধকারে যদি চম্পট দেয়, তবে? তার সম্পত্তি বলতে ত মাত্র কয়েকটা শিশি-বোতল। কি কাজে লাগবে সেগুলো? ঠিক তখনই লোকটা ঘণ্টা বাজায়। উদ্দেশ্য প্রাতঃরাশ পাঠাও। সরাইখানার কোন অতিথি ও দাসদাসী কারোরই প্রাতঃরাশ খেতে বাকী নেই। কেবল মাত্র অদ্ভূত পোষাকধারী লোকটারইও এখন কিছু জোটে নি। দশটা বেজে গেছে। আর কতক্ষণ ধৈর্য ধরা যায়।

আবার দশটা বেজে গেছে। মিসেস হল নির্বিকার। ঘণ্টাধ্বনি শুনেও তেমনি মাংস কাটার কাজেই লিপ্ত রইলেন। হঠাৎ ঘরের দরজা খুলে বিচিত্র দর্শন লোকটা বেরিয়ে এল। গলা ছেড়ে চীৎকার করল—'কে আছ, সরাইওয়ালিকে ডাক! সামনেই একজন অতিথি কাজে ব্যস্ত রয়েছে। ভূতুড়ে উৎপাতের ভয়ে লোকটা ব্যস্ত হয়ে মিসেস হলকে ডাকতে ছুটল। মিসেস হলকে ডাকতে পাঠিয়ে লোকটা আবার নিজের ঘরে ফিরে এল। ব্যস, শিশি-বোতল ভাঙার শব্দ শুরু হয়ে গেল। আর সে সঙ্গে গলা ছেড়ে তর্জন গর্জন জুড়ে দিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই হোটেল

থেকে চারিদিকের বাড়িগুলোর ওপর বোতল-বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাড়ায় কান্নাকাটি, ছুটোছুটি শুরু হ'ল। রীতিমত এক বীভৎস ব্যাপার! কয়েকজন সাহসী যুবক সরাইখানায় হাজির হয়ে অদ্ভুত চরিত্রের লোকটার ঘরের দরজায় হাজির হ'ল। দরজা-জানালার ছিদ্রপথে চোখ লাগিয়ে ভেতরের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করল।

উপায়ান্তর না দেখে মিসেস হল প্রাতঃরাশের থালা নিয়ে হাজির হলেন। সেসঙ্গে বকেয়া টাকার বিলটাও আগন্তুকের দিকে এগিয়ে দিলেন। লোকটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কোটের 'পকেটে হাত গলিয়ে বলল, —'দিচ্ছি।'

মিসেস হল সবিস্ময়ে বল্‌লেন—'কাল আপনার পকেটে একটা কানাকড়িও নেই বলেছিলেন। কেউ ইতিমধ্যে আপনার কাছে এল না, অথচ—'

তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই আগন্তুক তাঁর হাতে একটা জিনিষ গুঁজে দিল। খুলেই তিনি আর্তনাদ ক'রে উঠলেন—'এ কী কাণ্ড! এ কী সর্বনেশে কাণ্ডরে বাবা!' লোকটা তাঁর হাতে একটা নাক গুঁজে দিল। তার নিজেরই নাক সেটা। ব্যাণ্ডেজের নীচে, যে গোলাপী নাকটা ছিল সেটাই উপড়ে এনে তাঁর হাতে গুঁজে দিয়েছে পিশাচটা।'

পাড়ার যুবক যারা এসে জড়ো হয়েছিল তারা পড়ল মহাফাঁপড়ে। এত তম্বি করে এসে এখনই যদি লেজ গুটিয়ে লম্বা দেয় তবে পরিচিত মহলে মুখ দেখানোই দায় হয়ে পড়বে। বাধ্য হয়ে তারা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলির পাঁঠার মত কাঁপতে লাগল।

এবার ঘটল এক অধিকতর ভয়ঙ্কর এক ব্যাপার। আকস্মিক আতঙ্কে বুক পর্যন্ত শুকিয়ে আসার জোগাড় হ'ল। রহস্যের আধার আগন্তুকটির কপালের ওপরের ব্যাণ্ডেজটা থেকে মিঃ ও মিসেস হল থেকে শুরু ক'রে আইপিং এর প্রতিটা লোক জানত, মারাত্মক জখম জনিত কারণে সে ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার করেছে। কিন্তু সে যখন এক হেঁচকা টানে ব্যাণ্ডেজটা মুখ থেকে খুলে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিল তখনই প্রমাদ ঘটল। তার দিকে চোখ পড়তে তিন-তিনটে যুবক সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে পড়ে অনবরত গোঁ গোঁ করতে লাগল। কি দেখল তারা? ব্যাণ্ডেজের তলায় সবই ভোঁ ভো! চোখ, মুখ, নাক, কান, কপাল বা মাথা কিছুই নেই তার ঘাড়ের ওপর। মাথার চুল, লম্বা-লম্বা ঝুল্‌ফি বাতাসে ঘরময় উড়ে বেড়াচ্ছে। কে, কার আগে সিঁড়ি দিয়ে নামবে, তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু

হয়ে গেল। শুরু হয়েগেল গুঁতোগুঁতি জাপ্টাজাপ্টি ও মাথা ঠোকাঠুকি মাথা ফাটুক, হাত-পা ভাঙে তো জোড়া দেয়া যাবে। কিন্তু ঐ ভূতুড়ে সামগ্রীগুলো উড়ে মাথায় এসে পড়লে কেলেঙ্কারী ঘটে যাবে। মিসেস হল সিঁড়ির মুখে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। তার ওপর দিয়ে একটা আতঙ্কিত যুবক ত্রস্ত-পায়ে হেঁটে চলে গেল।

এদিকে যুবকরা সরাইখানার সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে –ভূ-ত! ভূ-ত! ভূ-ত বলে আর্তনাদ করতে করতে রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগল। রাস্তার ধারের বাড়িগুলো থেকে মুখে আতঙ্ক মিশ্রিত কৌতূহলের ছাপ এঁকে পথে এসে ভিড় করল। টুকরো-টুকরো প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে লাগল চলমান যুবকদের উদ্দেশে—'কি দেখেছ?' 'কেমন ভূত?' 'কি করেছে?' কিন্তু যুবকদের সময় ও মানসিকতা উভয়েরই অভাব। তারা এলোমেলো শব্দ ছুঁড়তে-ছুঁড়তে ছুটতে লাগল—'ভূত', 'নেই', 'মাথা' প্রভৃতি। ভূতের মাথা নেই' কথাটা গুছিয়ে বলার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে তারা।

পথে এক পুলিশের মুখোমুখি হ'ল আতঙ্কিত যুবকরা। পুলিশটি তাদের গতিরোধ করল। ভূতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে সবাই একবাক্যে বল্‌লে—তারা সবাই স্বচক্ষে দেখে এসেছে, সরাইখানার ভূতের মাথা নেই।

পুলিশটি তাদের কথায় আমল দিল না। বুক ফুলিয়ে, বন্দুক নাচিয়ে সদম্ভে বললে—'মাথা থাক আর নাই থাক, আমি তাকে এ্যারেস্ট ক'রে নিয়ে আসবই। পুলিশটির নাম জ্যাফার্স। এবার সে বল্‌লে—'এই দেখ, ওয়ারেণ্ট। বাছাধনকে আজ গারদে ঢোকাবই।

পুলিশটি সরাইখানায় হাজির হয়ে অদ্ভুত—আগন্তুকটির দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। জোর করে সাহস সঞ্চয় ক'রে, বন্দুকটি তার দিকে উঁচিয়ে বল্‌ল—'তোমাকে আমি এ্যারেস্ট করতে এসেছি। হাত তোল!'

লোকটা বিশ্রী স্বরে ব'লে উঠল—'অ্যাঁ—অ্যাঁ! এসবের মানে কি, বুঝছি না—কোটের কলারের ফাঁক দিয়ে কথাগুলো ছুঁড়ে দিল। এবার বন্দুকটি তেমনি উঁচিয়ে ধরেই পুলিশটা দু'পা এগিয়ে গেল। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল—'খবরদার! খবরদার! এক পা-ও এগোবে না ব'লে দিচ্ছি। কথা বলতে বলতে সে বেশ জোরে তার গালে এক থাপ্পর কষে দিল জামার আস্তিনটা দিয়ে। পুলিশটি এতেও ঘাবড়াল না। সে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে লোকটার হাত বিহীন আস্তিনটাকে সজোরে

চেপে ধরল। মুহূর্তের মধ্যে প্রবল জোরে একটা লাথি এসে পড়ল তার তলপেটে। বিকট আর্তনাদ করে উঠল। কিন্তু আস্তিনটা ছাড়ল না কিছুতেই। ইতিমধ্যে মিঃ হল সাহসে ভর ক'রে গুটি গুটি করে ঢুকে গেছে। মিঃ হল ও পুলিশটি মুণ্ডহীন লোকটাকে চেপে ধরল। শুরু হ'ল জাপ্টাজাপ্টি ধস্তাধস্তি। ঘরের জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড হতে লাগল। হঠাৎ দুটো লোক ধড়াস্ করে মেঝেতে পড়ে গেল। পুলিশ জ্যাফার্স ও মুণ্ডহীন লোকটা মাটিতে পড়েও জাপ্টাজাপ্টি করতে লাগল। পাশেই পাউরুটি কাটার ছুরিটা পড়েছিল। মুণ্ডহীন লোকটা সেটাকে নেবার জন্য জামার আস্তিনটা বাড়িয়ে দিল। নাগাল পেল না। এদিকে তাদের ধস্তাধস্তিতে টেবিলের ওপর থেকে কতগুলো শিশি বোতল হুড়মুড় ক'রে মাটিতে পড়ে গেল। তাদের ভেতরকার তরল পদার্থ ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল। ব্যস, মুণ্ডহীন আগন্তুক আর্তনাদ ক'রে উঠল—'হার স্বীকার করছি! হার স্বীকার করছি! হার স্বীকার করছি!' 'কেন যে লোকটা হার স্বীকার করল, বোঝা গেল না। সে ত পুলিশ জ্যাফার্স-এর বুকের ওপর চেপে বসেছিল। যাক, তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগল—'কি লাভ? কি-ই বা লাভ এতে?' সত্যি অবিশ্বাস্য কাণ্ড বটে। শূন্য থেকে তার কথাগুলো যেন ভেসে আসছে।

পুলিশ জ্যাফার্স লাফিয়ে উঠে হাতকড়া বের করল। কিন্তু যার হাত নেই, তাকে হাতকড়া পরাবে কিভাবে?

মুণ্ডহীন লোকটা এবার পায়ের মোজা খোলার জন্য উপুড় হ'ল। পুলিশ জ্যাফার্স এবার তার পায়ে হাতকড়াটা পরিয়ে দেবে ভাবল। জ্যাপ্টে ধরে চেঁচিয়ে উঠল—'আরে! এর যে হাত-পা-ধড় কিছু নেই। খালি একগাদা পোষাক জড়ো করা!'

লোকটা এবার চেঁচিয়ে বলল—'যা খুশী কর। কিন্তু আমার চোখে যেন হাত চালিয়ে দিয়ো না। এবার সে নিজের শরীরের অবস্থাটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলল 'আমার হাত-পা আর সারা দেহ যা-ই বল না কেন, সবই এখানে রয়েছে। স্তরে স্তরে সাজানো। আসল ব্যাপার হ'ল আমি অদৃশ্য মানব। কিন্তু তোমরা আমাকে হাতকড়া পরাতে আসছ কোন অপরাধে?

পুলিশ জ্যাফার্স বলল—'তোমার নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা আছে,

এই দেখ। পকেট থেকে একটা ভাঁজকরা কাগজ বের ক'রে ধরল।

অদৃশ্য মানব এবার বলল—'বল কোথায় যেতে হবে, যাচ্ছি। কিন্তু হাত কড়া দিয়ে নয়।' কথা বলতে বলতে এক এক করে কোট, জামা, প্যাণ্ট প্রভৃতি তার গা থেকে খুলে যেতে লাগল। আর সেগুলো শূন্যে লাফালাফি দাপাদাপি করতে লাগল। পুলিশটি তার জামাটা ধরে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে জামার আস্তিনটা ঘুষি পাকিয়ে এল তার দিকে। মারল সজোরে এক ঘা। ধরাশায়ী হ'ল পুলিশ বাহাদুর। ব্যস, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল। অন্য আর যারা ছিল সবাই তাকে অনুসরণ করল। আবার শুরু হয়ে গেল হুড়োহুড়ি গুঁতোগুঁতি। তাদের পাশ দিয়ে কি যেন একটা প্রচণ্ড বেগে লাফিয়ে গেল। সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল—'ধর! ধর! ধর!' কিন্তু কে, কাকে ধরে? অদৃশ্য মানব পালিয়ে গেল সবার চোখের সামনে দিয়ে। পুলিশ অফিসার জ্যাফার্স সরাইখানার দরজায় শুয়ে কাঁৎড়াতে লাগল।

সারাদিন ধরে আইপিং-এর বাড়িতে বাড়িতে, পাড়ায় পাড়ায় আর রাস্তার মোড়ে মোড়ে অদৃশ্য মানবের রহস্য জনক ব্যাপার স্যাপার নিয়ে কথা কাটাকাটি তর্কাতর্কি চলল। কেউ কেউ আসল ঘটনার সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত খাদ মিশিয়ে ঘটনাকে অধিকতর রসসিক্ত ক'রে পরিবেশন ক'রে বাহাদুরি কেনার চেষ্টা করতেও ছাড়ল না।

সেদিনই বিকেলের ঘটনা। টমাস মারভেল ভিক্ষে করতে বেরিয়ে একজোড়া জুতো কুড়িয়ে পেল। জুতোজোড়া পেয়ে তার খুব আনন্দ হ'ল। খালি পায়ে পথে পথে ঘুরে পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে। জুতো জোড়া পেয়ে তার ভালই হ'ল। সে জুতো জোড়া পায়ে গলিয়ে হাঁটতে লাগল।

হঠাৎ কে যেন ব'লে উঠল—'কি হে, চললে নাকি?' কথাটা কানে যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। ভাবল, কথা বলছে কে তবে? কী ভূতুড়ে কাণ্ডরে বাবা! সে উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠল—কে? কে কথা বলছ?'

'—আমি। আমি গো, আমি।'

—'আমি। কে তুমি? কোত্থেকে কথা বলছ?'

'—এই ত আমি। তোমার সামনেই রয়েছি। সামনে দাঁড়িয়ে, ভিখারী মারভেল আবার চারদিকে তাকাল। কাউকেই দেখতে পেল না। জলের কলটা, সামনের বড় বাড়িটা, মোটা পাইনগাছটা—সবই আগের মত তেমনটি রয়েছে। কিন্তু মানুষজন কাউকেই দেখা যাচ্ছে না—ত। তবে কথা বলছে কে? তবে কি তার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? পকেটে হাত দিয়ে পয়সাগুলো দেখে নিল। সবই ঠিকঠাক আছে। কিছু গোল-মাল হয় নি। গায়ে চিমটি কাটল। ব্যথাও লাগছে। ভাবল, সে-ত জেগেই আছে। এ-ত-স্বপ্ন দেখা নয়! এবার সে উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠল—'আমার সামনেই যদি থাক তবে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

—'আমি যে অদৃশ্য! অদৃশ্য মানব! আমাকে দেখতে পাবে কোত্থেকে! এই দেখ, আমি তোমাকে ঢিল মারছি।' ব্যস, একটা ঢিল এসে তার কপালে লাগল। মারভেল বিকট চিৎকার ক'রে উঠল।

অদৃশ্য মানব হেসে বলল—'কি গো, প্রমাণ হাতে নাতে পেয়ে গেলে ত? আরও প্রমাণ চাও?

ভিখারী মারভেল আতঙ্কে শিউরে উঠে প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল —'না গো না! এতেই যথেষ্ট হয়েছে আর দেখতে চাইনে! কিন্তু তুমি ভূত নও, আমাদের মতই মানুষ বুঝব কেমন ক'রে?' সঙ্গে সঙ্গে মারভেলের হাতে কি যেন একটা ঠেকল। সে দু'হাতে সেটাকে পরীক্ষা করতে করতে বলতে লাগল—'তাইত, হাত-পা-বুক-পেট সবই আছে দেখছি। সত্যি ত মানুষই বটে।

'—আমার সব কথা তোমাকে আমি বলব। তবে এখন নয়, পরে শুনবে। এখন শুধু এটুকু শুনে রাখ, তোমাকে আমার খুবই দরকার। অদৃশ্য মানব বলল, বুঝতেই ত পারছ। তোমাদের মত খাওয়া, শোয়া, বসা সবই আমার প্রয়োজন। কিন্তু আমি অদৃশ্য মানব বলে এগুলো সংগ্রহ করা আমার পক্ষে কষ্টকর। তুমি এগুলো সংগ্রহ করে দেবে। রাজী কি?'

কাঁপা কাঁপা গলায় ভিখারী মারভেল বলল—রা-জী। তুমি কি আমাকে অ-র্থ দে-বে?

'—তুমি ত দেখছি, একেবারেই বে-আক্কেলে লোক হে! আমি অদৃশ্য মানব। যে কোন ব্যাঙ্কে গিয়ে গোছা গোছা নোট তুলে আনলে যে

ঠেকাবে আমাকে ? অর্থের জন্য ভেবো না। রাজী ত ?'

মুহূর্তকাল ভেবে মারভেল ব'লে উঠল—'না গো, আমি রাজী নই। তুমি ব্যাঙ্ক থেকে নোট গায়েব করবে আর পুলিশ এসে আমাকে হাত কড়া পরিয়ে আমাকে লপ্‌সির নিমন্ত্রণ খাওয়াতে নিয়ে যাবে! না, সেটি হচ্ছে না। কথা বলতে বলতে সে হাঁটা জুড়ল। এবার অদৃশ্য মানবটি খপ্‌ ক'রে তার গলা চেপে ধরে বলল—'আমার সব কথা শুনে তুমি চম্পট দেবে সেটা হচ্ছে না।' এবার তার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। সে মারভেলকে নিয়ে মিসেস হল-এর সরাইখানায় হাজির হ'ল।

এদিকে পাদরি বানটিং সরাইখানায় মিঃ হল-এর কাছে এসেছেন। মিসেস হল ইতিমধ্যে অদৃশ্য মানবের ঘরটায় শিশি-বোতল যা কিছু ছিল বের ক'রে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার ক'রে ফেলেছেন। আপদ বিদেয় হয়েছে। ঘাড় থেকে ভূত নেমে গেছে। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন।

ডাক্তার কেম্পও সরাইখানায় এসে হাজির হলেন। মিঃ হল, পাদরি বান্‌টিং এবং ডাক্তার কেম্প আলোচনা করতে লাগলেন, কোনক্রমে অদৃশ্য মানবটির পরিচয় বের করা যায় কিনা। পাদরি বানটিং অদৃশ্য মানবটির ডায়েরী ঘাটাঘাটি ক'রে দেখলেন, অনেক কিছু লেখা আছে বটে বায়ে তার নাম ঠিকানা।

এদিকে ভিখারী মারবেল ও অদৃশ্য মানব সরাইখানার ভেতরে ঢুকে গেল। মারভেলকে দেখে পাদরি বান্‌টিং খেঁকিয়ে উঠলেন—'কি চাই এখানে ?'

—'একটু জল। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।'

তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়ে ডাক্তার কেম্প বললেন—'এখন একটা কথা বিশ্বাস করতেও উৎসাহ পাওয়া যায় না। মানুষ কখনও অদৃশ্য হয় কোনদিন ? এমন সময় পাদরি বানটিং-এর গলাটা কে যেন পিছনদিক থেকে চেপে ধরল। মুহূর্তে তার শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগার হ'ল। চোখের মনি দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল। তারা কিছু বুঝতে না বুঝতে এবার ডাক্তার কেম্প আর্তনাদ ক'রে উঠলেন। তার গলায়ও চাপ লাগল। এবার অদৃশ্য মানবটি বলে উঠল। এবার যদি-গলাটিপে তোমাদের মেরে ফেলি ? কে ঠেকাবে তোমাদের ? বল, আমার পোষাক পরিচ্ছদ আর অন্যান্য জিনিসপত্র সব কোথায় ? কে তোমাদের রক্ষা করবে ? পুলিশও আমার কিছু করতে পারবে না, প্রমাণ ত পেয়েছই। কারণ,

আমি অদৃশ্য। আমার প্রস্তাবে রাজী হও তো ভাল, নয়ত মর।

পাদরী বানটিং বললেন—মরতে হয় মরব তবু তোমার মত শয়তানের সঙ্গে সন্ধি নয়।

চীৎকার চেঁচামেচি শুনে মিঃ হল উপরে উঠে এলেন। দেখলেন, ভেতরে নারকীয় তাণ্ডব চলছে। পাদরী বানটিং ও ডাক্তার কেম্প মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। পাদরি বানটিং কোন রকমে উচ্চারণ করলেন 'মিঃ হল, ঘরে ঢুকে শয়তানটার ফাঁদে পা দেবেন না। পালান। আমাদের বরাতে যা আছে পরে দেখা যাবে।

সরাইখানার সামনের দোকানদার মিঃ হাক্সলার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে জানালেন এইমাত্র কয়েকটা বই আর এক গাট্টি পোষাক তাঁর ছেলে সামনে দিয়ে উড়ে যেতে দেখেছে। ডাক্তার কেম্প সুযোগ বুঝে শয়তানটার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে পোষাকের গাট্টিটার খোঁজে ছুটলেন। কিছুদূর যেতেই দেখল, পোষাকের গাট্টিটা নিয়ে ভিখারী মারভেল চলেছে। হঠাৎ অদৃশ্য মানবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'আরে করছ কি! পোষাকগুলো নিয়ে তাড়াতাড়ি হাট। খুব দেরী করে দিলে!'

মারভেল খোড়াতে খোড়াতে অতি কষ্টে পথ পাড়ি দিচ্ছে। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—'আমি আর তোমার গাট্টি বইতে পারব না। আমার দরকার নেই রাজা হয়ে।'

—যা বলছি কর। অবাধ্যতা করলেগলা টিপে মেরে ফেলব, বলে দিচ্ছি। পালাতে চেষ্টা না করে বরং আমার সঙ্গে হৃদ্যতা বজায় রেখে চল, ভাল হবে?'

বেচারী মারভেল পড়ে মহাসমস্যায়। বড়লোক হওয়ার সাধ মিটেছে তার। এমন নচ্ছাড় ভূতটাকে ঘাড় থেকে নামাতে পারলে বাঁচে।

পরদিন মারভেল একটা রেস্তোরার সামনে বসে। তার সামনে একটা পোষাকের বিরাট গাট্টি। তাকে এভাবে বসে থাকতে দেখে এক পথচারী কৌতূহলী হয়ে তার গাট্টিটা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে থাকল।

মারভেল বলল—'তেমন কিছু না। কয়েকটা ছেড়া পোষাক আর পুরনো কটা বই গাট্টি বেঁধে নিয়েছি।'

ফেরীওয়ালার কাছ থেকে একটা খবরের কাগজ কিনে পথচারী এবার সেটার দিকে মন দিল। কয়েক ছত্র পড়েই বলে উঠল—'গাঁজাখোর যত্তসব। গুল মারার আর জায়গা পায় না। আইপিং গ্রামে নাকি অদৃশ্য মানবের

আবির্ভাব ঘটেছে ?'

'—ঠিক কথাই বটে। মোটেই মিথ্যে লেখে নি। অদৃশ্য মানুষ অবশ্যই আছে কত্তা।' মারভেল আগ বাড়িয়ে বলল। 'অদৃশ্য মানুষের কথা তারা শুনে খবরের কাগজে লিখেছে॥ আর আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি! গাট্টি বয়ে বয়ে কাঁধ দুটো একেবারে দরকচা মেরে গেল! কথা বলতে বলতে সে গাট্টিটা কাঁধে তুলে খুড়িয়ে খুড়িয়ে এগিয়ে চলল, এমন সময় এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটে গেল। রেঁস্তোরার ক্যাশ বাক্স থেকে কয়েকটা নোট উড়তে উড়তে দোকান ছেড়ে বেরিয়ে এল। রেঁস্তোরার মালিক হায় হায় করে নোটগুলোকে ধরতে গেল। অমনি গালে সজোরে এক থাপ্পড় খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পথে পড়ে গেল। নোটগুলো বাতাসে ভেসে অদৃশ্য হয়ে গেল। অবিশ্বাস্য অলৌকিক এক কাণ্ড।

ডাক্তার কেম্প তাঁর ডাক্তার খানায় বসে একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছেন। রোগীরা একটু আগে এক এক করে বিদায় নিয়েছে। রাত্রি অনেকই হয়েছে। তবু কিছু সময় অপেক্ষা করছেন তিনি। বলা যায় না কোন রোগী আসতেও পারে। ব্যস তবেই অর্থাগম হয়ে যাবে।

হঠাৎ একটা কুকুর ভয়ার্তভাবে ডাকাডাকি শুরু করে দিল॥ চীৎকার করতে করতে সেটা একটা দরজার আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিল। এমন সময় একটা ছোট মানুষকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলে যেতে দেখা গেল। অদৃশ্য আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল পাড়ার মানুষগুলোর মনে। সঙ্গে সঙ্গে দুম্ দাম করে বাড়িগুলোর দরজা জানালা বন্ধ হয়ে গেল। সবার মনেই অদৃশ্য মানবের আতঙ্ক।

রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকান। কয়েকজন বসে চা খাচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন পুলিশও রয়েছে। এমন সময় আলুথালু বেশে বেচারি মারভেল দৌড়ে চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ল। তার চোখ দুটো লাল। ঠোঁট দুটো আতঙ্কে কাঁপছে। দোকানে ঢুকেই সে চীৎকার করে উঠল আসছে! ঐ ঐ যে আসছে! অদৃশ্য মানব আসছে। আমাকে খুন করে ফেলবে। বাঁচান! আমাকে বাঁচান আপনারা! আমাকে ধরার জন্যই আসছে।'

চায়ের দোকানের মালিক অজানা আতঙ্কে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিল। চায়ের দোকানের মালিক বলল—'এবার ঠাণ্ডা হয়ে বোসো।

দরজা বন্ধ। আর কোন ভয় নেই তোমার।'

এমন সময় বাইরে থেকে কে যেন দুম্ দাম করে দরজায় ধাক্কা মারতে লাগল। বেচারি মারভেল আতঙ্কে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। উন্মাদের মত দাপাদাপি জুড়ে দিল সে। আর বলতে লাগল—'তোমাদের পায়ে পড়ি—দরজা খুলো না। দোহাই তোমাদের দরজা খুললে আমার ঘাড় মটকে দেবে শয়তান অদৃশ্য মানবটা! দোহাই! তোমার পায়ে পড়ছি!

এমন সময় ঘটে গেল অঘটন। জানালাটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল।

পুলিশ গর্জে উঠল - 'খবরদার! বলে দিচ্ছি, যে-ই হও বেশী মস্তানি করতে গেলে পিস্তলের এক গুলিতে দফা রফা করে ছাড়ব।'

জানালাটা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ভয়ে কাতর মারভেল বিলাপ জুড়ে দিল। চোখের পলকে এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। কে যেন অলক্ষ্যে থেকে বেচারি মারভেলকে ধরে টানা হেঁচড়া শুরু করে দিল, তাকে দেখা যাচ্ছে না। অথচ কে তাকে ধরে টানাটানি করছে। পুলিশের হাতে পিস্তল আছে বটে। কিন্তু কাউকে না দেখতে পেলে কাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়বে। তবু অজানা লক্ষ্যে সে গুলি চালাল! দোকানের জানালার কাঁচ ভেঙে ঝন্‌ঝন্ করে মাটিতে পড়ল। হঠাৎ চটা পট চটা পট শব্দ হতে লাগল। ঘরের সবার গালে অনবরত থাপ্পর পড়তে লাগল। কিন্তু কে মারছে কোত্থেকে মারছে কিছুই বোঝা গেল না। ঘরের সবাই ধরাশায়ী হল অচিরেই। একী ভূতুরে কাণ্ডরে বাবা!

সারা রাত্রি সবাই ভয় আর আতঙ্কে জড়ো-সড়ো হয়ে চায়ের দোকানেই কাটিয়ে দিল। আসলে মার খেয়ে খেয়ে কারো হাঁটা চলার ক্ষমতাই ছিল না। সকাল হলে মারভেল পুলিশটির সঙ্গে থানায় গেল। পুলিশ অফিসারের পা দুটো জড়িয়ে ধরে অনুরোধ করতে লাগল, তাকে দীর্ঘদিন কারাবাসের সুযোগ ক'রে দেয়ার জন্য। সুদৃশ্য জেলখানায় ডবল তালা লাগিয়ে তাকে রাখবে যাতে অদৃশ্য মানব তার ওপর প্রতিশোধ না নিতে পারে। পুলিশ অফিসার তাকে অভয় দিলেন।

এদিকে ডাক্তার কেম্প ডাক্তারখানা বন্ধ ক'রে বাড়ি ফিরে গেল। নৈশভোজের প্রস্তুতি চলছে রান্নাঘরে। হঠাৎ তাঁর বৈঠকখানার জানালার কাঁচটা ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। বাড়ির সবাই অজানা বিপদ আশঙ্কায় হুড়োহুড়ি শুরু ক'রে দিল। ডাক্তার কেম্প

ভাবলেন, পাড়ার কোন বদমায়েশ ছেলে ছোকড়া ঢিল মেরে মজা করছে। তিনি ছুটোছুটি ক'রে সিঁড়ির কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দেখেন, সিঁড়ির তলায় চাপ চাপ রক্ত। দৌড়ে শোবার ঘরে ঢুকলেন। আশ্চর্য ব্যাপার ত! দরজার পাল্লায় রক্ত লেগে রয়েছে। আরও চমকে উঠলেন, ঘরের ভেতরে ঢুকে বিছানার দিকে তাকিয়ে। বিছানায় চাদরের ওপর চাপ চাপ টাটকা রক্ত দেখে। তাছাড়া চাদরটার কিছুটা অংশ কে যেন ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। চাদরটা আগোছালও বটে। কে যেন একটু আগে এখানে বসেছিল। এবার সচকিত হয়ে ঘাড় ঘুরালেন। কে যেন বলছে '—কি? কি ব্যাপার ডাক্তার কেম্প।' উন্মাদের মত চারদিকে তাকাতে লাগলেন তিনি। ডাক্তার মানুষ তিনি। অলৌকিক কোন ব্যাপারের প্রতি তাঁর অবস্থা নেই। ব্যাপারটাকে মনের ভুল বলেই উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু অবিশ্বাস করতেও পারছেন না। বেসিনে হঠাৎ জল পড়ার শব্দ হ'ল। পরিষ্কার শুনতে পেলেন, কে যেন হাত ধুচ্ছে। ব্যস্ত পায়ে সেদিকে ছুটলেন। দেখলেন, কল খোলা। আর বেসিনের গায়ে টাটকা রক্তের ছোপ।

আবার কে যেন বলছে—'ডাক্তার কেম্প। ভয় পাচ্ছ? ভয়ের কিছু নেই।' কথাটা কানে যেতেই অস্থিরচিত্ত কেম্প চারদিকে বার বার তাকাতে লাগলেন। তিনি কতকটা অদৃশ্য মানবকে লক্ষ্য ক'রে, আবার নিজেকে লক্ষ্য করেও বলা চলে তিনি কথাটা ছুঁড়ে দিলেন—'আমি ভেবেছিলাম, অদৃশ্য মানবের ব্যাপারটা নিছকই অশিক্ষিত মানুষের মনগড়া গাঁজখুরি ব্যাপার মাত্র। এখন দেখছি—আচ্ছা, তোমার দেহের কোথাও ব্যাণ্ডেজ আছে?

—আছে। ব্যাণ্ডেজ আছেই। ডাক্তার কেম্প মাথা ঠাণ্ডা রাখ। দোহাই তোমার—ভয়ে ভেঙ্গে পোড়ো না। তোমাকে আমার খুব দরকার।' কথা বলতে বলতে অদৃশ্য মানব ডাক্তার কেম্প-এর কাঁধে হাত রাখল।

ডাক্তার কেম্প একলাফে সরে গিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন—'তুমি আগাগোড়া অনধিকার চর্চা ক'রে চলেছ। তুমি দৃশ্য বা অদৃশ্য যা-ই হও না কেন চোরের মত লোকের বাড়ি ঢুকে অন্যায় করেছ? তোমাকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারব না। কিছুতেই না।

—তুমি খুবই বোকা ডাক্তার কেম্প। আমাকে কেন চটাতে চেষ্টা করছ। আমি রেগে গেলে তোমাকে খুন করে ফেলতেও দ্বিধা করব না,

বলে রাখছি। কিন্তু বিশ্বাস কর, তোমার সাহায্য না পেলে আমার অস্তিত্ব বজায় রাখা আজ সত্যি কঠিন হয়ে পড়েছে। একটা কথা, ডাক্তার কেম্প, গ্রিফিন'কে তোমার মনে পড়ে? ইউনিভারসিটি কলেজের গ্রিফিন-এর কথা বলছি। আমি সেই গ্রিফিন। আজ নিজের ক্ষমতাবলে আমি নিজেকে অদৃশ্য ক'রে রেখেছি আসলে অন্য দশজনের মতই আমি মানুষ। এটুকুই তফাৎ, আমি আজ অদৃশ্য। ভূত-প্রেত কিছুই না। মনে পড়েছে, রসায়নে মেডেল পেয়েছিলাম। সেই গ্রিফিন আমি। কি, মনে পড়ছে না?'

ডাক্তার কেম্প বিতৃষ্ণার মধ্য দিয়ে ব'লে উঠলেন সবই মনে আছে। তোমার আচরণে আমি মোটেই প্রীত নই। শয়তানী-মন্ত্রের সাহায্যে মানুষ অদৃশ্য হতে পারে। তুমি সেরকম কিছুরই আশ্রয় নিয়েছ।'

'—শয়তানী? এতে শয়তানী মন্ত্রের কোন ব্যাপারত নেই। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির 'সাহায্যে মানুষ অদৃশ্য হতে পারে!' কথার ফাঁকে তার ব্যাণ্ডেজটা খুলে অদ্ভুতভাবে বাতাসে ভাসতে লাগল।

ডাক্তার কেম্প মৃদু হেসে বিদ্রূপের সুরে বললেন—'তোমার কাণ্ড-কারখানা মুখরোচক। অলৌকিক গল্পকেও হার মানায়।'

'—আমার ভাগ্য যে আমাকে তোমার কাছে এনে ফেলবে এটা কিন্তু আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি ডাক্তার কেম্প।'

'—তুমি আহত হ'লে কি ক'রে? গুলি, নাকি ছোরার আঘাতে?

'—ছোরা নয়। পিস্তলের গুলিই লেগেছে। আসলে এক সহকারীর কাছে আমার কিছু পোষাক আর গোটা তিনেক বই দিয়েছিলাম। বই বলতে আমার সারা জীবনের গবেষণার ফসল। হাতে-লেখা ডেয়েরী। নচ্ছাড়টা সেগুলো নিয়ে সরাইখানা থেকে পালিয়েছে। নাম তার মারভেল। খুব ছুটেও ছিলাম। ধরতে পারিনি। ধরতে পারতাম ঠিকই। কিন্তু অন্য কিছু লোক ছুটে এসে গোল বাঁধিয়ে দিল। ভূত ভেবে আমাকে তাড়া করেছিল। এদেশের লোকের ভূত-প্রেতের ভয় আছে বটে, কিন্তু পেটাতে ভয় পায় না তারা। শেষ পর্যন্ত পুলিশ আমাকেই গুলি ক'রে বসল। বিচার দেখ! আমার সারা জীবনের সম্পদ চুরি ক'রে পালাচ্ছে। আর ধরতে গিয়ে আমি খেলাম গুলি! কিন্তু কই, আমি ত কাউকে খুন করিনি। একটু হুইস্কি দিতে পার? গলাটা শুকিয়ে একেবারে কাট হয়ে গেছে।

ডাক্তার কেম্প তাড়াতাড়ি এক বোতল হুইস্কি এনে টেবিলে রাখলেন। কয়েকটা বিস্কুটও আনলেন।

দু'-তিনটে বিস্কুট একসঙ্গে মুখে ফেলে দিল অদৃশ্য গ্রিফিন। ডাক্তার কেম্প দেখতে পেলেন না কিছুই। কেবল বিস্কুট ভাঙার কুড়মুড় শব্দ শুনতে পেলেন।

ডাক্তার কেম্প বললেন। 'আপত্তি না থাকলে তোমার গল্পটা শোনাও গ্রিফিন।'

'—আপত্তি কিসের বন্ধু। আমি যে ভাবছি তোমাকে আমার কাজের সহকর্মী করে নেব। আমার কাহিনী ত তোমাকে শোনাতে হবে। বলছি শোন, আশা ছিল তোমার মত ডাক্তার হব। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিও হয়েছিলাম। ঠিক তখনই পদার্থ বিদ্যার দিকে মন ঝুঁকল। সবচেয়ে মন কাড়ল পদার্থ বিদ্যার আলোক-রহস্য। তুমি ত জানই, সূর্যালোকের সাতটা রঙ। অথচ তার মধ্যে লাল, নীল সবুজ প্রভৃতি স্বতন্ত্র রঙ বর্তমান। সূর্যালোকে রঙ সাতটার মধ্যে ছ'টা রঙই মিলিয়ে রয়েছে। হঠাৎ মনে, ভাবনার উদয় হ'ল ছ'টা রঙই যদি মিলিয়ে যেতে পারে তবে সাতটাই বা কেন পারবে না? আমি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় লেগে গেলাম, এমন কোন জিনিস আবিষ্কার করা যায় কিনা যার দ্বারা সাতটা রঙকেই নিশ্চিহ্ন করা যেতে পারে। আর তা হবে বিশ্বের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত! কারণ, সে জিনিস হবে অদৃশ্য। কিন্তু গবেষণার জন্য বিশ হাজার পাউণ্ড অর্থ প্রয়োজন। আমার নিজের বলতে বিশ পাউণ্ড নেই। ল্যাবরেটরী ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের ত প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু বিশ হাজার কেন পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডও মাঝে মাঝে আমার কাছে গচ্ছিত থাকে। তার সবই কোম্পানীর অর্থ। লোভ সামলাতে না পেরে সে অর্থ গায়ে করে দিলাম। আমার বাবা অপমানের জ্বালা সইতে না পেরে পিস্তলের গুলিতে নিজের মাথার খুলি নিজেই উড়িয়ে দিলেন। আমি কিন্তু নির্বিকার। নিজের গবেষণায় মেতে রইলাম। আমার নিরলস সাধনা এক সময় সার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল! নিজেকে অদৃশ্য করার উপায় আবিষ্কার ক'রে ফেললাম আমি। যাক, যে কথা বলছিলাম, তোমাকে আমার চাইই। একা একা কাজ করার অনেক অসুবিধা! আমার অংশীদার ক'রে নেব তোমাকে। সত্যি বলছি তোমাকে বেগার খাটাবার তিলমাত্র ইচ্ছাও আমার নেই। আমি পৃথিবীটাকে মুঠোর মধ্যে পেতে চাই

আর তুমি হবে তার অর্ধেকের অংশীদার। এক আনাড়ী ভিখারী মারভেলকে সহকারী হিসাবে নিয়েছিলাম। নিজের ভাল বুঝল না। পালাল হত-চ্ছাড়াটা। বন্ধু কেম্প, তোমার কাছে আমার সব কথাইত বললাম। তুমি আবার আমাকে ধরিয়ে দেবার জন্য উৎসাহী হয়ে পড়বে না-ত?'

—তুমি ক্ষেপেছ নাকি গ্রিফিন! তুমি ক্লান্ত একটা চুরুট খাও।'

—'যাক, তোমার কথায় নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তবে আমি একটু বিশ্রাম ক'রে নিচ্ছি। মিনিট কয়েকের মধ্যেই অদৃশ্য মানব গ্রিফিন-এর নাম ডাকা শোনা গেল।

ডাক্তার কেম্প ভাবতে লাগলেন, এখন কি তার কর্তব্য? একদিকে বন্ধুকে কথা দিয়েছে, কোন ক্ষতি করবে না তার। আবার সে এ তল্লাটে সে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছে তা-ও সঙ্গত নয়। মানুষ হিসাবে নিজের কর্তব্যকেও ত আর অস্বীকার করা যায় না। গভীর চিন্তায় ডুবে থেকে তিনি কখন যে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়েছেন জানেন না। তিনি বলে উঠলেন—'হ্যালো পুলিশ-স্টেশন? আমি ডাক্তার কেম্প। সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী অদৃশ্য মানব এখন আমার বাড়িতেই অবস্থান করছে। তাকে ধরতে চাইলে যতশীঘ্র সম্ভব লোকজন নিয়ে চলে আসুন। পালিয়ে গেল কিন্তু পুরো এলাকা তোলপাড় করে ছাড়বে।

ডাক্তার কেম্প টেলিফোন করার পর মিনিট কুড়ির মধ্যেই পুলিশ তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে ফেলল। ডাক্তার কেম্প পুলিশকে অভ্যর্থনা করার জন্য সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। এমন সময় কে যেন আচমকা তাঁর গলাটা চেপে ধরল। ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলেন না। অদৃশ্য মানবের কাজ, বুঝতে দেরী হল না। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে নীচে পড়লেন তিনি। এবার তারস্বরে চেঁচাতে লাগলেন—ইন্সপেক্টর সাহেব, তাড়াতাড়ি আসুন, অদৃশ্য মানব আমায় মেরে ফেলল! শেষ করে দিল আমায়। মিনিট দু'-তিন পরে পুলিশ ইন্সপেক্টর হাঁপাতে হাঁপাতে সেখানে এলেন। ডাক্তার কেম্প প্রায় সংজ্ঞা হীন অবস্থায় পড়ে আছে। কোনরকমে ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—'পালিয়েছে! অদৃশ্য মানব পালিয়েছে! এখন তাকে ধরা খুবই কষ্টসাধ্য। একটু দম নেয়ে এবার বললেন—'তবে তাকে ধরার একটাই উপায় আছে। এ তল্লাটের যত কুকুর আছে সব পথে ছেড়ে দিতে হবে। কুকুরের ঘ্রানশক্তি খুবই প্রবল। সে এ-অঞ্চল সহজে ছাড়বে না। আমাকে

বলেছে, মারভেল খুঁজে বের করবেই। তার সারাজীবনের পরিশ্রমের ফসল ডায়েরীটা ফেলে সে অবশ্যই কোথাও যাবে না। আর একটা কাজ করতে হবে। রাস্তায় রাস্তায় কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে রাখতে হবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা সে নিজেকে অদৃশ্য করতে সক্ষম হয়েছে বটে। কিন্তু নিজের রক্ত বা পোষাক পরিচ্ছদকে অদৃশ্য করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে নি আজও। পুলিশ ইন্সপেক্টর কথা না বাড়িয়ে তাঁর লোকজনকে নিয়ে গাড়িতে ফিরে গেলেন।

অদৃশ্য মানবের গত রাত্রের কীর্তির কথা বাতাসে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পাড়ায় পাড়ায় আতঙ্কের ছায়া নেমে এল। রাস্তায় গাড়ী ঘোড়া অস্বাভাবিক রকম কমে গেল। বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ করে রাখা হল। ট্রেনও দরজা জানালা বন্ধ অবস্থাতেই যাতায়াত করতে লাগল।

পুলিশ অদৃশ্য মানব গ্রিফিন'কে ধরার জন্য নিশ্ছিদ্র ফাঁদ পাতল। ভয়ঙ্কর কাকে বলে তাদের জানা নেই। থানায় বড়-দারোগার ঘরে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু হল। ঘন ঘন কফি আসছে, চুরুট পুড়ছে। ঠিক তখনই ঘরের শার্সির ওপর একটা ইট এসে পড়ল। কাঁচের টুকরোয় ঘর ভরে গেল। পুলিশের কর্তাব্যক্তিরা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পড়লেন। মুহূর্তে উঠে গেল পুলিশী দম্ভ। ঘটনাচক্রে ডাক্তার কেম্পও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জানালা দিয়ে একটা কাগজের চিরকুট উড়তে উড়তে এসে তাঁর সামনে পড়ল। হাত বাড়িয়ে সেটাকে ধরতেই দেখলেন, সেটার গায়ে কয়েক ছত্র লেখা। তাঁরই উদ্দেশ্য লেখা একটি চিঠি। তার প্রথম সম্বোধনই হচ্ছে—শয়তান, পাষণ্ড, বিশ্বাসঘাতক···আমাকে বেকায়দায় ফেলে হাজতে ঢোকাবে ভেবেছ? আমাকে ধরার জন্য পথে কুকুর পর্যন্ত লেলিয়ে দিয়েছ? তোমার অভিন্ন হৃদয় পুলিশদের বলে দিও, ইতিমধ্যেই আমি থাকা খাওয়ার জায়গার ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছি। আজ থেকে এ বার্ডক শহরে আলোড়ন সৃষ্টি শুরু করব। পুলিশের যা ক্ষমতা আছে, করে যেন। আমি স্বাধীন ও মুক্ত পুরুষ। আজ আমার প্রথম ও প্রধান কাজ তোমার ওপর প্রতিশোধ নেয়া, তোমাকে নির্মমভাবে হত্যা করা।'

চিঠি পড়ে ডাক্তার কেম্পের মুখ শুকিয়ে একেবারে আমসি হয়ে গেল। কর্নেল এডি তাঁকে অভয় দিতে গিয়ে বল্লেন—'আমরা ত আছি, এমন ক'রে মুষড়ে পড়ার কি আছে ডাঃ কেম্প। ডাঃ কেম্প কাঁপা কাঁপা গলায়

উচ্চারণ করলেন—'আমাকে শয়তানটা খুন করার হুমকি দিয়েছে! আর আপনি বলছেন কিনা ভয় পাওয়ার কি আছে! তার নিষেধ সত্ত্বেও আমি পুলিশকে খবর দিয়েছি। রাগ ত হবারই কথা।'

ডাক্তার কেম্প এর কথা শেষ হলে একদল রাইফেলধারী পুলিশ তাকে সঙ্গে করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল।

কর্নেল এডি তাঁর ঘরে একা বসে অদৃশ্য মানবের ব্যাপারটা নিয়ে গভীর ভাবনায় মগ্ন। ঠিক তখনই অদৃশ্য মানবের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন, কর্নেল তোমার ওপর আমার কোন আক্রোশ নেই? তোমাকে হত্যা করব না। কিন্তু আমার একটা কাজ তোমাকে করে দিতে হবে। তুমি আবার ডাক্তার কেম্পের বাড়ি যাও।'

—'কেন? এই সুযোগে কাকে খুন করতে চাচ্ছ তুমি। তা হচ্ছে না'

'—আমার কথা শোন। প্রাণের মায়া থাকলে আমার কথার প্রতিবাদ কোরো না। বিশ্বাসঘাতক ডাক্তার কেম্পকে বাঁচাবার সাহায্য করলেও তোমার কোন লাভ হবে না। আমাকে সাহায্য করলে তোমার পক্ষে মঙ্গলই হবে কর্নেল।'

'—তুমি আমাকে হত্যা করলেও আমি তোমাকে কিছুতেই সাহায্য করতে পারব না।'

'তবে নরকেই যাও।' সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের মুখ দিয়ে আগুনের হল্কা বেরিয়ে এল। বিকট আর্তনাদ ক'রে কর্নেল চেয়ার সমেত মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন।

কর্নেলের মৃত্যুর কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার কেম্প এক অকল্পনীয় দৃশ্যের মুখোমুখি হলেন। তাঁর ঘরের বন্ধ দরজায় কে যেন সজোরে আঘাত হানতে শুরু করল। তিনি দরজার গোপন ছিদ্রের ফাঁক দিয়ে যা দেখলেন তাতে তার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম হয়ে গেল। গলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে এল দেখলেন, ধারে কাছে কোন মানুষের নামগন্ধও নেই। একটা কুড়োল আপনা আপনি ঘরের দরজায় আঘাত হেনে চলেছে। আর তারই ফলে সম্পূর্ণ বাড়িটা বারবার কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। তিনি প্রমাদ গণলেন। দরজা ভেঙে পড়লেই অদৃশ্য মানব গ্রিফিন ঘরে ঢুকে তাঁকে কচুকাটা করবে। ঠিক তখনই পুলিশের গাড়ী ডাক্তার কেম্পের সদর-দরজায় এসে দাঁড়াল। তাঁকে কর্নেল-এর মৃত্যু-সংবাদ দিতে এসেছে। সে-সঙ্গে ডাক্তার কেম্পকেও অদৃশ্য মানব সম্পর্কে অধিকতর সতর্ক ক'রে

দিতে এসেছে বন্দুক ধারী পুলিশগুলো। পুলিশের পায়ের শব্দ পেয়েই অদৃশ্য মানবের কুড়োলটাও কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। ডাক্তার কেম্প দরজা খুলে পুলিশদের নিয়ে তাঁর বৈঠক-খানার দিকে চললেন। হঠাৎ কে তাঁর গলাটা সজোরে চেপে ধরল। তাকে টানতে টানতে গ্রিফিন একেবারে দেয়ালের দিকে নিয়ে গেল। তিনি শ্বাসকষ্ট বোধ করায় গোঙাতে লাগলেন। তাঁর গোঙানি শুনে পুলিশদের একজন ঘাড় ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকাতেই তার বুকের ভেতরের ফুসফুস দুটো আচমকা মোচড় দিয়ে উঠল। দেখল, ডাক্তার কেম্পের শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম, মুখ ফ্যাকাসে-বিবর্ণ। চোখ দুটো রক্ত বর্ণ। চোখের মনি দুটো ইয়া বড় হয়ে গেছে। ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। জিভটা মুখের এক পাশে বেরিয়ে এসেছে। ঝুলছে। পুলিশটি তার এক সহকর্মীর জামা ধরে টেনে ডাক্তার কেম্প-এর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল। ভয়ার্ত স্বরে সে উচ্চারণ করল—'ডাক্তার কেম্প, অদৃশ্য মানবের কবলে পড়েন নি ত?'

এদিকে অদৃশ্যমানব সমূহ বিপদ বুঝে তাড়াতাড়ি ডাক্তার কেম্পের পকেট থেকে পিস্তলটা তুলে নিয়ে পুলিশদের দিকে তাক করল। গর্জে উঠল—খবরদার! এক পা এগিয়েছ কি কাউকে আর প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে হবে না! পুলিশরা থতমত খেয়ে কণ্ঠস্বরের মালিককে খুঁজতে লাগল। হঠাৎ দেখতে পেল, শূন্যে একটা পিস্তল ঝুলছে। আর সেটার মুখটা তাদেরই দিকে ফেরানো।

ডাক্তার কেম্প এনটু প্রকৃতিস্থ হয়ে পিস্তলটার পিছন দিকে এসে দাঁড়ালেন। অনুমান করে নিলেন অদৃশ্য মানবের শরীরটা কোথায় থাকতে পারে। এবার দু'হাতে জাপ্টে ধরলেন তাকে। এবার পুলিশদের একজন পিস্তলটা লক্ষ্য করে লাঠি চালাল। পিস্তলটা অদৃশ্য মানবের হাত থেকে মেঝেতে পড়ে গেল। ডাক্তার কেম্প পুলিশদের বললেন—'একজন গিয়ে তাড়াতাড়ি সদর—দরজাটা বন্ধ করে দিন। শয়তানটা যাতে পালাতে না পারে। আর তার আগে দরজার বাইরে যারা শিকারী কুকুর নিয়ে পাহারা দিচ্ছে তাদের ভেতরে নিয়ে আসুন। শয়তানটা ভয়ানক ক্ষেপে গেছে! যে কোন মুহূর্তে ভয়ঙ্কর কাণ্ড বাঁধিয়ে দিতে পারে। দুজন পুলিশ সদর-দরজার দিকে ছুটল।

এবার আরও ভয়ঙ্কর, আরও অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটতে দেখা গেল।

চকচকে ঝকঝকে একটা কুড়োল ডাক্তার কেম্পের দিকে এগিয়ে আসছে। পুলিশরা থমকে গিয়ে কর্তব্য সম্বন্ধে ভাবতে লাগল। ঠিক তখনই তাদের একজন কোমড় থেকে পিস্তল টেনে নিয়ে কুড়ুলটাকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দিল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল। ডাক্তার কেম্পের দিকে সেটা ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগল। এবার পুলিশদের একজন লাঠি দিয়ে কুড়ুলটার গায়ে সজোরে আঘাত হানল। কুড়ুলটার পায়ে লাঠির ঘা লাগল না বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আর্তনাদ শোনা গেল—'বাবারে! মারে। গেছি—গেছিরে! তারপরই আবার ভোজবাজির মত মব মিলিয়ে গেল। পরিস্থিতি এবার স্বাভাবিক হয়ে গেল।

ডাক্তার কেম্প-এর প্রতিবেশী মিঃ হিলাস। তিনি নির্বিবাদী মানুষ। নিজেকে নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত। ডাক্তার কেম্প-এর বাড়িতে যে সেই তখন থেকে লঙ্কাকাণ্ড ঘটে চলেছে তা নিয়ে তাঁর কোন মাথাব্যথা নেই। বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ করে তিনি পরিবারের সবাইকে নিয়ে ব'সে আছেন। শুনলেন, কে যেন তাঁর ঘরের দরজার কড়া নাড়ছে। তিনি চেঁচিয়ে পরিবারের সবাইকে সতর্ক করে দিতে গিয়ে বললেন সাবধান! সাবধান! অদৃশ্য মানব আমাদের বাড়িতে চড়াও হয়েছে।

এমন সময় তিনি দরজায় ডাক্তার কেম্প-এর আর্তস্বর শুনতে পেলেন মিঃ হিলাস, দয়া করে দরজা খুলুন। দরজা খুলুন।'

মিঃ হিলাস বিরক্তির সঙ্গে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন—'দূর মশাই! আপনার ওপর অদৃশ্য মানবের শ্যেনদৃষ্টি পড়েছে। আপনাকে জায়গা দিয়ে নিজের প্রানটা বেঘোরে খোয়াব নাকি! দুঃখিত! আমাকে ক্ষমা করবেন!

ডাক্তার কেম্প উন্মাদের মত দরজায় লাথি মারতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে রাস্তায় নামলেন। উন্মাদের মত রাস্তা দিয়ে পড়ি কি মরি করে ছুটতে লাগলেন। পিছনে কার যেন পায়ের শব্দ তাঁর কানে এল। প্রথমে ভাবলেন, মনের ভুল। মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হয়ে অবাঞ্ছিত শব্দটা শোনার চেষ্টা করলেন। পায়ের শব্দই বটে। অদৃশ্য মানব গ্রিফিন তাঁর পিছু নিয়েছে। তিনি গতি আরও বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু এ-বয়সে আর কত জোরে ছোটা যায়। কিন্তু প্রাণের দায় বড় দায়। আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাঁকে। পিছন দিক থেকে কে যেন তার গলা চেপে ধরল। বুঝতে অসুবিধা হল না, অদৃশ্য মানবেরই কাজ। বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ সে কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেবে এবার।

নদীর ঘাটে নাবিকরা নৌকো বেঁধে গল্প করছে। গল্প ঠিক নয়, অদৃশ্য মানবের কথাই বলাবলি করছে। তারা ডাক্তার কেম্প-এর আর্তনাদ শুনে লগা, বৈঠা হাতের কাছে যে যা পেল নিয়ে ছুটে এল। ডাক্তার কেম্প-এর চারদিক ঘিরে তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের একজনের হাতে রয়েছে একটা কোদাল। সে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কোদালটাকে ঘুরাতে লাগল ডাক্তার কেম্প-এর চারদিকে। এমন সময় একটা বিকট আর্তনাদ শোনা গেল—আঃ আঃ—আঃ! ব্যস, ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। চাপ চাপ রক্ত রাস্তায় জমা হতে লাগল। এবার সবাই চীৎকার চেঁচামেচি করে আতঙ্কে জাপটা-জাপটি শুরু করে দিল। সমস্বরে বলে উঠল পেয়েছি! পেয়েছি বলে অদৃশ্য মানবকে তারা ধরে ফেলল। অদৃশ্য মানব আচমকা একটা ঝাঁকুনি দিল। নাবিকরা চোখের পলকে চারদিকে ছিটকে পড়ল। এবার একজন নাবিক রেগে মেগে বৈঠা ঘুরাতে লাগল। ক্রমে আর্ত নাদটা তীব্রতর হ'ল। ডাক্তার কেম্প চীৎকার করে বললেন—'লোকটাকে মেরে ফেলবে নাকি! প্রাণে মেরো না। শাস্তি দেবে কোর্ট। আইন হাতে তুলে নিয়ো না তোমরা।

প্রচণ্ড একটা শব্দ হল। মাটিতে ধপাস করে পড়ে গেল। ক্রমে গ্রিফিন এর দেহটা উপস্থিত জনগণের চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল। অদৃশ্য মানব দৃশ্য হল এবার। ডাক্তার কেম্প তাঁর এক সময়ের সহপাঠী গ্রিফিনকে চিনতে পারলেন। তার মাথার ক্ষতটা দিয়ে রক্তক্ষরন হচ্ছে। বার কয়েক মাটিতে পড়ে দাপাদাপি করে এক সময় এলিয়ে পড়ল। পথের ওপর এলিয়ে পড়ল গ্রিফিন-এর প্রাণহীন দেহটা।

———

জুপিটার, পিট আর বব তিন কিশোর। তিন বন্ধু রহস্যভেদের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। সরকারী গোয়েন্দা অবশ্যই নয়। আবার বে-সরকারী পেশাদারী গোয়েন্দাও নয়। নিছকই সখের গোয়েন্দা যাকে বলে। তবে এ কাজে তাদের দক্ষতা কম-বেশী যতটুকুই থাক না কেন, ঝোঁক কিন্তু পুরোদস্তুর।

এক বিকেলে এফ পোড়োবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রহস্যভেদী দুই বন্ধু কথাবার্তায় মগ্ন। অন্যমনস্কভাবে ঘাসের গোড়া দাঁত দিয়ে চিবোতে চিবোতে পিটি বলল—'আহা! এই ত ক'দিন আগে মিঃ হিচকক তাঁর 'বেস্ট ঘোষ্ট' ছবিটার স্যুটিঙের ব্যাপারে একটা ভূতুড়ে বাড়ির খোঁজে হন্যে হয়ে খোঁজাখুজি করছিলেন। তখন তাঁকে এ-বাড়িটার খোঁজ দিতে পারলে ভদ্রলোকের খুবই উপকার হত।

বব নীরবে হাতের টেপ রেকর্ডারটা নিয়ে খুটখাট করতে লাগল, পিটি'র কথার উত্তর দিল না। কথাটা লক্ষ্য করেছে কিনা তাও বুঝা গেল না।

আবছা অন্ধকারে তাদের সামনে বিশালায়তন বাড়িটা ভূতের মত মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। চারদিকে আগাছার ঝোপঝাড়। অনাদরে আর নিরবচ্ছিন্ন অবহেলায় বাড়িটা। আজ ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র পূর্বস্মৃতির সাক্ষী স্বরূপ অবস্থান করছে। বাড়িটা একেবারেই নিঃসঙ্গ। যতদূর চোখ যায় চারদিকে কেবল ছোট-বড় গাছ আর আগাছার একাধিপত্য। জনবসতির চিহ্নমাত্রও নেই। পাকাবাড়ি ত দূরের কথা, একটা কুড়েঘর পর্যন্ত চোখে পড়ে না। রাত্রিবেলা ত দূরের কথা, দিনের আলোতে নিতান্ত সাহসী যুবকেরও একা আসতে বুকের মধ্যে ধুকপুকানি শুরু হয়ে যাবে। আকাশের চাঁদের ফালিটা গুটি গুটি অনেকটা উঠে এসেছে। উইলো গাছের কাঁক দিয়ে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করছে। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে দু একটা রাতজাগা পাখি বিশ্রী স্বরে ডাকাডাকি করছে। বব টেপ রেকর্ডারের মুখটা জঙ্গলের দিকে এগিয়ে দিয়ে রাত্রির রোমাঞ্চকর শব্দ গুলোকে ধরে নেবার জন্য ব্যস্ত। বন্ধুবর পিটির কথায় কান দেবার মত সময় ও মানসিকতা উভয়েরই নিতান্ত অভাব। একটা পাখি অকস্মাৎ বিশ্রি স্বরে গুঙিয়ে উঠল। ব্যস, পরমুহূর্তেই "অ্যাঁ অ্যাঁ—অ্যাঁ বুক কাঁপানো একটা শব্দ বাড়িটার ঠিক গা বেয়ে তার কানে ভেসে এল। পেতাত্মার সুতীব্র গোঙানি। মুহূর্তে যন্ত্রচালিতের মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বব। পিটিও কম ঘাবড়ে গেল না। আচমকা দু পা সরে এসে বব-এর পা-ঘেষে দাঁড়াল। ভীত-সন্ত্রস্ত কন্ঠে বলল—'কি ব্যাপার, বল ত বব? আমার ত মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না!

'—হ্যাঁ, আমিও ত তা-ই ভাবছি। কিসের গোঙানি! মানুষ বা কোন জন্তু-জানোয়ার ত এরকম স্বর করে গোঙাতে—

কাঁপা কাঁপা গলায় পিটি এবার বলল—'ছাড়ান দে ভাই। অভিযানের আর দরকার নেই বাবা! খুব হয়েছে। চল, পালিয়ে যাই। আচ্ছা বব, গোঙানির শব্দটা বাড়ির ভেতর থেকেই ত এল, নাকি বাড়ির পিছনের জঙ্গল থেকে - বল ত!

পিটি নীরব চাহনি মেলে এদিক ওদিক তাকিয়ে আকস্মিক ব্যাপারটা সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত ধারণা করে নিতে আত্মমগ্ন হল। পিটির কথা

তার কানে গেল কিনা বুঝা গেল না।

এদিকে ভয়ার্ত সে অবাঞ্ছিত কণ্ঠস্বরটা পিটিকে খুবই ভাবিয়ে তুলেছে। কিন্তু অতীতে যা কিছু ঘটেছে, দেখা গেছে, সে-ই সব চেয়ে বেশী সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু ভূত-প্রেতের ব্যাপারে অন্য সময় সে একেবারে মিইয়ে যায়।

বব-এর আচরণ পিটিকে বড্ড ভাবিয়ে তুলেছে। তার আচরণে ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে লাগল। কেন সে যে ভূতুড়ে বাড়িটা ছেড়ে যেতে এমন গড়িমসি করছে ভেবে পাচ্ছে না। পিতৃদত্ত জীবনটা নিয়ে এখন মানে মানে পালাতে পারলে বাঁচা যায়। অস্থিরচিত্ত পিটি বব-এর জামা ধরে হেঁচকা টান দিয়ে আগের মতই কাঁপা কঁপা গলায় বলে উঠল—চল না ভাই, এখান থেকে কেটে পড়ি! তোর যে হঠাৎ কি মতি হ'ল ভেবে পাচ্ছি নে!

বব হাত বাড়িয়ে পিটির হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলল—,কেন ব্যস্ত হচ্ছিস! একটু দাঁড়া, শব্দটা যদি আবার হয় তবে টেপে তুলে নেব।

বব-এর সাহস পিটির মধ্যে বিস্ময়ের সঞ্চার করল। বব বারান্দার শেষ প্রান্তে যেতে যেতে স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলল - 'জুপিটার-এর কথাটা পুরো ব্যাপারটাই ভাল ভাবে দেখা দরকার; মনে নেই তোর?

' অনেক হয়েছে ভাই। চল, এবার জীবন নিয়ে পালাই। বাপরে বাপ! এ কী শব্দরে বাবা! আমার বুকের ভেতরে ফুসফুস দুটো যেন আচমকা মোচড় মেরে উঠেছে। আর টেপ করা দরকার—'

পিটি'র মুখের কথা শেষ হবার আগেই আবার সে রহস্যজনক ভয়ঙ্কর শব্দটা শোনা গেল 'অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ।'

পিটি'র অবস্থা সঙ্গীন হয়ে এল। মুহূর্তে তার মুখ চোখের মত সাদা হয়ে গেল। কোন্ অদৃশ্য শক্তি যেন তার মুখের রক্তটুকু নিঃশেষে শুষে নিয়েছে। চোখের তারায় আতঙ্কের ছাপ এঁকে বব-এর মুখের দিকে তাকাল। তার হাতের টর্চটা হঠাৎ হাত থেকে পড়ে গেল।

বব-এর অবস্থাও এবার ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়ার মত। হাতের টেপ-রেকর্ডারটা হাত থেকে পড়ে গেল না বটে। কিন্তু সেটা সহ হাতটা থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল।

বব নিজেকে একটু সামলে নিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল—পিটি, ব্যাপারটা কিছু অনুমান করতে পারলি?'

'—আমার কিছুই মাথায় আসছে না ভাই। আগে এ মৃত্যুপুরী থেকে পালাই চল।'

'—তারপর না হয় গবেষণা করে দেখা যাবে, এটা কিসের শব্দ।'

'—ঠিক আছে। তাই চল, বাড়ি ফিরে যাওয়া যাক। এদিকে রাত্রিও অনেকই হয়েছে।

' হ্যাঁ ভাই চল এ-এলাকা ছেড়ে আগে পালাই।'

বব ও পিটি জমাট বাঁধা অন্ধকার ভেদ করে পাশাপাশি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এগিয়ে চলেছে অদূরবর্তী ফার গাছটার দিকে। তারা দু'চার পা যেতেই গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে একটা বিশালায়তন মূর্তি তাদের পথ রোধ করে দাঁড়াল। অবাঞ্ছিত মূর্তিটা যেমন লম্বা, আয়তনেও ঠিক তেমনি বিশাল। দুই বন্ধু অকস্মাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পিটি'র গলা পর্যন্ত শুকিয়ে এল। আর বব? সে এমনই ভয় পেল যে একটু আগে শোনা সে-রহস্য-জনক 'অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ' শব্দটা যেন অবিকল তারই গলা দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল। তবে কাঁপা কাঁপা ও খুবই ক্ষীন তার কন্ঠস্বর।

পিটিও বব'কে আরও অবাক করে দিয়ে এক দীর্ঘাকৃতি ও বিশাল দেহধারী ভারী মনুষ্যকন্ঠে বলে উঠল—কি ব্যাপার বল ত?

দুই বন্ধু বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে অদ্ভুত দর্শন লোকটার দিকে তাকাল। নির্বাক নিষ্পন্দ। কথা বলার মত সামান্যতম শক্তিও যেন তাদের নেই।

অদ্ভুত দর্শন লোকটা এবার বলল—'কি ব্যাপার, তোমরা চুপ করে রইলে যে বড়! কেমন অদ্ভুত একটা শব্দ হ'ল না? তোমরা শোন নি?'

দুই বন্ধু আগের মতই গা ঘেঁষাঘেঁষি করে, নীরব চাহনি মেলে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল।

'—আমি আরও ভাবলাম, তোমরাই আকস্মিক ভীতি বশতঃ এমন বিশ্রি স্বরে গুঙিয়েছিলে।' লোকটা কন্ঠস্বরের স্বাভাবিকতাটুকু বজায় রেখেই কথাটা ছুঁড়ে দিল।

বব সবে মুখ খুলতে যাবে। কিন্তু তাকে সুযোগ না দিয়েই পিটি কাঁপা কাঁপা গলায় জবাব দিল—'আমরা? কই, না ত! আমরা কোন শব্দ করি নি ত!'

'—তবে? কিসের আওয়াজ সেটা?'

'—কিসের আওয়াজ তা আমরা জানব কি করে ? তবে অবাঞ্ছিত সে আওয়াজটা শুনে মনে হল—বাড়ির ভেতরে কে যেন হঠাৎ গুঙিয়ে উঠল। নির্ঘাৎ ভূতের আওয়াজ। ভূতের কন্ঠস্বরটা বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে বলেই মনে হল।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে লোকটা বলে উঠল—'ভূত ? ধ্যুৎ, কিসের আবার ভূত ! ভুত আসবে কোত্থেকে !'

'—আমরা যে শুনলাম !' পিটি প্রতিবাদের স্বরে বলল।

'—সে-ত আমিও আওয়াজটা শুনে। তবে ভূতটুত বাজে কথা।'

সাহসে ভর করে বব এবার মুখ খুলল—'ভূত না হয় না-ই হল। কিন্তু আপনি কি বলছেন ? কিসের আওয়াজ সেটা।'

অদ্ভুত দর্শন লোকটা আগের মত স্বাভাবিক স্বরেই কথাটা ছুঁড়ে দিল—। ধ্যুৎ ভূতটুত কিছুই না। কুকুরটুকুরের ব্যাপার হবে। মাঝে মাঝে কুকুররা এমন করুন স্বরে কাঁদে শুনেছি। বিশ্রী স্বর ক'রে ডাকা-ডাকি করে—'

'কুকুর ! আপনি বলতে চাইছেন। ওটা কুকুরের কন্ঠস্বর।'

লোকটা কিছু বলার জন্য সবে মুখ খুলতে যাবে অমনি অদূরে কয়েকজন মানুষকে কথা বলতে বলতে সেদিকে এগিয়ে যেতে দেখা গেল। আর একটু কাছে আসতেই তাদের কথাবার্তা পরিষ্কার বুঝা গেল। একজন বলল—'কি হে, ব্যাপারটা যেন কেমন ঠেকছে !'

দ্বিতীয়জন বলল—'তাই ত, গ্রীণ হাউসে লোক এসেছে নাকি ?'

'—লোক আসবে কোত্থেকে ? দীর্ঘদিন বাড়িটা ত ফাঁকাই পড়ে রয়েছে। কার গর্দানে ক'টা মাথা যে পরিত্যক্ত বাড়িটায় বসবাস করতে আসবে !'

'—নইলে কথা বলছে কারা ? এই মাত্র কারা যেন কথা বলছিল, তোমরা শুনতে পাও নি ?'

এদিকে বব আর পিটিও ভাবছে, ইদানিং গ্রীন হাউসে বুঝি আবার মানুষ বসবাস করতে শুরু করেছে। তারা অবশ্য একটু আগেই পরিত্যক্ত বাড়িটা থেকে ঘুরে এসেছে। সেখানে লোক বসতির কোন চিহ্নই তাদের চোখে পড়েনি। তবে একটু সময়ে, টর্চের আলোয় কতটুকুই বা দেখেছে, বুঝতেই বা পেরেছে কতটুকু। জরুরী প্রয়োজনে তালা বন্ধ করে এদিক ওদিক গিয়েছিল হয়ত। কাজ সেরে এখন ফিরে আসছে। আবার এমনও

হতে পারে ভূতুরে আওয়াজটা শুনে হয়ত দলবেঁধে বাড়িটার দিকে আসছে।

বব ও পিটি আবার উৎকর্ণ হয়ে আগন্তুকদের কথাবার্তা শুনতে লাগল। তাদের একজন এবার বলল—'কি হে ভায়া, কি বুঝছ?'

'—হ্যাঁ, তোমার কথাই ঠিক। আমারও মনে হচ্ছে ব্যাপারটা সুবিধের নয়।'

'—আমার ত মনে হয় মোটেই ব্যাপারটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দেয়া উচিত নয়।'

'—তুমি তবে কি পরামর্শ দিচ্ছ ভায়া?'

'—কি আবার, ব্যাপারটা পুলিসের কানে অবশ্যই তোলা দরকার বলে আমি মনে করছি।'

—দরকার হলে পুলিসের শরণাপন্ন হতেই হবে। তার আগে চলই না, একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি কিছু উদ্ধার হয় কিনা। এমনও হতে পারে আমরা যা আশঙ্খা করছি সবই অমূলক। জানোয়ার টানোয়ারের ব্যাপারও ত হতে পারে। চারদিকে যা জঙ্গল, সেরকম কিছু হওয়াও বিচিত্র নয়।

তাদের আগেই আরও দু'জন অন্য পথে এগিয়ে এসে পথের বাঁকে দাঁড়িয়েছিল। তাদের একজনের সঙ্গে একটা কুকুর রয়েছে। সবারই উদ্দেশ্য রহস্যজনক আওয়াজটার উৎস নির্দ্ধারণ। তারা পরস্পরের মধ্যে কথা ব'লে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিল, এগিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত ধারনা নেবেই।

কুকুরওয়ালা লোকটা অন্যান্যদের সাহস দিতে গিয়ে বল্‌ল—'চলুন ত মশাই। এগিয়ে গিয়ে দেখাই যাক না ব্যাপারটা কি? আমার শিকারী কুকুরটা ত সঙ্গেই রয়েছে।'

অন্য আর একজন তার কথা সমর্থন করতে গিয়ে বল্‌ল—'ঠিকই ত। ছুটোছুটি করে এসে রহস্যটার একটা হিল্লে না করেই এত কাছে এসে ফিরে যাবেন নাকি! ওনার সঙ্গে কুকুর রয়েছে, আমার সঙ্গে বড় টর্চ—ভয়ের কি আছে! চলুন—চলুন এগিয়ে গিয়ে দেখে আসা যাক।' কথা বলতে বলতে টর্চ জ্বেলে লোকটা পরিত্যক্ত বাড়িটার দিকে এগিয়ে চল্‌ল। অন্যান্যরা তাকে অনুসরন করল।

পিটি'র চোখের তারায় তখনও আতঙ্কের ছাপ সুস্পষ্ট। সে তার বন্ধু

রব-এর কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রায় অস্ফুট স্বরে বলল—'কিরে ব দাঁড়িয়ে পড়লি যে? অহেতুক সময় নষ্ট করে কি লাভ? চল বাড়ি পালাই।'

বব বেঁকে বসল। সে বল্‌ল—'সে কীরে পিটি! বাড়ি পালাবি কিরে! এমন রহস্যজনক একটা ব্যাপার হাতের মুঠোয় পেয়ে শেষ পর্যন্ত অল্পের জন্য -'

' বাজে কথা ছাড়ান দিয়ে এখন হাঁটত। খুব হয়েছে, রহস্য উদ্ঘাটন করে আর দরকার নেই।'

'—ধ্যাৎ! ভীতু কোথাকার!'

' ধ্যাৎ কি রে বব!'

'—আওয়াজটা কিসের না জেনে ফিরে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?

'—তবে? তুই ওই মরণ ফাঁদে মাথা না গলিয়ে ছাড়বি না।'

'—কেবলমাত্র আমিই নয়। তোকেও যেতে হবে পিটি! এত গুলো লোক, শিকারী কুকুর আর টর্চ'ত সঙ্গেই রয়েছে। ভয়ের আর কি থাকতে পারে, তুই কি বলত পিটি।' কথাটা শেষ করে বব পিটি'র হাত ধরে ছোট্ট একটা টান দিয়ে এবার বল্‌ল—'চল, এতগুলো লোক থাকতে ভয়ের কি যে থাকতে পারে, সে বুঝছি না।'

পিটি ভীত সন্ত্রস্ত হলেও অনন্যোপায়। বেগতিক দেখে সে বব-এর সঙ্গে হাঁটতে লাগল।

অপরিচিত লোকগুলো ইতিমধ্যে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। উপায়ান্তর না দেখে পিটি তার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু বব-এর সঙ্গে পা মিলিয়ে দুরু দুরু বুকে এগিয়ে চল্‌ল।

রহস্যজনক পরিত্যক্ত বাড়িটার সদর-দরজার সামনে গিয়ে রহস্য সন্ধানীরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সদর দরজা বেশ, বড়সড়। কাঠের পুরু তক্তা দিয়ে বেশ মজবুত করে তৈরী।

টর্চের আলো দরজাটার গায়ে বার দু-'তিন বুলিয়ে নিয়ে নিঃসন্দেহ হ'ল—সদর-দরজার তালা দেয়া নেই। তবে ভেতর থেকে খিল বা শিটকিনি দেয়া কিনা, বুঝা গেল না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। দরজার পাল্লায় ধাক্কা দিতেই বিকট একটা ক্যাচ্ ক্যাচ্ আওয়াজ তুলে দরজা খুলে গেল। বেশ ভারী পাল্লা ও দীর্ঘদিন অব্যবহারে

কব্জায় মরচে পড়লে খোলা ও বন্ধ করার সময় যেমন বিকট আওয়াজ হয় ঠিক সেরকম আওয়াজ করে দরজাটা খুলে গেল।

সদর-দরজায় দাঁড়িয়ে বাড়িটার ভেতরের দিকে উঁকি দিয়ে টর্চের আলো ফেলতেই চোখের সামনে বিশাল একটা উঠোন সবার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ফাঁকা। চারদিকে ময়লা আবর্জনা। মনে হ'ল দীর্ঘদিন ঝাঁটার স্পর্শ পায় নি।

কুকুরওয়ালা লোকটা দু'পা এগিয়ে উঠোনটাকে ভাল করে দেখে নিল। লম্বা একটা বারান্দা দেখা যাচ্ছে। সাহসে ভর করে সে ভেতরে এগিয়ে গেল। অন্যরা গুটিগুটি তাকে অনুসরণ করল।

লম্বা বারান্দা দিয়ে তারা এগিয়ে চল্‌ল। বারান্দার শেষ প্রান্তে দোতলায় উঠার সিঁড়ি। কাঠের তৈরী। জীর্ণ দশা। পা দিতেই দুলে উঠল। সে সঙ্গে বিশ্রী স্বরে অক্ষমতা প্রকাশ করতে লাগল।

কুকুরওয়ালা লোকটা কি ভেবে সিঁড়ি থেকে পা নামিয়ে আনল। তার সহায়তায় তারা এখনও বারান্দার কাছে উঠোনেই দাঁড়িয়ে। দুরু দুরু বুকে এখনও কর্তব্য নির্দ্ধারন করে উঠতে পারছে না। টর্চ জেবলে বাড়িটার ওপর-তলা সম্বন্ধে ধারনা নেবার চেষ্টা করল। সিঁড়িটার মতই দোতলায় বারান্দাটার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়েছে। ছাদটা একদিকে হেলে পড়েছে। তবে রেলিংটা মোটামুটি শক্তই আছে এখনও।

একে ত ঘুটঘুটে অন্ধকার, তার ওপরে এতবড় একটা বাড়ি জঙ্গল পরিবেশে দীর্ঘদিন নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়ে। সঙ্গে লোকজন যতই থাক না কেন, গা ছমছম করতে বাধ্য। চারদিকে এমন নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে যে, নিজের পায়ের শব্দে, নিজের নিঃশ্বাসের শব্দে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল।

দীর্ঘদেহী বিশালায়তন লোকটা বছর পঞ্চাশেক আগে এ-বাড়ির মালিক ছিলেন এক বৃদ্ধ। নাম তাঁর ম্যাথিউস। এক দর্ঘটনায় তার আকস্মিক মৃত্যু ঘটেছিল।'

পিটি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দীর্ঘদেহী লোকটার মুখের দিকে তাকাল।

লোকটা এবার বল্‌ল—'দুর্ঘটনায় বলতে ঐ যে সিঁড়িটা দেখা যাচ্ছে ওটা থেকে আচমকা গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

পাশ থেকে আগন্তুকদের একজন বলে উঠল—লোকে বলা বলি করে

ম্যাথিউস গ্রান-এর প্রেতাত্মা এ-বাড়িতে নাকি ঘুরে বেড়ায় ?'

দীর্ঘদেহী লোকটা নির্বাক। কথাটা না শোনার ভান করে এদিক-ওদিক আকাতে লাগল।

এবার সবাই বারান্দায় উঠে গেল। টর্চের আলোয় এক-তলার ঘর-গুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। সবগুলো ঘরই ফাঁকা। ময়লা আবর্জনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ময়লা বলতে চামচিকে, পায়রা আর ছুঁচোর বিষ্ঠা। দীর্ঘদিন ধরে জমা হতে হতে পাহাড় হয়ে উঠেছে।

আমাদের মধ্য থেকে একজন বল্‌ল—'চল, এগিয়ে যাওয়া যাক। এসেছি যখন সব কিছু ভালভাবে ঘুরে ঘুরে না দেখে ফিরে যাওয়া নেই।'

আমরা আরও কয়েক পা এগিয়ে পাশের ঘরটার দরজায় দাঁড়ালাম। দরজা বন্ধ। তবে তালা দেয়া নয়।

আমাদের মধ্য থেকে একজন প্রায় ফিসফিসিয়ে ব'লে উঠল—'চুপ! চুপ করুন! কিসের যেন একটা অস্বাভাবিক শব্দ কানে এল। আপনারা শোনেন নি কিছু ?

সবাই নির্বাক। লম্বা-ভদ্রলোক আবার কিছু বলার উদ্যোগ করলেন। ঠিক সে-মুহূর্তেই আমাদের সঙ্গীদের একজন বিকট স্বরে আর্তনাদ করে উঠল—'ওরে বাবারে!' ব্যস, পর মুহূর্তেই তার কণ্ঠ রোধ হয়ে গেল, কোন অদৃশ্য হাত যেন সজোরে তার কণ্ঠনালী চেপে ধরল। বাক শক্তি হারিয়ে ফেলল সে।'

আমরা সবাই সচকিত হয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। টর্চ ত সবেধন নীলমণি। একটা টর্চ ত আর কতদিকে আলো দিতে পারবে।

অকস্মাৎ আগন্তুকরা সচকিত হয়ে উঠল। সদর দরজার দিকে চোখ পড়তেই সবার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। শরীরের সব ক'টা স্নায়ু এক সঙ্গে ঝনঝনিয়ে উঠল। শুরু হয়ে গেল বুকের মধ্যে ধুকপুকানি। দেখল, সদর-দরজাটা জুড়ে একটা আবছা সবুজ মূর্তি। গায়ে একটা আলখাল্লা। ভয়ালদর্শন মূর্তিটার হাত দুটো ঊর্ধমুখী। সোজাভাবে ওপরের দিকে তুলে দেয়। ব্যাপারটা আরও আতঙ্কের সঞ্চার করল যখন দেখল, মূর্তিটা ধীরে ধীরে দোল খাচ্ছে। দরজার ওপরের দিকে যেন সুতো দিয়ে হাল্কা শোলার একটা মূর্তিকে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে।

আকস্মিক ব্যাপারটা সবাইকে হতভম্ব করে দিল। বাকশক্তি হারিয়ে

ফেলল যেন সবাই। ভীতির কারণ সে মূর্তিটা আবার সদর-দরজা আগলে দাঁড়িয়ে। তারা যে পালিয়ে বাঁচবে সেরকম সম্ভাবনাও বন্ধ।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার হাত থেকে পিটি দৌড় মেরে টর্চটা নিয়ে নিল। কাঁপা কাঁপা হাতে মূর্তিটার ওপর অতর্কিতে আলো ফেলার চেষ্টা করল। আশ্চর্য ব্যাপার। টর্চ জ্বলছে না। পিটি এবার আর নিজেকে শক্ত রাখতে পারল না। ভূ—ত ব'লে কাঁপা কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল। আতঙ্কে বব-এর একটা হাত জড়িয়ে ধরে আবার ক্ষীণ কণ্ঠে ব'লে উঠল—। 'ভূ—ত! ভূ—ত!'

এতক্ষণে এক পা দু'পা করে বয়স্ক আগন্তুকরা পিছোতে লাগল। কিন্তু কতদূর আর যাবে। কয়েক পা যেতেই দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেল। এবার দাঁড়িয়ে হতাশ চোখে সবাই পুচকে ছোড়া দুটোর দিকে তাকিয়ে রইল।

পিটি আর বব ভীত-সন্ত্রস্থ মনে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। বব এবার হেঁচকাটানে পিটির হাত থেকে টর্চটা ছিনিয়ে নিল। সুইচ টিপতেই অত্যুজ্জ্বল আলো সবুজ ছায়া মূর্তিটার গায়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। যন্ত্র চালিতের মত ছায়ামূর্তিটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

পিটি এবার নিজের ভুল বাঝতে পারল। আতঙ্ক তাকে এমনই পেয়ে বসেছিল যে, সে টর্চের সুইচ টিপতেই ভুলে গিয়েছিল। আলো জ্বলবে কি করে?

ভয়ালদর্শন সবুজ ছায়া মূর্তিটা অদৃশ্য হতেই বয়স্ক আগন্তুকরা হৃত সাহস ফিরে পেল। সবাই এক পা দু'পা করে এগিয়ে আবার পিটি ও বব-এর কাছে এসে দাঁড়াল। কুকুরওয়ালার বীরত্ব তখন দেখে কে! কুকুরটাও যেন এতক্ষণ ভয়ে মুষড়ে পড়েছিল। এতক্ষণে প্রাণশক্তি ফিরে পেয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় বার কয়েক ঘেউ ঘেউ করে প্রভুর সন্তোষ উৎপাদনে প্রয়াসী হয়ে উঠল।

কুকুরওয়ালা কুকুর নিয়ে বীরদর্পে সদর-দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল। কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে তার শতর্কতা ও উপস্থিতি ঘোষণা করতে প্রানান্ত প্রয়াস চালিয়ে যেতে লাগল।

কুকুরওয়ালা দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বাইরের আগাছার ঝোপঝাড়ের ওপর বার কয়েক চোখ বুলিয়ে নিল। না, কোথাও কিছু নেই। সব ভোঁ—ভাঁ! এবার বাড়ির বাঁ-দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করতেই হাতে ধরা

কুকুরের শিকলটা হঠাৎ অস্বাভাবিক রকম ঝন ঝনিয়ে উঠল। তার হাতটা এত কাঁপছে যে, শেকলটা ধরে রাখার মত শক্তিটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে যেন। সে ভাঙা ভাঙা গলায় কোনরকমে উচ্চারণ করল - 'ঐ ঐ যে! ওইখানে দাঁড়িয়ে!

বব টর্চ নিয়ে ছুটে গেল। টর্চের আলো ফেলতে না ফেলতেই রহস্যজনক মূর্তিটা আবার মুহূর্তে কর্পূরের মত উবে গেল।

সবাই আবার উঠোনে ফিরে এল। বয়স্কদের দু'-একজন ইতিমধ্যেই মনস্থির করে ফেলেছে, এ মৃত্যুপুরী ছেড়ে পালিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। শেষ পর্যন্ত পিতৃদত্ত জীবনটাকে এভাবে বেখোরে দেবে নাকি। তাদের দু'-তিন জন যখন কর্তব্য নির্দ্ধারণে ব্যস্ত ঠিক তখনই রহস্যজনক সবুজ মূর্তিটাকে বারান্দার রেলিঙের কাছে দেখা গেল। আগের মতই আলখাল্লা গায়ে। হাত দুটো ওপরের দিকে তোলা। আলতোভাবে শূন্যের ওপর দোল খাচ্ছে।

বব বলল—'জানিস পিটি, ব্যাপারটা আমার কাছে যেন অন্যরকম মনে হচ্ছে।' মনে হচ্ছে ভূত-টুত কিছু না। আসলে আমাদের সঙ্গে একজন স্রেফ মজা করছে। লুকোচুরি খেলছে!'

'—চল, এগিয়ে যাই। ওপরে উঠে দেখি, আসল রহস্যটা কি? কথা বলতে বলতে তারা সিঁড়ির দিকে গুটিগুটি এগিয়ে গেল। পুঁচকে ছোড়াটার কথায় বয়স্ক লোকগুলোর মধ্য থেকে দু'জন সাহসে ভর করে তাকে অনুসরণ করল।

সিঁড়ির অবস্থা খুবই সঙ্গীন। একেবারে লড়বড়ে। তারা এক এক ক'রে দুরু দুরু বুকে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। একে ভূতের ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম, তার ওপর সিঁড়িটার বিশ্বাস ঘাতকতার সম্ভাবনাও কম নয়। যেকোন সময় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে কেলেঙ্কারী ঘটাতে পারে।

বব-এর হাতের টর্চের আলো ছড়িয়ে পড়তেই অদ্ভুত দর্শন ভয়াল সে-মূর্তিটা চোখের পলকে বাতাসে মিলিয়ে গেল।

বব সিঁড়ি বেয়ে ওপর-তলার বারন্দায় পা দিল। তার অনুসরণ-কারীরা এক এক করে উঠে তার কাছে পৌঁছে গেল। বব বলল—'আর এগোবেন না!'

বয়স্ক লোক দুটো তার মুখের দিকে নীরবে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে

তাকাল। বব বলল—আর এগোবেন না। এখানেই দাঁড়ান। আগে টর্চের আলো ফেলে দেখি, ধুলোর ওপর কারো পায়ের ছাপ পাওয়া যায় কিনা। আমাদের আগে কেউ এখানে এলে তার পায়ের ছাপ অবশ্যই মেঝের ধুলোর ওপর পড়বেই।'

কথা বলতে বলতে বব হাতের টর্চটা জ্বালল। মেঝের ওপর আলো ফেলে অনুসন্দিৎসু দৃষ্টি মেলে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। তার সঙ্গের লোক দুটোও ধীরে-পায়ে এগিয়ে মেঝের ওপর চোখ বুলাতে লাগল।

হায়! দীর্ঘ সময় ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেঝেটা পরীক্ষা করেও কারো পায়ের ছাপ ত দূরের কথা ধুলোর ওপর একটা আঁচড়ও চোখে পড়ল না।

ভূত-প্রেতের ব্যাপারে বব-এর কোনদিনই বিশ্বাস ছিল না। আজ সব কিছু দেখে, বারান্দার মেঝে পরীক্ষা করার পর মনটা অকস্মাৎ কেমন দুর্বল হয়ে পড়ল। তার চোখের তারায় ভীতির ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এখন আর জোর দিয়ে প্রতিবাদ করার মনের বল যেন আজ নিঃশেষে মিলিয়ে গেল। সে আপন মনে ব'লে উঠল—'সত্যি কি তবে ভূতের অস্তিত্ব আছে?'

বিষন্ন মনে বব আর তার অনুসরণকারী বয়স্ক লোক দুটো সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এল। সেদিন আর কোন ঘটনা ঘটল না।

সবাই ভুতুড়ে বাড়িটার উঠোনে দাঁড়িয়ে, দীর্ঘ সময় ধরে অত্যাশ্চর্য ব্যাপারটা সম্বন্ধে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করল।

এক সময় ভূতুড়ে বাড়িটা ছেড়ে সবাই বেরিয়ে এল। সমস্যা নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিল। টর্চের মালিকের সঙ্গ ছাড়তে কেউ রাজী নয়। যা-ই হোক, ভুতুড়ে বাড়ি ছেড়ে সবাই বেরিয়ে এল। সামনে মাথা সমান ঝোঁপ ঝাড়! চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। জমাট বাঁধা অন্ধকার রাত জাগা জোনাকিগুলো মনের সুখে ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। আর দু-একটা বাদুড় গাছের ডালে ডালে খাবারের খোঁজে দাপাদাপি করে নীরবতা ভঙ্গ করছে।

জঙ্গল-এলাকা পেরিয়ে সবাই এসে হাজির হ'ল বড়—রাস্তায়। দু'পা এগোতেই বাঁকের কাছে একদল লোককে দলবেঁধে জটলা করতে দেখা গেল।

পিটি আর বব লম্বা লম্বা পায়ে তাদের দিকে এগিয়ে গেল।

পিটি কণ্ঠস্বরে ব্যস্ততা প্রকাশ করে বলল—'ব্যাপার কি ? কি হয়েছে এখানে ?

ভিড়ের মধ্য থেকে মাঝ-বয়সী একজন বার কয়েক ঢোক গিলে কাঁপা কাঁপা গলায় কোন রকমে উচ্চারণ করল—'ভূত ! সবুজ ভূত !'

'—ভূত ! আবার সেই সবুজ ভূত !

'—হ্যাঁ ভাই। দু'জন ড্রাইভার রাস্তার ধারে ট্রাক দাঁড় করিয়ে ছোট দোকানটার চা খাচ্ছিল। আচমকা কর্কশ স্বর কানে এল। ভয়ঙ্কর সে শব্দ !'

'—কর্কশ আওয়াজ ! কর্কশ স্বর ! কি ব্যাপার ? স্বরটা কেমন শোনাচ্ছিল, বলুন ত ?'

'—সে এক বিশ্র স্বর ভাই !' ড্রাইভারদের একজন আগ বাড়িয়ে ব'লে উঠল—'ভয়ঙ্কর আওয়াজ ! অ্যাঁ অ্যাঁ—অ্যাঁ করে বুক কাপানো আওয়াজরে ভাই !'

কোথায় ? কোনদিক থেকে আওয়াজ আসছিল ?'

'—ঐ ত—ঐ ঝোপের দিক থেকে। চীৎকারটা কাণে যেতেই আমরা দু'জন ভীত সন্ত্রস্ত চোখে রাস্তার বিপরিত দিকের ঐ ছোট ঝোপটার দিকে চোখ ফেরাতেই গায়ের রক্ত হিম হয়ে যাবার উপক্রম হ'ল। বিশালায়তন সবুজ একটা মূর্তি ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে। হাত দুটো সোজাভাবে ওপরে তুলে নিয়েছে। মনে হ'ল, কিছু একটা ধরে যেন ভয়ালদর্শন বিশালায়তন মূর্তিটা ধীরে ধীরে দোল খাচ্ছে।

'—তারপর ? তারপর কি হ'ল।'

'—আলো জ্বালতেই ভূতটা চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। বাতাসে মিলিয়ে গেল যেন।'

' কী ভয়ঙ্কর কাণ্ডরে বাবা ! পোড়ো বাড়িটা ছেড়ে সবুজ ভূত কি তবে শহর পর্যটন করতে বেরিয়েছে নাকি !

ব্যস, আর দেরী নয়। সবুজ ভুতের অস্তিত্বের কথা, তার অত্যাশ্চর্য কাণ্ড কারখানার কথা বাতাসে ভর দিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

অনেকক্ষণ ধরে সবুজ ভূতের প্রসঙ্গ নিয়ে বহু জল্পনা কল্পনা হ'ল। আসলের সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত খাদ মিশিয়ে ব্যাপারটাকে দীর্ঘও অধিকতর রস-সিক্ত করে তোলার চেষ্টা করতেও ত্রুটি করল না কেউ কেউ। এক সময়

নতুনতর কিছু না দেখতে পাওয়ার বেদনা নিয়ে যে যার বাড়ি ফিরল।

বব গতরাত্রে পোড়ো বাড়িটা থেকে কিছু কিছু শব্দ যেমন—ঝিঁ ঝিঁ পোকামাকড়ের গুঞ্জন। রাত জাগা পাখীর করুণ আর্তনাদ প্রভৃতি টেপ রেকর্ডার ধরে নিয়ে এসেছে। সে সঙ্গে সবুজ ভূতের বুক-কাঁপানো ভয়ঙ্কর সে-শব্দটাকে টেপ করে নেবার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু বন্ধু পিটি'র ছটফটানিতে তা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে কিনা বুঝতে পারল না। কাক ডাকা ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল সে। সবুজ ভুতের ভয়ঙ্কর সে আওয়াজটা মনে খুবই চাঞ্চল্য বোধ করছে।

বিছানা থেকে নেমেই বব টেবিলের ওপর থেকে টেপ রেকর্ডারটা কোলের ওপর তুলে নিয়ে বোতাম ঘুরিয়ে যন্ত্রটাকে সক্রিয় করল। মিনিট দু'-তিন ধরে পোকামাকড়ের গুঞ্জন আর থেকে থেকে রাতজাগা পাখীর করুণ স্বর যন্ত্রটার লাউড স্পিকার থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল।

"অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ" সবুজ ভূতের ভয়ঙ্কর আর্তস্বর অকস্মাৎ যন্ত্রের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।

পিটি ও বব প্রত্যক্ষদর্শী। ভয়ঙ্কর সে আর্তস্বরটা তারা গতরাত্রে নিজের কানে শুনেছে। কিন্তু তাদের বন্ধু জুপিটার বুক কাঁপানো রক্ত হিম করে দেয়া ভয়ঙ্কর আওয়াজটা প্রথম শুনল। সে গতরাত্রে জরুরী কারণে তাদের সঙ্গদান করতে পারে নি।

আচমকা সবুজ ভূতের ভয়ঙ্কর আর্তস্বরটা কানে যেতেই জুপিটার অকস্মাৎ সচকিত হয়ে বসে পড়ল।

তিন কিশোর রহস্যভেদী ভুতুড়ে বাড়ির সবুজ ভূতের অত্যাশ্চর্য ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনায় মগ্ন হল। বব ও পিটি গত রাতের রহস্যময় বিশালায়তন ছায়া মূর্তিটার কথাবিস্তারিত বর্ণনা করল। ফিরে আসার পথে ট্রাক-ড্রাইভারদের ব্যাপারটা ভুলল না।

কথা প্রসঙ্গে বব বলল—'ভয়ঙ্কর সে আওয়াজটা আমি প্রথমবার শোনার পরই টেপ-রেকর্ডার নিয়ে তৈরী হয়ে যাই। পিটি আমার কাছে ব্যাঘাত ঘটাতে লাগল। নাছোড়বান্দা। দ্বিতীয়বার আওয়াজটা হলে অবশ্যই টেপে ধরে নেয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। দ্বিতীয়বার এই করুন স্বরে অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ ভয়ঙ্কর শব্দ হ'ল। পিটির অস্থিরতার ফলে আমার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। সকালে টেপ-রেকর্ডার চালিয়ে নিঃসন্দেহ হলাম।

পিটি অনুযোগের স্বরে বলল—'মিছে আমার ওপর কেন দোষারোপ করছিস ভাই বব? তখনকার সে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির কথা একবারটি ভেবে দেখ ত। প্রথমবার আকস্মিক ভয়ঙ্কর সে আওয়াজটা কানে যেতেই আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গিয়েছিল! শরীর ক্রমেই অবশ হয়ে আসতে লাগল। আর শরীরের রক্ত যেন মুহূর্তে হিম হয়ে গেল। সে সঙ্গে বুকের ভেতরে কোন অদৃশ্য হাত যেন অনবরত হাতুড়ির আঘাত হানতে লাগল। তুই ই বল জুপিটার, এ-অবস্থায় কারো মাথা ঠিক থাকে? বব টেপ রেকর্ডার নিয়ে মেতে ছিল। তার ত অন্য দিকে মন দেয়ার—

পিটির কথা শেষ হবার আগেই জুপিটার বলে উঠল—'বব, টেপ-রেকর্ডারটা আর একবার চালা না ভাই। তারপরের অংশে কি আছে শুনি?

বব বলল—'তার পরের অংশে গ্রামবাসীদের কথোপকথনের কিছু অংশ টেপে উঠে গেছে। আসলে দ্বিতীয়বার ভয়াবহ সে আওয়াজটা হওয়ার পর টেপটা বন্ধ করার কথা ভুলে গিয়েছিলাম।

'—ঠিক আছে, তা-ই শোনা যাক।'

বব টেপ-রেকর্ডারের নভ ঘুরাল।

গ্রামবাসীদের কথোপকথন শুরু হল—'এক সময় এ বাড়ির মালিক ছিলেন ম্যাথিউস গ্রীন। আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। আচমকা সিঁড়ি দিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। এ-বাড়িতে ম্যাথিউস গ্রীন-এর প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়ায়—গ্রামবাসীদের মুখে মুখে এরকম কথা শোনা যায়। চুপ! চুপ কর সবাই। কিসের যেন একটা আওয়াজ শোনা গেল না?

জুপিটার বার বার টেপ রেকর্ডারের বক্তব্য গভীর মনোযোগ সহকারে শুনল। এক সময় নভ ঘুরিয়ে টেপ-রেকর্ডারটা বন্ধ করে কয়েক মুহূর্ত গম্ভীর মুখে কি যেন ভাবল। পিটি ও ববও নীরব রইল।

জুপিটার নীরবতা ভঙ্গ করল—'টেপ-রেকর্ডারের একটা মোটা গলাই বেশী করে শোনা যাচ্ছে।

—হ্যাঁ, এই লোকটাই বার বার কথা বলছিল। অন্যান্যদের কথার জবাব দিচ্ছিল।

জুপিটার বলল—'কাল সন্ধ্যায় কি ঘটেছিল গোড়া থেকে আর একবার সবিস্তারে বল্‌ত বব।

—আমাদের স্কুলে কাল বাৎসরিক অনুষ্ঠান আছে, তোকে ত বলেছিই ?

—হ্যাঁ। তা বলেছিস বটে। কিন্তু গতকালের সন্ধ্যায় ঘটনার সঙ্গে তোদের স্কুলের বাৎসরিক অনুষ্ঠানের কোন যোগসাজোস আছে কি ?

—তা ত অবশ্যই আছে। বাৎসরিক অনুষ্ঠানে একটা নাটক মঞ্চস্থ করা হবে, তোকে বলি নি ?

—হ্যাঁ, একথাও বলেছিলি।

কেটুকু তোর কাছে বলা হয়ে ওঠে নি তা হচ্ছে, নাটকের এক জায়গায় একটা রাতের দৃশ্য রয়েছে। পাখী ও পোকা-মাকড়ের স্বর টেপে তুলে নেবার জন্য আমরা, পিটি আর আমি ভূতুড়ে বাড়িটার লাগোয়া বনে গিয়েছিলাম। পাখী, পোকামাকড় আর জন্তু-জানোয়ারের ডাক টেপ করে নেওয়াই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। আমি টেপ রেকর্ডারটা চালাবার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলাম। ঠিক তখনই প্রথমবার ভয়ঙ্কর সে আওয়াজটা কানে এল। আমি তৈরী না থাকায় প্রথমবারের "অ্যাঁ—অ্যাঁ অ্যাঁ" আওয়াজটা টেপে তুলে নেওয়া সম্ভব হয় নি। দ্বিতীয়বার রহস্যজনক আওয়াজটা হতেই আমার যন্ত্রটা তুলে নিল। পরিষ্কার টেপ হয়েছে শুনলেই ত।

গত রাত্রে যা-যা ঘটেছিল বব এবার কিছুমাত্র বাদ না দিয়ে জুপিটার-এর কাছে ব'লে যেতে লাগল। জুপিটার অত্যুগ্র উৎসাহের সঙ্গে ঘটনার বিবরণ শুনতে শুনতে মাঝে-মধ্যে কৌতুহল বশতঃ টুকরো টুকরো প্রশ্ন করতে লাগল।

বব বলল—'টর্চ নিয়ে আমরা দোতলার বারান্দায় উঠে গেলাম। টর্চের উজ্জ্বল আলোয় ধুলোভরা বারান্দাটাকে পরীক্ষা করলাম।'

'—পায়ের ছাপ ? কারো পায়ের ছাপ—'

তার সুখের কথা কেড়ে নিয়ে বব বলল—না, পায়ের ছাপ চোখে পড়ে নি।'

'—কারো পায়ের ছাপই না। কোন জন্তু জানোয়ারের—'

জুপিটার-এর কথা শেষ হতে না দিয়েই বব বলে উঠল—'মানুষ বা জন্তু জানোয়ারের পায়ের ছাপ ত দূরের কথা ধুলো বালির আস্তরণের ওপর সামান্যতম আঁচড়ও খুঁজে পাইনি।

'—ঠিক আছে। তোরা সংখ্যায় মোট ক'জন ছিলি ?'

'— পিটি আর আমাকে ছাড়া মোট ছ'জন।

পিটি তাদের কথার মাঝে প্রতিবাদ ক'রে উঠল—'ছ'জন বলছিস কি বব? মোট সাতজন ছিলাম না? আমরা ছাড়া বাইরের লোক পাঁচজন ছিল না?

'—কি করে পাঁচজন ছিল? আমি ত চারজনকেই দেখেছি। স্মরণ করে দেখ ত—একজন সুদীর্ঘ ও বিশালায়তন লোক; কুকুর নিয়ে সে-লোকটা ছিল, তার সঙ্গে আর একজন ছিল; একজন প্রৌঢ়—কাঁচা-পাকা চুল আর লম্বা ও রোগাটে চেহারার, একজনের চোখে চশমা ছিল, আর একজন হেড়ে গলায় কথা বলছিল, মনে পড়ছে?'

'—কিন্তু আমার যেন এখনও মনে হচ্ছে তারা সংখ্যায় সাতজন ছিল। আমাদের দু'জনকে নিয়ে মোট ন'জন!

ম্লান হেসে বব বলল—'তোর ভুল হচ্ছে। তারা ছ'জনই ছিল।' পিটি সহজে তার সিদ্ধান্ত থেকে সরতে রাজী নয়। আঙ্গুলের কর গুনে গুনে মনে মনে আবারও হিসাব করে বলল—কি জানি ছাই! আমার যেন বার বারই মনে হচ্ছিল তারা সংখ্যায় সাতজন।

জুপিটার অধৈর্যভরে বলে উঠল—'ছাড়ান দে-ত। সাত বা ছয় কিছু একটা হবে। তারপর কি হ'ল বল বল?"

বব ঘটনার পরবর্তী অংশটুকুর বিস্তারিত বিবরণ দিতে লাগল।

তাকে মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে জুপিটার এবার বলল—'বব, তুই ত গবেষণা আর রেকর্ডের দায়িত্বে রয়েছিস। অবশ্যই বাড়িটা সম্বন্ধে খোঁজ খবরও নিয়েছিস।'

'—হ্যাঁ, ইতিমধ্যে সাধ্যমত খোঁজ খবর কিছু নিয়েছি বটে। আসলে কৌতুহল বশতঃই আমাকে খোঁজ খবর নিতে হয়েছে।'

'—চমৎকার, তবে তোর সংগৃহীত তথ্যের কিছুটা আমাদের শোনা। সব কিছু শুনে আমরা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি কিনা, আলোচনা করে দেখা যাক।'

বব সে-পোড়ো বাড়িটার ইতিহাস বর্ণনার কাজে আত্মনিয়োগ করল—

আমি এর-ওর কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে যেটুকু জেনেছি, বাড়িটার বয়স কত, অর্থাৎ কতদিন আগে সেটা তৈরী হয়েছিল কারো জানা নেই। তবে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তাতে জানা গেছে বাড়ির মালিক

ছিলেন নৃশংস প্রকৃতির। এক-কথায় দুর্ধর্ষ গুণ্ডা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল ম্যাথিউস গ্রীন। যেমন পাহাড়-সমান চেহারা তেমনি গায়ে হাতির বল ধরতেন। সাহসও ছিল যথেষ্টই।

'—হ্যাঁ, ম্যাথিউস গ্রীনের নামটা ত গ্রামবাসীদের কথোপকথন, অর্থাৎ টেপ-রেকর্ডার থেকেই পাওয়া যাচ্ছে।

'—হ্যাঁ। তারপর কি বলছি, শোন। ম্যাথিউন গ্রীন ছিলেন চীন দেশের অধিবাসী। সেখানে জাকিয়ে ব্যবসা পেতে বসেছিলেন। কিন্তু বিধি বাম। ব্যবসা তার কপালে সইল না। বিরাট এক গণ্ডগোলের মধ্যে হঠাৎ জড়িয়ে পড়লেন তিনি। ফলে চীনে থাকা তার পক্ষে আর সম্ভব হ'ল না। জীবন সেখানে সত্যি সংশয় হয়ে উঠেছে, সেখানে বসবাস করাত সম্ভবও নয়। ফলে সেখানকার পাততাড়ি গুটিয়ে তাকে সরে পড়তে হ'ল।

'—চীন থেকে সোজা এখানে আসেন, নাকি ইতিমধ্যে অন্য কোথাও মাথা গোঁজার চেষ্টা করেছিলেন, জানতে পেরেছিস?'

'—লোকমুখে ত এরকমই শোনলাম, চীনের ব্যবসা গুটিয়ে সোজা এখানে এসে আশ্রয় নেন।'

এসে হাজির হন। যা-ই হোক, মোটা টাকা খরচ করে এখানে সু-বিশাল বাড়িটি তৈরী করে স্থায়ীভাবে বসতি শুরু করেন।

—একেবারে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন—'

জুপিটার-এর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বব ব'লে উঠল—'না, সিঃসঙ্গ জীবন যাপন অবশ্যই নয়।

'—তবে? তাঁর সঙ্গে আর কে ছিলেন?'

'—একটা কথা বলতে ভুল হয়ে গেছে। চীন ছেড়ে আসার সময় অগাধ অর্থ আর এক রূপসী যুবতীকে—সম্ভ্রান্ত ঘরের এক মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। সবার মুখে একই কথা শোনা গেছে, তিনি নাকি সর্বদা চকচকে সবুজ রঙের আলখাল্লা পরিধান করতেন।'

ম্যাথিউস গ্রীন এখানে বাড়ি তৈরী করে বসবাস শুরু করার পর মাত্র কয়েক বছর সুখে ঘর-সংসার করেছিলেন। তারপরই ভাগ্যের চাকা ঘুরতে লাগল। তাঁর স্ত্রী কি যেন এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। খইয়ের মত দু'হাতে টাকা উড়িয়েও স্ত্রীকে বাঁচাতে পারলেন না। স্ত্রীর অকাল মৃত্যুতে বৃদ্ধ ম্যাথিউস খুবই মর্মাহত হলেন। শরীর ক্রমে ভেঙে পড়তে

লাগল তাঁর। সর্বদা মনমরা হয়ে বসে থাকতেন।

জুপিটার পিটি'র কথার ফাঁকে ব'লে উঠল—'স্ত্রীর মৃত্যুর পর বৃদ্ধ ম্যাথিউস কি এতবড় বাড়িটাতে একাই বসবাস করতেন?'

'—না। তা কেন হবে? দাস দাসীদের নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধুঁকে ধুঁকে কাটিয়ে গেছেন।'

'—তারপর তার মৃত্যু হ'ল কিভাবে? কোন কঠিন রোগ—'

'—না, রোগের কথা কিছু জানা যায় নি। তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে টেপ-রেকর্ডারে কিছু তথ্য রয়েছে। পরবর্তীকালে যেটুকু জানা গেছে, সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। ঘাড় মটকে সিঁড়ির নীচে পড়ে থাকতে তাঁকে দেখা গিয়াছিল।'

'—তদন্ত হয়েছিল নিশ্চয়?'

'—পুলিশী তদন্ত অবশ্যই হয়েছিল।'

'—রিপোর্টে কি ছিল?'

'—পুলিশ তদন্ত করে রিপোর্ট দেয়—অত্যধিক মদ্য পানই তাঁর মৃত্যুর কারণ।'

জুপিটার চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইল।

বব ব'লে চল্‌ল—'অবাক হচ্ছ? হ্যাঁ, রিপোর্টে অত্যধিক মদ্য পানের কথা লেখা রয়েছে মদের নেশায় তাল সামলাতে না পেরে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। আর এরই ফলে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয়েছিল। যাইহোক, ম্যাথিউস গ্রীন-এর প্রসঙ্গ এখানেই চাপা পড়ে যায়।

ম্যাথিউস গ্রীন-এর স্ত্রী ত আগেই মারা গিয়েছিলেন। তার ওপর তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। ফলে তাঁর স্মৃতি আকড়ে রাখা, শোকে আকুল হবারও কেউ ছিল না। উত্তরাধিকার সূত্রে বাড়িটার মালিকানার স্বত্ব লাভ করার জন্য তাঁর এক বিধবা ভ্রাতৃবধূ ছুটে এলেন। তাঁর থেকে জোরদার কোন দাবীদার না থাকায় তিনিই বাড়িটার মালিকানা লাভ করলেন। কিছুদিন পরে তাঁরও মৃত্যু হ'ল। এবার মালিকানা স্বত্ব বর্তাল তাঁর মেয়ে লিডিয়া গ্রীন-এর ওপর।

লিডিয়া গ্রীন-এর একটা আঙুরের বাগান আছে। তাঁর ইচ্ছা, আদ্যি-কালের ঢঙের বিশালায়তন জরাজীর্ণ বাড়িটা ভেঙে ফেলে আধুনিক-বাড়িগুলোর মতই মনলোভা একটা বাড়ি তৈরী করিয়ে বসবাস করবেন।'

'—বাঃ অনেক ত সংগ্রহ করেছিস বব ! এতেই আমাদের কাজ চলে যাবে মনে হচ্ছে। এখন চল, একবার বাড়িটা সরজমিনে তদন্ত করে আসা যাক. কি বলিস ?'

পিটি আর বন্ধুবর জুপিটারকে নিয়ে পরিত্যক্ত সে-ভুতুড়ে বাড়িটার সদর দরজায় হাজির হ'ল। সূর্যের আলোয় বাড়িটাকে আর ভূতুড়ে বলে মনে হ'ল না তাদের কাছে। বাড়ির একটা অংশ ভেঙে দেয়া হয়েছে।

তিন কিশোর রহস্যভেদী বাড়িটার সদর-দরজা পেড়িয়ে উঠোনে পা দিতেই পুলিশ বাধা দিল।

বব সচকিত হয়ে পিটি'র দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—'কিরে, হঠাৎ পুলিশ কেন ?'

'—হ্যাঁ, সেরকমই ত দেখা যাচ্ছে। পুলিশী পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'—কিরে, আজকাল ভূতুড়ে ব্যাপার স্যাপার নিয়েও পুলিশকে মাথা ঘামাতে ইচ্ছে নাকি ?'

জুপিটার খুবই চতুর। ইতিমধ্যেই সে পুলিশদের সঙ্গে গল্প জমিয়ে নিয়েছে, দেখা গেল। অনায়াসে পাহারার আসল কারণটাও বের করে নিল।

জুপিটার পুলিশদের সঙ্গে কথা বলে যে-তথ্য বের করল তা মোটামুটি এরকম -'বাড়ির ভাঙা দিকটা আজকেই মিস্ত্রীরা ভাঙে। ভাঙতে গিয়ে হঠাৎ তারা বিস্ময়কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। একটা চোরাকুঠরীর সন্ধান পায়। আরও একটু ভাঙতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা। হাতুড়ি-বাটালি গেল শিথিল হয়ে দেখল, একটা কফিন। অক্ষত একটা কফিন দেখেই মিস্ত্রীদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। তাদের একজন হন্তদন্ত হয়ে থানায় গিয়ে পুলিশ – অফিসারকে খবরটা দেয়।

মুহূর্তমাত্র দেরী না করে পুলিশ অফিসার গাড়ী নিয়ে রহস্যে ঘেরা বাড়িটায় হাজির হলেন। সঙ্গে আনলেন কয়েকজন সাহসী পুলিশ। টানাটানি করে সবাই মিলে কফিনটা বের করে আনল। কফিনের ঢাকনা খুলতেই সবার চক্ষুস্থির। দুটো জিনিস ভেতরে পাওয়া গেল। একটা স্ত্রীলোকের কঙ্কাল, আর একগাছা মুক্তোর হার। কফিনটা পুলিশের হেফাজতে রাখা হয়েছে। পুলিশের বড়-কর্তার নির্দেশে বাড়িটা ভাঙার কাজ বন্ধ। আর ? বাড়িতে পুলিশ-প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জুপিটার পুলিশদের সঙ্গে কথা বলে বব আর পিটে'র কাছে ফিরে

এল। তাদের কাছে উক্ত কাহিনীটা ব্যক্ত করে কপালের চামড়ায় গভীর চিন্তার ভাঁজ একে কয়েকমুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। এ সময় বলে উঠল—'বন্ধু আমি যেন কেমন রহস্যের আঁচ পাচ্ছি!

বব আর পিটি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে নীরবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

জুপিটার কণ্ঠস্বরে ব্যস্ততা প্রকাশ করে বল্‌ল—'এক কাজ কর। তোরা দু'জন গতকাল যেসব গ্রামবাসী ছুটে এসেছিল তাদের সঙ্গে দেখা কর।

বব আর পিটি সমস্বরে বল্‌ল—'কেন? তাদের কাছে গিয়ে কি করব?

'—তাদের জিজ্ঞেস করবি, কাল রাত্রে তারা কতজন এখানে এসেছিল। মনে রাখবি, সবাইকে আলাদা-আলাদা ভাবে জিজ্ঞেস করতে হবে কিন্তু। বিকেলের আগে আমার সঙ্গে আর তোদের দেখা হচ্ছে না। আমি এখন প্রধান-কার্যালয়ে চল্‌লাম। বিকেলের আগে তোরা কাজটা সেরে ফেলবি, ভুল হয় না যেন।'

বিকেলের কিছু আগে জুপিটার প্রধান-কার্যালয়ে বসে টেপরেকর্ডার চালিয়ে বিশেষ জায়গাটা মনযোগ দিয়ে শুনছে। এমন সময় আচমকা বাইরে থেকে কাকে যেন দরজায় কড়া নাড়তে শুনতে পেল। দরজার গোপন ছিদ্রপথে চোখ লাগিয়ে দেখে নিল। নিঃসন্দেহ হ'ল, বব আর পিটি এসেছে। দরজা খুলে দিল।

বব ঘরে ঢুকে বলল—'আমাদের ওপরে যে-দায়িত্ব বর্তেছিল তার অংশ বিশেষ পালন করা সম্ভব হয়েছে। ইতিমধ্যে তিনজন গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলতে পেরেছি। তাদের মধ্যে দু'জনের মত হ'ল, পিটি আর আমাকে নিয়ে মোট দু'জন ছিল। আর সাতজন ছিল এরকম মন্তব্য করেছে একজন। মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে সে এবার বল্‌ল—'আমরা যে-তিনজন লোকের সঙ্গে আজ এ ব্যাপারে কথা বলেছি সবাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলেছে।

অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করতে গিয়ে জুপিটার যন্ত্রচালিতের মত সোজা হয়ে বসে বল্‌ল—'কি, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা কি?

'—কাল সন্ধ্যার পর, প্রথম রাত্রে কে একজন অজ্ঞাত পরিচয় গম্ভীর প্রকৃতির লোক নাকি হঠাৎ তাদের সবার সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে দেখা করেছে।'

'—আশ্চর্য ব্যাপার ত! কেন দেখা করে? কিছু বলেছে?'

'—বলেছে। ম্যাথিউস গ্রীন-এর বাড়িটা ভেঙে ফেলার আগে একবারটা সেটা দেখে আসা দরকার। গোড়ার দিকে তার কথার আমল দেয়নি কেউ-ই। কিন্তু লোকটা বার বার একই কথার পুনরাবৃত্তি করায় তাদের মনে কৌতূহলের উদ্রেক করল। তাই অনন্যোপায় হয়ে ভূতুড়ে সে-বাড়িটায় সবাই আবার ফিরে যায়।

জুপিটার কয়েক মুহূর্ত নীরবে ভাবল। মনে হল রহস্যের তীব্রগন্ধ পেয়েছে। এক সময় কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ এঁকে বল্‌ল - আচ্ছা বব, তোরা বলছিলি না, কাল সন্ধ্যায় একজন লোক কুকুর সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল? কুকুরটা কি জাতের, বলতে পারিস?

—একে অন্ধকার, তার ওপর মানসিক উত্তেজনার ভালভাবে লক্ষ করতে পারি নি। তবে যতদূর মনে পড়ছে, ফকস-টেরিয়ার জাতের হবে হয়ত। কিন্তু ভূতুড়ে কাণ্ডটার সঙ্গে কুকুরের কি সম্পর্ক থাকতে পারে, বুঝছি না জুপিটার!

জুপিটার কৃত্রিম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বল্‌ল—'না, তেমন কিছু নয়। হঠাৎ কথাটা মনে এল, জিজ্ঞেস করলাম। তাছাড়া জেনে রাখলে ভবিষ্যতে রহস্যভেদের ব্যাপারে একটু-আধটু কাজে লাগতেও পারে।

হঠাৎ দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হ'ল। সাঙ্কেতিক শব্দ। বব দরজার গোপন ছিদ্রটা দিয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। দেখল, করনাড।

দরজা খুলতেই ব্যস্ত-পায়ে করনাড ঘরে ঢুকল। জুপিটার তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

করনাড কোনরকম ভূমিকা না করেই বল্‌ল—জুপিটার, পুলিশের বড়-কর্তা পিটি'র বাড়ির বৈঠকখানায় অপেক্ষা করছেন।

'—কারণ?'

'—পিটি আর বব-এর সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছেন খুবই জরুরী কিছু কথা আছে, বললেন।

'—ভাল কথা। আমিও এদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছি।' কথা বলতে বলতে জুপিটার চেয়ারটাকে পিছনে ঠেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারা চারজন প্রধান-কার্যালয় থেকে পিটি'র বাড়ির উদ্দেশে পা-বাড়াল।

পিটি'র বৈঠকখানায় ঢুকে জুপিটার পুলিশের বড়-কর্তাকে নমস্কার

জানাল !

পুলিশের বড়-কর্তা মুচকি হেসে প্রতি নমস্কার জানালেন। জুপিটার ও অন্যান্যরা আসাণ গ্রহণ করলে তিনি বল্লেন—'কাল রাত্রে ত তোমরা তিনজন সেই বাড়িটায় গিয়েছিলে, তাই নয় ?'

পিটি বব'কে দেখিয়ে জবাব দিল—'না, আমরা দু'জন গিয়েছিলাম। আমাদের এ-বন্ধু যায় নি।'

'—ভাল কথা। কাল রাত্রে সে-বাড়িটায় কি ঘটেছিল, জানতে চাইছি।'

বব একটু নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসল। এবার রহস্য নক ঘটনার কিছুমাত্র বাদ না দিয়ে আদ্যোপান্ত বর্ণনা করল।

পুলিশের বড়-কর্তার মুখে গাম্ভীর্যের ছাপ ফুটে উঠল। কয়েক-মুহূর্ত নীরবে ভেবে বল্লেন—'যে-কারণে আমি তোমাদের কাছে ছুটে এসেছি।

চাঞ্চল্যকর খবরটা সেই বাড়ির বর্তমান মলিকানি লিডিয়া কানে পেঁাছে গেছে। তিনি ফোনে আমাকে একটা বিশেষ অনুরোধ করেছেন।

'—অনুরোধ ? কি সে-অনুরোধ ?

' তিনি ঘটনাটার প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকে নিজের কানে ঘটনাটার পূর্ণ বিবরণ শুনতে আগ্রহী ভারডেণ্ট ভ্যালীতে তিনি এখন আছেন। তোমরা তাঁর অনুরোধ রক্ষা করলে সেখানে যেতে আগ্রহী হও তবে কাল বিকেলে রেল-স্টেশনে অপেক্ষা করবেন। বিকেল পাঁচটায়। লিডিয়া গ্রীন-এর ভাইপো চার্লস গ্রীন স্টেশনে তোমাদের অপেক্ষায় থাকবেন। তোমরা আমাকে যাবে এ রকম প্রতিশ্রুতি দিলে আমি ফোনে তাঁকে খবরটা দিয়ে দেব। তিনি তোমাদের জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করবেন। তোমরা এবারে নিজেরা বিবেচনা করে বল, যেতে রাজী আছ কিনা ?'

বব বা পিটি'কে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই জুপিটার তাঁর কথায় উত্তর দিল—'তোরা দু'জন অবশ্যই যাবি! আমার যাওয়া ঠিক হবে না। কারণ, এখানে নতুন কোন ঘটনা ঘটে যেতে পারে। যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস।

চার্লস-এর সঙ্গে দেখা করার জন্য বব ও পিটি বিকেল পাঁচটার কিছু আগেই রেল-স্টেশনে উপস্থিত হ'ল। সেখান থেকে তাঁর সঙ্গে ভারড্যাণ্ট-

ভ্যালিতে লিডিয়া গ্রীন-এর সঙ্গে দেখা করতে যাবে। স্টেশনে পেঁছেন চার্লস গ্রীন-এর দেখা পেয়ে গেল।

চার্লস গ্রীন-এর সঙ্গে বব আর পিটি ট্রেনে উঠল অনেক রাত্রে ট্রেনটা সানফ্রান্সিকোতে পেঁছিল। স্টেশন থেকে বেরিয়ে তারা ভাড়া-গাড়ীতে ভারডাণ্টভ্যালীর উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল।

চার্লস মৃত ম্যাথিউস গ্রীন এর সম্পর্কে প্রপৌত্র। এলিজা ম্যাথিউস-এর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভের। এলিজা'র মা সমুদ্র যাত্রাকালে মারা গিয়েছিল। তখন শিশু এলিজাকে হংকং-এর এক মিশনারী স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়। তারপর ডাক্তারী পড়ে। ডাক্তারী পাশ করে চলে যান চীনে। ডাক্তারী বরতে করতে এক চীনা মেয়েকে বিয়ে করেন। তার কয়েক বছর পরে কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে এলিজা ও তাঁর চীনা-স্ত্রী উভয়েই মারা যান। তাদের একমাত্র ছেলে টমাস। তিনিও প্রথমে মিশনারী স্কুলে পড়াশোনা করেন। তারপর ডাক্তারী পাশ করেন। বিয়ে করে ঘর বাঁধেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই পীত-নদীতে নৌকাডুবির ফলে উভয়ের মৃত্যু ঘটে। তাদের সন্তানই চার্লস গ্রীন। সহায় সম্বলহীন মা-বাপ মরা ছেলে শিশু চার্লসকে এক চীনা দম্পতি পুত্রস্নেহে লালন পালন করেন। পরবর্তীকালে তাদের সাহায্যেই তিনি তাঁর পিসি লিডিয়া গ্রীনকে খুঁজে বের করেন। লিডিয়া নিঃসন্তান। তাঁর মৃত্যুর পর চার্লস গ্রীনই বাড়ি ঘর, আঙুল বাগান, মদের কারখানা প্রভৃতি স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন, একথা প্রায়ই তিনি তাঁকে বলেন।

চার্লস তাঁর উত্তরাধিকারীদের পরিচয় শেষ করে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লেন! এক সময় বিষণ্ণ মুখে বল্‌লেন—'হঠাৎ আমার বরাত যে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে স্বপ্নেও ভাবিনি কোনদিন! আমার এত-দিনের স্বপ্ন এক নিমেষে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

চার্লস আরও অনেক কিছু বল্‌লেন। কান্তি বশতঃ অন্যমনস্ক ছিল, তাই সব কিছু তার কানে যায় নি।

গাড়ীটা বাঁক ঘুরে সুদৃশ্য একটা বাড়ির সামনে দাঁড়াল। তারা গাড়ী থেকে নামতেই লিডিয়া গ্রীন তাদের সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। বৈঠক-খানায় নিয়ে বসালেন। হ্যারল্ড কার্লসন নামে মাঝ-বয়সী ভদ্রলোকও আগে ভাগেই ঘরে বসে ছিলেন। লিডিয়া গ্রীন-এর আত্মীয় তিনি। তাঁর ব্যবসাপত্র ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষন করেন। লিডিয়া গ্রীন বল্‌লেন—

তোমরা পথশ্রমে ক্লান্ত আহারাদি সেরে শুয়ে পড়। কথাবার্তা যা কিছু কথা হবে। কথা বলতে বলতে তিনি মিঃ কার্লসন'কে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সামান্য বিশ্রামের পর চার্লস গ্রীন, পিটি আর বব সবে খাবার টেবিলে বসল। এমন সময় বিকট একটা চীৎকার শুনে তারা তিনজনই সচকিত হয়ে পড়ল। আতঙ্কিত চোখে, কাঁপা কাঁপা গলায় চার্লস গ্রীন বলে উঠলেন—'কি ব্যাপার! মনে হচ্ছে পিসি চিৎকার করছেন। সবে ত গেলেন। হাসিখুশিইত দেখলাম। এরই মধ্যে এমন কি—'তার শেষ কথাটি শোনা গেল না। ব্যস্ত-পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।'

চার্লস গ্রীন দোতলায় তাঁর ঘরের দরজায় পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দেখলেন, লিডিয়া গ্রীন বিছানায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে। আর মিঃ কার্লসন তাঁর চোখে—মুখে জলের ছিঁটা দিচ্ছেন। চাকর-চাকরাণীরা আতঙ্কিত চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে। বব আর পিটিও ততক্ষণে সেখানে পেঁাছে গেল।

মিঃ কার্লসন্ ব্যস্ত-গলায় বল্লেন—'চার্লস আলমারীতে স্মেলিং-সল্টের শিশি আছে। তাড়াতাড়ি নিয়ে এস।

শিশির মুখটা খুলে লিডিয়া গ্রীন-এর নাকের সামনে কিছুক্ষণ ধরে রাখতেই তিনি চোখ মেলে তাকালেন। দৃষ্টিতে আতঙ্কের ছাপ সুস্পষ্ট।

চার্লস তাঁর কাছাকাছি মুখ নিয়ে ব্যাগ্রভাবে বলল 'কি ব্যাপার পিসি? হয়েছিল কি?'

চোখের তারায় ভীতির ছাপটুকু অক্ষুন্ন রেখেই লিডিয়া গ্রীন কাঁপা কাঁপা গলায় কোনরকমে উচ্চারণ করলেন—ভূত! আমার সামনে এসে—'

'—ভূত! ভূত আবার কি।' ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেবার জন্য চার্লস গ্রীন কৃত্রিম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন।

'—আরে না! আমি স্পষ্ট দেখলাম। কাকা ম্যাথিউস গ্রীন আমার সামনে দাঁড়িয়ে! সবুজ আলখাল্লা গায়ে! দশাসই চেহারা। হাত দুটো ওপরে তোলা। ঠিক যেন শূন্যে দোল খাচ্ছেন! চোখে জ্বলন্ত ক্রোধ।'

'—ক্রোধ! সে কী। ক্রোধ—'

'—হ্যাঁ ক্রোধের সুস্পষ্ট ছাপ তাঁর চোখে-মুখে। আমার ওপর যেন

প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ—ক্ষুব্ধ। ব্যাপারটা এবার আমার মনে পড়েছে। আমার মা তাঁকে কথা দিয়েছিলেন রকি বীচের বিশালায়তন বাড়িটা কোন দিন বিক্রি করা হবে না, ভেঙে ফেলাও হবে না। আমি তাঁর মতের বিরুদ্ধাচারণ করে বাড়িটা ভাঙতে শুরু করেছি—তাঁর ক্ষোভের কারণ ত বটেই।'

বব ও পিটি আতঙ্কিত চোখে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল। বব বলল '—আশ্চর্য কাণ্ড ত। এখানেও সবুজ ভূতের উৎপাত! হায়! এ কী অবিশ্বাস্য কাণ্ড রে বাবা!

মিঃ হ্যারল্ড বললেন—'সবে মাত্র আমি ব্যবসাপত্র সম্বন্ধে তার সঙ্গে কথা বলে নিজের ঘরে গিয়েছি। এমন সময় বিকট চীৎকার কানে গেল। আচমকা চীৎকারে আমি ভীত-সন্ত্রস্ত পায়ে এ-ঘরে ছুটে এলাম। দেখি তিনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায়, শরীর এলিয়ে বিছানায় পড়ে।

বব মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে নিয়ে বলল—'মিঃ কার্লসন্ কফিনের ভেতর থেকে কঙ্কাল ছাড়াও এক ছড়া মুক্তোর হারও পাওয়া গেছে, পুলিশ আপনাদের জানিয়ে দে ত?'

'—হ্যাঁ, পুলিশের ফোন পেয়ে আমরা সেখানেই যাই। তাদের কাছ থেকে সুক্তোর হার ছড়া নিয়ে আমি আমাদের লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসতে হয়েছে—পুলিশের বিনা অনুমতিতে মুক্তোর হারছড়া আমরা বিক্রি করব না বা হস্তান্তর করব না।' কথা বলতে বলতে মিঃ কার্লসন্ রহস্যভেদী বব ও পিটিকে নিয়ে পাশের ঘরে গেলেন। সিন্দুক খুলে মুক্তোর হারছড়াটা বের করার জন্য চাবির গোছা নিলেন। বব লক্ষ্য করল চাবিটা সাঙ্কেতিক চিহ্নযুক্ত। মিঃ কালসন্ এবার চাবি ঘুরিয়ে সিন্দুকটা খুললেন। বের করে আনলেন চকচকে ঝকঝকে একছড়া হার। বড় আঙুরের মত আটচল্লিশটা মুক্তো দিয়ে হারটা গাঁথা হয়েছে।

বব হার ছড়াটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বলল—এরকম মুক্তো পৃথিবীতে আজ প্রায় দুর্লভ। পূর্বদেশের ধনকুবেরদের কাছে এটা বহুমূল্য বলে বিবেচিত। এর দাম কম করেও এক লক্ষ ডলার ত হবেই। দেখছিস পিটি, কেমন রঙ বে-রঙের অত্যুজ্জ্বল দ্যুতি বেরোচ্ছে!'

'—এক লক্ষ ডলার পেলে পিসি তা দিয়ে মদের কারখানা আর আঙুরের বাগানটাকে রক্ষা করতে পারতেন।'—চার্লস গ্রীন আগ বাড়িয়ে

বলে উঠলেন। মিঃ কার্লসন্ বাধা দিয়ে বললেন—তা-ত কিছুতেই সম্ভব নয়।'

' কেন? পুলিশের কথা বলছেন?' চার্লস গ্রীন বললেন।

'—হ্যাঁ, পুলিশের ব্যাপারটা ত আছেই। তাছাড়াও ম্যাথিউস গ্রীন হারছড়াটা তাঁর এক নিকট আত্মীয়কে দিয়ে গেছেন।'

'—আমরা কিন্তু শুনেছি, ম্যাথিউস গ্রীন-এর স্ত্রীকে তার আত্মীয়রা তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আর তাঁর আত্মীয় পরিজন যা কিছু ছিল সবাই চীনের যুদ্ধে নির্মূল হয়েছেন।' চার্লস গ্রীন বললেন।

'—কিছুই আমার অজানা নয়। তবে একটা কথা, সানফ্রান্সিসকো থেকে এক আইনজীবি আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন, ম্যাথিউস গ্রীন-এর স্ত্রীর এক বোন এখন জীবিতা। তিনিই উত্তরাধিকার সূত্রে এ হারছড়াটার দাবীদার। তাই প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে তার মীমাংসা—মিঃ কার্লসন্-এর কথা শেষ হবার আগেই আচমকা দরজাটা খুলে গেল। সচকিত হয়ে সবাই ঘাড় ফেরাতেই আলকাতরার মত কালো বিশালদেহী এক পুরুষ মূর্তিকে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। আগন্তুকের চোখ দুটো রীতিমত জ্বলজ্বল করছে।

মিঃ কার্লসন্ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর সে লোকটার দিকে তাকালেন। আগন্তুক বেশ মোটা গলায় উচ্চারণ করল—' স্যার, কারখানায় ভূতের উৎপাত শুরু হয়েছে। রাত্রে তিনজন কর্মচারী স্পষ্ট দেখেছে। কর্মচারীরা ভয়ে চীৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। তাড়াতাড়ি চলুন।'

মিঃ কার্লসন্ জীপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন কারখানার উদ্দেশ্যে। চার্লস গ্রীন, বব আর পিটিও তাঁর সঙ্গে গেল। অল্প সময়ের মধ্যেই জীপটা বিরাট একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কারখানার দরজায় দাঁড়াল। জীপ থেকে নেমে সবাই ব্যস্ত পায়ে ভেতরে ঢুকে গেল। সংবাদ দাতার নাম জেনসন্।

তারা কারখানার ভেতরে ঢুকতেই এক যুবক কর্মচারী ছুটে এল। জেনসন্ বলল—'কি রে, যারা ভূত দেখেছিল সে-কর্মচারী তিনজনকে ডাক।'

'—তারা ত পালিয়েছে। আপনি কারখানা থেকে বেরিয়ে যাওয়া মাত্র তারা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কারখানা ছেড়ে পালিয়েছে।'

'—হায় ঈশ্বর! আমি যা আশঙ্কা করেছিলাম, হ'লও তা-ই। এবার তারা ভূতের ব্যাপারটা পাড়ায় পাড়ায় রটিয়ে বেড়াবে!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিঃ কার্লসন বল্লেন—'বাস, মদের কারখানা শিকেয় উঠল! আর আঙুর তোলার সময়ও কেউ এর ত্রিসীমানায় ভয়ে আসতে চাইবে না। যাক, যা এবার তাকে ত আর ঠেকানো যাবে না। কার্লসন্, তুমি অন্য কর্মচারীদের দেখ গে।'

জেনসন্ চলে গেল কারখানার চালার দিকে। এমন সময় মিঃ কার্লসন—। আচমকা চেঁচিয়ে উঠলেন—'হায় ঈশ্বর! মুক্তোর হার ছড়াটা রেখে সিন্দুকে তালা লাগিয়ে ছিলাম কিনা, মনে পড়ছে না-ত! ওদিকে আবার সর্বনাশ ঘটে না যায়।' কপালে হাত দিয়ে বসে পড়লেন তিনি।

পিটি তাঁকে আশ্বস্ত করল—'হ্যাঁ, হারছড়াটা আমাদের দেখিয়ে আবার সিন্দুকের মধ্যেই রেখে দিয়েছিলেন। আমি লক্ষ্য করেছিলাম, পরিষ্কার মনে আছে।'

'—তবু তালার ব্যাপারটা? সাঙ্কেতিক চিহ্নযুক্ত চাবি দিয়ে সিন্দুকের তালাটা লাগিয়েছিলাম কি, দেখেছিলে?'

'—হ্যাঁ! মনে হচ্ছে লাগিয়ে ছিলেন। তবে এটা ঠিক নিশ্চিত করে বলতে পারছি না।

'—যাক, এখন আর কিছু করার নেই। জ্যাকসন্ তুমি গিয়ে রাত্রের যে-কর্মচারী তিনজনকে বুঝিয়ে শুনিয়ে আনতে পার কিনা দেখ। নইলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে।' মিঃ কার্লসন্ এবার ব্যস্ত হয়ে জীপে গিয়ে উঠলেন। তাঁর মাথায় সিন্দুকের তালার ব্যাপারটা ঘুরপাক খাচ্ছে।

চার্লস্ গ্রীণ বব আর পিটি কারখানাতেই রয়ে গেল। চার্লস তাদের নিয়ে মদের কারখানাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন। চার্লস-ও ভাবিত। আঙুর তোলার সময় হয়ে এসেছে। ভূতের ভয়ে কর্মীরা এ-তল্লাটে না ঘেঁষলে ব্যবসা গুটিয়ে দেয়া ছাড়া গত্যান্তর থাকবে না।

কারখানা ঘুরে দেখে বব ও পিটি এবার চার্লস গ্রীন-এর সঙ্গে বাড়ি ফিরল।

মিসেস গ্রীন শয্যাশায়ী। চাকর-চাকরাণিরা কাজ মিটিয়ে যে যার বিছানা নিয়েছে। ফলে বাড়িটা প্রায় অন্ধকার। দু'-তিনটে দরজা পেরিয়ে তারা একটা খোলা—দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। চার্লস গ্রীন এগিয়ে এসে ঘরের ভেতরে উঁকি দিয়ে চমকে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

বিস্ময়ভরা চোখে বব ও পিটি'র দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠলেন—'আশ্চর্য ব্যাপার ত! হ্যারল্ড কাকা গেলেন কোথায়!' পর মুহূর্তে আবার নিজেই বল্‌লেন—'অফিস-ঘরে নেই ত?' কথা বলতে বলতে লম্বা লম্বা পায়ে কয়েক পা এগিয়ে আর একটা দরজার গিলের সামনে দাঁড়ালেন। দরজায় টোকা দিয়েও কোন ফল হ'ল না। এবার জোরে জোরে ধাক্কা মারতে লাগলেন। বার কয়েক ধাক্কা ধাক্কি করতেই আচমকা দরজাটা খুলে গেল। ঘরের ভেতরে উঁকি দিয়েই চার্লস গ্রীন-এর চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল। ততক্ষণে বব ও পিটি দৌড়ে এল। তারা ঘরের ভেতরের দিকে এক পলক চোখের মণি দুটো ঝুলিয়ে নিয়েই সচকিত হলে পরস্পর আতঙ্কিত চোখে নীরবে তাকিয়ে রইল! এমন কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করল তারা। হ্যাঁ, ব্যাপারটা ভয়ঙ্করই বটে। হ্যারল্ড কাকা ঘরের মেঝেতে মুখ থুবড়ে রয়েছেন। মুখ বাঁধা। কাগজের ঠোঙা দিয়ে মুখটা ঢেকে দেয়া হয়েছে।

চার্লস গ্রীন আতঙ্কের ঘোর কাটিয়ে উন্মাদের মত চীৎকার করে ঘরের ভেতরে ছুটে গেলেন—'হ্যারল্ড কাকা! হ্যারল্ড কাকা!'

আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে তিনি মিঃ হ্যারল্ড এর মুখ থেকে কাগজের ঠোঙাটা খুলে ফেল্‌লেন। দেখলেন, একটা কাপড়ের টুকরো দিয়ে তাঁর মুখটা শক্ত ক'রে বাঁধা। ঠোঙাটা মুখের ওপর থেকে সরিয়ে ফেলতেই তিনি নীরবে টুলটুল করে তাকাতে লাগলেন।

হাত আর মুখের বাঁধনটা খুলে দিতেই মিঃ কার্লসন উঠে বসলেন।

পিটি বল্‌ল—'কি ব্যাপার? আপনার এ-দশা করল কে?'

'—বাড়ি ফিরে আমি ঘরে ঢুকতেই পিছন থেকে কে যেন আমাকে জাপ্টে ধরে ফেল্‌ল। মুহূর্তে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেল্‌ল আমাকে। আমি ব্যাপারটা বোঝার আগেই মুখটাও বেঁধে দিল। ব্যস, কথা বলা ত দূরের কথা উঠে বসার ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেল্‌লাম।'

বাঁধন খুলে মুক্ত করে দিলে মিঃ কার্লসন্ কথা ক'টা কোন রকমে শেষ করেই পাশের ঘরে ছুটে গেলেন। সিন্দুকের তালাটা বন্ধ করেছিলেন কিনা না দেখা পর্যন্ত স্বস্তি নেই তাঁর। সিন্দুকের ডালাটা খোলা। ভেতরে ব্যস্ত হাতটা ঢুকিয়েই তিনি বিকট স্বরে আর্তনাদ ক'রে উঠলেন—হার ছড়াটা নেই! মুক্তোর হার ছড়াটা খোয়া গেছে!' হ্যারল্ড কার্লসন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

এদিকে জুপিটার ভূতুড়ে ব্যাড়ির ব্যাপারটা নিয়ে রহস্য ভেদের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সবই ভস্মে ঘি ঢালা। রহস্য ভেদের কোন সূত্রের সন্ধানই পেল না সে। প্রধান কার্যালয়ের চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে রইল সে। হঠাৎ টেলিফোনের ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং শব্দে সচকিত হয়ে সোজাভাবে বসল। ব্যস্ত হাতে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল।

বব তার সহকর্মী জুপিটার'কে ফোন করছে। বব বল্‌ল—'ভাই জুপিটার, এখানে ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। সবুজ ভূত এবার এখানে চড়াও হয়েছে। মিস গ্রীন ও কারখানার তিন—তিনজন কর্মচারী ভূত সবুজ ভূত দেখেছে। আরও রহস্যজনক একটা ব্যাপার ঘটে গেছে এখানে।

কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে জুপিটার বল্‌ল—'আরও রহস্যজনক ব্যাপার? আসল ব্যাপারটা কি, বলত?'

'—ভূতুড়ে বাড়ির কফিন থেকে যে মুক্তোর হারছড়া পাওয়া গিয়েছিল, চুরি গেছে। আজ একটু আগে কে বা কারা যেন সেটাকে আত্মসাৎ করেছে।'

'—এ ঘটনাটা কিন্তু রহস্যটাকে অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছে, তোদের কি মত?

ভাল কথা, স্থানীয় পুলিশের বক্তব্য কি?

'—খবর পেয়ে স্থানীয় শেরিফ ঘটনাস্থলে এসেছিলেন। আসলে ঘটনাস্থল শহর থেকে বহু দূরে অবস্থিত বলে পুলিশের আবির্ভাবের দেরী হবেই।'

'—ঘটনার বিবরণ শুনে শেরিফ কি বল,লেন?'

'—তিনি মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে পেঁাছেছেন। তাঁর মতে মুক্তোর হারছড়ার খবরটা খবরের কাগজ মারফৎ চাউর হয়ে যাওয়ায় শহরের সমাজ বিরোধীরা এখানে জড়ো হয়। তারা সুযোগ বুঝে মুক্তোর খোঁজে বাড়িতে ঢোকে। ঠিক তখন হ্যারল্ড কার্লসন ফিরে আসেন। শয়তানগুলো বেকায়দায় পড়ে তাকে কব্জা করে ফেলে। পিঠমোড়া করে বেঁধে, মুখে কাপড় দিয়ে তাঁকে মেঝের ওপর ফেলে রেখে গা-ঢাকা দেয়। যাবার সময় মুক্তোর হারছড়াটা নিয়ে যায়। হ্যারল্ড কার্লসন্ সিন্দুকের তালা বন্ধ না করায় তাদের পক্ষে বাঞ্ছিত বস্তুটা আত্মসাৎ করতে বেগ পেতে হয় নি।'

জুপিটার এবার বব'কে আর দু'-একটা খুটিনাটি বিষয়ে প্রশ্ন করল। বব সাধ্যমত তার জিজ্ঞাসা নিবারণ করল। জুপিটার ফোনের রিসিভারটা রেখে দিল।

জুপিটার আবার চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে ভারড্যাণ্টভ্যালীর ব্যাপারটা নিয়ে গভীর ভাবনায় ডুবে গেল। সবুজ ভূত শেষ পর্যন্ত সুদূর ভারড্যাণ্ট-ভ্যালীতে আক্রমণ চালানোর ব্যাপারটা তাকে খুবই ভাবিয়ে তুল্‌ল। সে একটা ব্যাপারে অন্তত: নিঃসন্দেহ, মুক্তোর হারছড়া গায়েব হওয়ার সঙ্গে সবুজ ভূতের অবশ্যই যোগসাজোস রয়েছে। আবার শেরিফের কথাটাও উড়িয়ে দেখা যায়না। সমাজ বিরোধীদের কাজ হওয়াও কিছু-মাত্র বিচিত্র নয়। কিন্তু এর মধ্যে কোন্‌টা বেশী নির্ভরযোগ্য ?

করণাড-এর ডাকে জুপিটার এর চমক ভাঙল।

জুপিটার মনটাকে একটু হাল্কা করার জন্য তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরল। হাঁটতে হাঁটতে কখন যে ভূতুড়ে সে বাড়িটার সামনে পেঁাছে গেছে বুঝতেই পারেনি। সঙ্গী কর্ণাড'কে লক্ষ করে বল্‌ল – 'বাড়িটার এরকম জায়গা থেকে বব ও পিটি সেদিন ভয়ঙ্কর 'অ্যাঁ—অ্যাঁ – অ্যাঁ শব্দটা টেপ করেছিল। তুই বরং এখানেই দাঁড়া কর্ণাড। আমি বাড়ির ভেতর থেকে একটু ঘুরে আসছি।'

করর্ণাড'কে দাঁড় করিয়ে জুপিটার ব্যস্ত পায়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। প্রহরারত পুলিশদের সঙ্গে ফিসফিসিয়ে কি যেন বল্‌ল! এবার বাড়িটার ভেতর দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে বিকট স্বরে আর্তনাদ করল। তারপর লম্বা লম্বা পায়ে করর্ণাড-এর কাছে ফিরে এসে বল্‌ল – 'কিছু শুনতে পেয়েছিলি ?'

'– খুবই অস্পষ্ট আওয়াজ কানে এসেছিল।'

জুপিটার তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে এবার সে বাড়ির ভেতরে না ঢুকে জঙ্গলের গভীরে চলে গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে খুব জোরে চীৎকার করল। তাকে আর্তনাদও বলা চলে। কাজ সেরে আবার করর্ণাড-এর কাছে ফিরে এল।

করর্ণাড বল্‌ল —'এবার চীৎকারটা বেশ জোরে শোনা গেছে। বেশ পরিষ্কারও ছিল আওয়াজটা।'

বব নিঃসন্দেহ হ'ল যে-ই ভয়ঙ্কর আওয়াজটা করে থাকুক বাড়ির বাইরে থেকে অবশ্যই করেছিল।

চীৎকার শুনে প্রহরারত পুলিশদের একজন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বাজখাই গলায় জুপিটার'কে বলল—'তোমার ব্যাপারটা কি হে! এমন চীৎকার চেঁচামেচি করছ কেন! কী যে ঝামেলা জুড়ে দিলে!'

'—দেখুন এ-বন বাদাড়ে অহেতুক চীৎকার করে গলা ফাঁটানোর কিছু-মাত্র ইচ্ছে আমার নেই।' কথা বলতে বলতে পকেট থেকে একটা কার্ড বের ক'রে পুলিশটির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌ল—'এতে আমার এবং আমার সহকর্মী-বন্ধুদের নাম ও পরিচয় ছাপানো রয়েছে।'

পুলিশটি কার্ডটি চোখের সামনে ধরল। দেখল, তাতে লেখা—"আমার রহস্যভেদী। যে কোন রহস্যের তদন্ত করে থাকি। জুপিটার জোন্স প্রথম রহস্যভেদী, বব এড্রুজ—দ্বিতীয় রহস্যভেদী আর পিটার ক্লেন্স তৃতীয় রহস্যভেদী।' কার্ডটা থেকে মুখ তুলে পুলিশটি মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটিয়ে তুলে আপন মনে বলে উঠল—'হায় রে আমার কপাল। এরা রহস্যভেদী! কচি শিশুর মত চেঁচামেচি করছে। আবার রহস্যভেদী ব'লে ফটকা ফাঁটাচ্ছে!'

জুপিটারও করণ্ডাড আর সেখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করল না। সে-রাত্রে যারা উপস্থিত ছিল তাদের ঠিকানা বব-এর কাছ থেকে আগেই নিয়ে রেখেছিল। কুকুর নিয়ে যে-লোকটা গিয়েছিল তার নাম ডেভিস। জুপিটার কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে লোকটা ব'লে চল্‌ল—'আমার বন্ধুর সঙ্গে প্রথম রাত্রে বারান্দায় বসে গল্প করছিলাম। হঠাৎ দীর্ঘাকৃতি ও মোটাসোটা একজন অপরিচিত লোক এসে আমাদের বল্‌ল—বাড়িটা ভেঙে ফেলার আগে একবারটি ভাল ভাবে দেখে আসুন মশাই।'

'—তাকে আবার দেখলে মুখটা চিনতে পারবেন!'

তখন তার মুখটা দেখলে সুযোগ হয়নি। আসলে রাত্রির আবছা অন্ধকার, তার ওপর টুপিটাকে সামনের দিকে এতটা নামিয়ে দেয়া ছিল। ফলে তার মুখটা দেখাই যায়নি। একেবারে হেড়ে গলায় কথা বলছিল লোকটা। গোড়ার দিকে মোটেই আমল দেই নি। খুব পীড়াপীড়ি করলে শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেলাম। কুকুরটাকেও সঙ্গে নিলাম। কিছুটা পথ গিয়ে আরও দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে নিলাম। আমরা ভীত-সন্ত্রস্ত—।

'—একটা কথা,' আপনারা সে-রাত্রে ক'জন ভুতুড়ে বাড়িটায় গিয়েছিলেন, বলতে পারেন? জুপিটার ডেভিস এর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল।

লোকটা কোনরকম চিন্তা ভাবনা না করেই ডেভিস উত্তর দিল—'সঠিক বলতে পারব না। তবে ছয় বা সাতজন।

'—আর একটা কথা ভূতটা যখন আপনানের চোখের সামনে উদয় হল তখন কুকুরটা কোনরকম চীৎকার চেঁচামেচি করে নি?'

'—একটা টু শব্দও করেনি। বরং অভ্যাস বশতঃ নিশ্চিন্তে লেজ নাড়ছিল।'

জুপিটার ও করর্ণাড বিদায় নিয়ে বাড়ির বাইরে এল' জুপিটার উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে ব'লে উঠল—'বাঃ! সব কিছু হু বহু মিলে যাচ্ছে। চল করর্ণাড, বাড়ি ফেরা যাক।'

পাখির ডাকে সকাল হ'ল। চোখ মেলে দেখে পিটি অকাতরে ঘুমোচ্ছে। তাকে বিরক্ত না করে একাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে সকালে কুয়াশা ঢাকা রাস্তা দিয়ে কিছুক্ষণ পায়চারি করল! বাড়ি ফিরে দেখে, প্রাতঃরাশের ব্যবস্থা করে মিস গ্রীণ অপেক্ষা করছেন। টেবিলে বসে তিনি বব আর পিটি'র মুখ থেকে তাঁর বাড়ির ভূতের কান্ড কারখানার কথা আদ্যোপান্ত শুনলেন। সবকিছু শুনে মিস গ্রীন সাদা চকের মত ফ্যাকাসে মুখে বললেন—'আমি নিঃসন্দেহ যে, আমার ম্যাথিউস গ্রীণ-এর প্রেতাত্মারই কান্ড! আমি বাড়িটা ভাঙতে শুরু করায় আমার আমার ওপর খুবই ক্ষেপে গেছেন। আমার অপরাধ কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছেন না।'

দুপুরের ট্রেন ধরে পিটি ও বব রকি বীচে ফিরে যান। প্রাতঃরাশ সেরে তারা চার্লস এর সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে ভ্যারডান ভ্যালীটা ঘুরে ভাল করে দেখার জন্য বেরোল। পথ চলতে চলতে চার্লস গ্রীণ বল্লেন—আমি এখানে পা দেবার পরই নাকি এখানে যত অমঙ্গল ঘটতে শুরু করেছে। পিসিমার মদের কারখানা ও আঙুরের বাগানের সর্বনাশ ঘটা, মুক্তোর হার ছড়া উধাও হওয়া, পিসিমা ভূত দেখে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন—আর যা কিছু।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা একটা পরিত্যক্ত খনির কাছে হাজির হ'ল। সঙ্গে টর্চ নেই। খনির ভেতরে অন্ধকার। ভেতরের কিছুই দেখতে পেল না তারা। হঠাৎ একটা জীপ থেকে নেমে কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। জেনসন্ এবং দু'জন লোক জীপ থেকে নেমে কি সব কথা বলাবলি করছে দেখতে পেল।

চার্লস গ্রীন দৌড়ে গেল। জেনসন্ টর্চ আছে ব'লে স্বীকার করল না। চার্লস ভালই জানেন, যন্ত্রপাতির বাক্সে ছোট্ট একটা টর্চ সর্বদা থাকে। তিনি নিজেহাতে বাক্স খুলে টর্চটা নিলেন। জেনসন্ এতে রেগে একেবারে কাঁই হয়ে গেল। চার্লস ব্যাপারটাকে আমল দিলেন না। জেনসন শেষ পর্যন্ত অসহায় দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

চার্লস টর্চটা এনে পিটি'র হাতে দিলেন। পিটি টর্চটা নিয়ে সুইচ টিপে হতাশ হল! টর্চ জ্বলছে না। চার্লস তার হাত থেকে টর্চটা নিয়ে পিছন দিকটা খুলে ব্যাপারটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে চাইলেন। টর্চের পিছন দিকটা খুলতেই ব্যাটারীর পরিবর্তে একটা কাগজে মোড়া কি যেন ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। সবিস্ময়ে সেটা খুলতেই তাঁর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। শরীরের স্নায়ুগুলো এক সঙ্গে সচকিত হয়ে উঠল। আপন মনে ব'লে উঠলেন—'এ যে খোয়া যাওয়া মুক্তোর হারছড়া। তবে জেনসন্ই এটা চুরি করেছে! ভেবেছিল, টর্চের মধ্যে রেখে দিলে কাক-পক্ষীও টের পাবে না। তাই ত টর্চে হাত দেয়ামাত্র সে এমন রাগারাগি করছিল।'

পিটি বল্‌ল—'আমাদের আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা উচিত নয়। জেনসন্ লোকজন নিয়ে আমাদের ওপর চড়াও হয়ে হারছড়া ছিনিয়ে নিতে পারে। তা ছাড়া বাড়ি গিয়ে আপনার পিসিমা ও মিঃ কার্লসন'কে সব বলা দরকার। আর শেরিফ'কে দিয়ে শয়তান জনসনকে হাতকড়া পরিয়ে গারদে ঢুকিয়ে দিয়া উচিত।

চার্লস বল্‌লেন—'তা-ত অবশ্যই করা দরকার। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জেনসন্ এত সহজে হাল ছেড়ে দেবে না। তাকে দোষী প্রমাণ কিছুতেই সে করতে দেবে না। তার আগেই আমাদের—।

'—তবে ত আমাদের মুহূর্তমাত্র দেরী করা উচিত নয়।'

'—অবশ্যই আমরা ঐ টিলার আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে দেখে নেই সে কি করছে!'

চার্লস তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে টিলার আড়ালে চলে গেলেন। দেখলেন জেনসন্-এর জীপ অদূরবর্তী বস্তীটায় ঢুকছে। চার্লস বল্‌লেন—'সে লোকজন জোগাড় করতে চলেছে। আমরা যাতে পালিয়ে না যাই তার জন্য সঙ্গী দু'জনকে সরু পথটা আগলাবার নির্দেশ দিয়ে বস্তিতে লোকজন ও ঘোড়া আনতে ছুটেছে। সে ফিরে আসার আগেই আমাদের গুহার

মধ্য দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে সাফ্রান্সিসকো যাবার সদর-রাস্তায় উঠতে হবে!'

চার্লস গ্রীন, বব ও পিটি ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। পাহাড়ের গুহা পেরিয়ে তারা একটা জলাভূমির কাছে পেঁছিল। আর ঘোড়ায় যাওয়া সম্ভব নয়। তারা ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল। চার্লস ছুটতে ছুটতে বল্লেন—'জেনসন্, আমাদের পিছু নিলে ঘোড়াগুলোকে দেখে ভাববে আমরা ধারে-কাছেই কোথাও ঘাপটি মেরে রয়েছি। ফলে আমাদের খুঁজতে গিয়ে সময় নষ্ট করবে। আর আমরা ততক্ষণে অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে ফেলতে পারব। তার পক্ষে আর আমাদের ধরা সম্ভব হবে না।

তারা পাহাড়ের একটা ফাঁটল খুবই সরু পথ ধরে ছুটতে লাগল। সামনেই একটা পাহাড়ের অনুচ্চ চূড়া। চার্লস বললেন 'পিটি ও বব তোমরা এখানে অপেক্ষা কর। আমি চূড়াটা ডিঙিয়ে ওপারে যাচ্ছি। নিরাপদ বুঝলে হাততালি দিয়ে সঙ্কেত জানাব। তোমরা তখন যাবে।' কথা বলতে বলতে চার্লস এগিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে চোখের আড়ালে চলে গেলেন। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই একবার হাততালির শব্দ শোনা গেল। এবার পিটি'কে রেখে বব এগিয়ে গেল। মিনিট দু'-তিনের মধ্যেই বব-এর চীৎকার শোনা গেল—'পিটি তুই এগোস না এখানেই থাক, তার কণ্ঠস্বরটা কেমন যেন চাপা চাপা শোনাল। কেউ যেন তার মুখ চেপে ধরে রেখেছে। সে আতঙ্কিত হ'ল। ভাবল, বব আর চার্লস কোন রকম বিপদে পড়েছে। তার কাছেই বহুমূল্য মুক্তোর হারছড়াটা রয়েছে। সে অনন্যোপায় হয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে ভাবল। মাথার ওপর খড়গ ঝুলছে। একা আর এগোতে চেষ্টা না করাই ভাল। সে একটা পাথরের খাঁজের ভেতরে হারছড়াটা লুকিয়ে রাখল। এবার একটা পাথরের চাঁই-এর ওপর বসে ক্লান্তি অপনোদন করার কথা ভাবল।

বরাত মন্দ। ধূর্ত জেনসন্-এর হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া চার্লস, পিটি বা বব কারো পক্ষেই সম্ভব হ'ল না। জেনসন্ তাদের তিনজনকে মদের পিপার মধ্যে ভরে গাড়ীতে চাপাল। এভাবেই নিয়ে চলল সদর-রাস্তা দিয়ে সবার চোখের সামনে দিয়ে। পথচারীদের ত ভাববার অবকাশ নেই যে, এগুলোর মধ্যে মদের পরিবর্তে মানুষ চালান দেয়া হচ্ছে।

কিছুক্ষনের মধ্যেই গাড়ীটা তাদের নিয়ে একটা পুরনো বাড়ির সদরদরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। পিপে থেকে তাদের বের করে চোখ বেঁধে দেয়া হ'ল। এবার তাদের নিয়ে ছোট্ট একটা ঘরে ঢুকিয়ে দেয়া হ'ল। তারা আবছা অন্ধকারে বুঝল, ঘরটাতে একটামাত্র দরজা।

তারা ঘরের মেঝেতে কান পেতে ট্রাক যাতায়াতের শব্দ শুনতে পেল। বুঝল, তাদের বড় শহরে আনা হয়েছে।

বব ও পিটি এবার মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে, জুপিটার যে বলেছিল, সবুজ ভূতের সঙ্গে অনেক রহস্য জালের মত জড়িয়ে রয়েছে, খুবই সত্য বটে।

হঠাৎ ঘরের দরজাটা খুলে গেল। বেটে গোলগাল চেহারার একটা চীনে লোক তাদের ঘর থেকে বের করে নিয়ে গিয়ে লিফটে তুলল। এবার তাদের নিয়ে অন্য আর একটা ঘরে ঢুকিয়ে দেয়া হ'ল। ঘরের কেন্দ্রস্থলে এক বৃদ্ধ চেয়ারে বসে। চীনে লোক। ঢিলেঢালা পোষাক পরণে। বৃদ্ধ বললেন—'আমার নাম ওয়ান্। এক শ' সাত বছর আমার বয়স।' এবার চার্লস-এর দিকে ঘাড়-ঘুরিয়ে বললেন—তোমার ধমনীতে আমার রক্ত বইছে' তোমার প্রপিতামহ ছিলেন ম্যাথিউস গ্রীন। তিনি আমাদের পরিবারের দুটো জিনিস চুরি করেছিলেন। একছড়া মুক্তোর হার আর এক রূপসী যুবতীকে। তাকে অবশ্য বিয়ে করেছিলেন। দীর্ঘদিন পর খোয়া যাওয়া মুক্তোর হারছড়াটা খোঁজ পেয়েছি। আমি নিঃসন্দেহ তোমরা সেটার খোঁজ জান। আজ তোমাদের সামনে দুটো রাস্তা খোলা মৃত্যু আর মুক্তি। একমাত্র মুক্তোর হারছড়াটার বিনিময়েই তোমাদের মুক্তি হতে পারে।'

চার্লস কাঁপা কাঁপা গলায় কোনরকমে উচ্চারণ করল—সেগুলো ত এখন আমার পিসি লিডিয়া গ্রীন-এর প্রাপ্য। অতএব মুক্তোগুলো নিলে আপনি আমার পিসিকে বিনিময়ে টাকা দেবেন নিশ্চয়ই ?

'—অবশ্যই। জেনসন্‌কে ত আমি বলে দিয়েছি, আঙুর বাগান আর মদের কারখানা দেনা তাকে শোধ দিতে হবে না! তার অজান্তে আমিই তাকে অর্থ ধার স্বরূপ দিয়েছিলাম। যাক, আধঘণ্টা সময় দিচ্ছি তোমাদের। ভেবে দেখ, কোন, পথ বেছে নিতে তোমরা আগ্রহী' বেটে ও মোটাসোটা লোকটা আবার ঘরে ঢুকল। তাদের ঘর থেকে বের করে নিয়ে এল।

ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে চার্লস, বব আর পিটি পরামর্শ করল। সব্যস্থ হ'ল বৃদ্ধের হাতে মুক্তোগুলো তুলে দেবে।

নির্দিষ্ট সময়ে তাদের আবার ঘরের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। বৃদ্ধ কোন কথা বলার আগেই চার্লস বলল—আমরা আপনার প্রস্তাবে সম্মত।'

পিটি বলল—মুক্তোগুলো ত আমাদের সঙ্গে নেই! পাহাড়ের একটা ফাঁটলের মধ্যে হাড়ছড়াটা লুকিয়ে রেখেছি। একমাত্র আমিই তা জানি। কিন্তু মিঃ চার্লস ছাড়া রাস্তাটা আমরা দু'জনের কেউ-ই চিনি না।

'—ভাল কথা। বিকেলে জেনসন, তোমাদের সঙ্গে যাবে। মুক্তার হারছড়াটা বুঝে পেলে তোমাদের ছেড়ে দেবে। আর যদি চালাকির সাহায্য নাও তবে জেনে রাখ, মৃত্যু অনিবার্য। যাও এখন বিশ্রাম কর গিয়ে। বিকেলে জেনসন্ তোমাদের সঙ্গে পাহাড়ে যাবে! আবারও বলছি, চালাকি বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টা কোরো না।'

জুপিটার ফোনে মিস লিডিয়া গ্রীন-এর কথা ব'লে চার্লস, পিটি আর বব-এর নিরুদ্দেশের খবর পেয়েছে। জুপিটার বলল—আপনি তাদের খোঁজে যাদের পাঠাবেন তারা যেন সবুজ চকের জিজ্ঞাসা—চিহ্ন দেখতে পেলে তা অবশ্যই অনুসরণ করে যেন। বব আর পিটি নতুন কোন জায়গায় গেলে জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়ে দেবে। আমি এক্ষুণি ট্রেন ধরে আপনার ওখানে যাচ্ছি।'

জুপিটার ফোন রেখে দিল।

চার্লস, বব আর পিটির খোঁজে একদল লোককে মিস লিডিয়া গ্রীন অনেক আগেই পাহাড়ের দিকে পাঠিয়েছেন। তারা বেড়াতে যাবার সময় সেদিকে যাবার কথাই বলে গিয়েছিল।

জুপিটার নির্দিষ্ট সময়ের আগেই মিস লিডিয়া গ্রীন-এর বাড়ি পেঁছে গেল। মিস লিডিয়া জানালেন, পাহাড়ের দিকে যারা খোঁজ করতে গিয়েছিল তারা এখনও ফিরে আসেনি। ফলে নিরুদ্দিষ্টদের কোন খবরই তিনি পান নি।

সবুজ চকের জিজ্ঞাসা-চিহ্নের ব্যাপারটা মিস লিডিয়া গ্রীন'কে জুপিটার বলল—'এটা আমাদের দলের প্রতীক-চিহ্ন, কেননা অনুসন্ধান

চালাবার সময় দেয়ালে সবুজ-চক দিয়ে এ-চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয় যাতে তাদের খুঁজে বের করা সম্ভব হয়।'

জুপিটার এবার বব-এর টেপরেকর্ডার চালিয়ে প্রথম দিনের রহস্যময় আর্তনাদ ও অন্যান্য লোকজনদের কথাবার্তাগুলো মিস লিডিয়া গ্রীন্‌কে শোনাল। টেপের কথাবার্তা শেষ হলে জুপিটার বলল—'মিস লিডিয়া মোটা কণ্ঠস্বরটা কার, চিনতে পারছেন?'

লিডিয়া গ্রীন উত্তেজিত কণ্ঠে জবাব দিলেন—হ্যাঁ, খুবই পরিচিত কণ্ঠস্বর! এটা যে কার্লসন্‌-এর গলা এতে কিছুমাত্রও ভুল নেই। আর এ-রহস্যের সঙ্গে সে যে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তা-ও আমি অনুমান করেছি। নচ্ছাড়টা আমার সঙ্গে বেশ কিছুদিন যাবৎ শত্রুতা করছে। ইদানিং আমার কর্মচারীদের ভূতের ভয় দেখিয়ে কারখানাকে তুলে দেবার জন্য আদা জল খেয়ে লেগেছে। আসলে বেনামে আমার কারখানা ও আঙুর-বাগান প্রভৃতি জলের দামে কিনে আত্মসাৎ করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য।'

এমন সময় বৃদ্ধ চাকর লি-এর সঙ্গে শোবার ঘরে ঢুকলেন। কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ প্রকাশ করে বললেন—'তাদের খোঁজ পাওয়া কি সম্ভব হ'ল।'

'—না।'

'—আপনি কি প্রচার করেছেন, কেউ সবুজ-চকের জিজ্ঞাসা-চিহ্ন দেখতে পেলে কাকে পুরস্কার দেবেন? টম নামে ছোট্ট একটা ছেলে নাকি এরকম চিহ্নের খোঁজ পেয়েছে। একটা পিপের গায়ে আঁকা ছিল। মরুভূমিতে যাবার পথে।'

ছেলেটাকে ডেকে আনা হ'ল। সে দৃঢ়তার সঙ্গে বলল—'আমি সবুজ চকের আঁকা জিজ্ঞাসা-চিহ্ন দেখছি। আপনা যদি দেখতে চান। অবশ্যই দেখিয়ে দিতে পারব!'

আর মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে শেরিফ মিস লিডিয়া গ্রীন, জুপিটার এবং টম নামক ছেলেটাকেও সঙ্গে নিয়ে নিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা টম-নির্দেশিত স্থানে হাজির হ'ল। টম গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে পিপেগুলোর গায়ে আঁকা জিজ্ঞাসা চিহ্ন বের করে দেখায়।

মিস লিডিয়া গ্রীন চেঁচিয়ে বল্‌লেন—'একটু অপেক্ষা করুন। আমি নিরুদ্দিষ্টদের খোঁজে কারখানার দিকে যাচ্ছিলাম কখন বিশালায়তন

একটা ট্রাকে জেনসন'কে বসে থাকতে দেখেছিলাম বটে। হ্যাঁ তিনটে পিপেও ট্রাকের ভেতরে নাকি ছিল। ব্যাপারটা আমাকে আরও বেশী করে ভাবিয়ে তুল্‌ল, যখন শ্রমিকদের মুখে শুনলাম, আজ শহরে মদ চালান দেবার দিন নয়।'

'—তবে দেখা যাচ্ছে কার্লসন-এর সঙ্গে জেনসন্‌কেও আমরা সন্দেহ করতে পারি। এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে এল বব আর পিটি তাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে গেছে। এবং তাদের কোথাও বন্দী করে রেখেছে।'

জুপিটার শেরিফের গাড়ীতে চল্‌ল সানফ্রান্সিকো পুলিশের প্রধান কার্যালয়ে। কিছুদূর গিয়ে গাড়ি থামিয়ে জুপিটার লাফিয়ে নেমে গেল! গাড়ীর হেডলাইটের আলোয় দেখল, একটা গাছের ডালের সঙ্গে এক টুকরো কাগজ বাঁধা। ডায়েরীর ছেঁড়া পাতায় লেখা রয়েছে—'MINE' 'HELP'—???—(39)। জুপিটার চিনল হাতের লেখাটা বব-এর। সাঙ্কেতিক লিপির মানে করতে গিয়ে সে বল্‌ল—'MINE' অর্থখনি। অর্থাৎ খনির মধ্যে ওরা আছে। কিন্তু '39'-এর অর্থ? দূরত্ব বোঝাচ্ছে কি? শেরিফ বল্‌লেন তা কি করে হবে? খনির দূরত্ব ত মাত্র দু'মাইল। জুপিটার বল্‌ল—খনির কোন নম্বর নয় ত?' শেরিফ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন। 'না, এখানকার খনিতে কোন নম্বর ব্যবহার করা হয়। না।' জুপিটার মুহূর্তকাল ভেবে বল্‌ল—'সানফ্রান্সিকোতে পুলিশ চেয়ে আবার খবর পাঠান।'

তরুণ রহস্যভেদী বব আর চার্লস গ্রীন'কে হ্যাসনাইফ কেনিয়নের পরিত্যক্ত খনির মধ্যে আটকে রাখা হয়েছে। দু'জন জোয়ান মরদকে জেনসন তাদের পাহারায় নিযুক্ত করেছে। খনির ভেতরে ও বাইরে জমাট বাঁধা অন্ধকার। মুক্তোর হারছড়া উদ্ধার করার জন্য জেনসন্‌ পিটি'কে নিয়ে গেছে।

চার্লস চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—'কিন্তু সমস্যা হচ্ছে পিটি যদি মুক্তোর হারছড়া খুঁজে বের করতে না পারে?

'—ভাবতে হবে না। ঠিক বের করে ফেলবে! ওর উপস্থিত বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি পাল্লা দিয়ে চলে।'

পথ চলতে চলতে জেনসন্‌ পিটিকে বললেন—'বাপধন, মুক্তোর হারছড়া

না পেলে তোমাদের তিনজনকেই ক্যানিয়নের গর্তে ছুঁড়ে দেব। সবাই ভাববে, দুর্ঘটনায় তোমাদের সবার মৃত্যু হয়েছে। হারছড়া পুলিশের হাত ঘুরে লিডিয়া'র হাতে এল। শেষ পর্যন্ত কৌশলে হারছড়াটা সিন্দুক থেকে গায়েব করা হল। আমি ঘটনাটাকেই এমনভাবে দাঁড় করলাম, সবাই জানবে মিঃ ওয়ান্‌ই হারছড়াটা চুরি করিয়েছেন। বরাতের ফের! সেটাকে তিনি কিন্তু আজও চোখেও দেখতে পেলেন না!' কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে ব'লে মিঃ কার্লসন কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরব হলেন।

কার্লসন্‌ বক্তব্য শেষ করলে জুপিটার কোটের পকেট থেকে সঙ্কেত লিপির কাগজটা বের করে বল্‌ল—'বব তোর সাঙ্কেতিলিপির একটা জায়গা ছাড়া সবই উদ্ধার করতে পেরেছি। কিন্তু '39'-এদিয়ে কি বুঝাতে চেয়েছিলি. বল ত?

'আমাদের বন্দী করে মিঃ ওয়ান্‌-এর সাকরেদরা আমাদের নাকে ক্লোরোফর্ম ধরল। আমি যোগাসন চর্চা করি, জানিসই ত। তাই আমি দীর্ঘ সময় শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ করে রাখলাম। তাই ক্লোরোফর্ম আমার সংজ্ঞা লোপ করতে পারল না। কিন্তু মিঃ চার্লস ও পিটি সহজেই অজ্ঞান হয়ে এলিয়ে পড়ল। আমি চোখ ও মুখ বন্ধ করে মাতৃপ্রায় হয়ে পড়ে রইলাম। আমাদের এবার মদের পিপার মধ্যে ভরে ট্রাকে তুলে দিল। ভারড্যান্ট ভ্যালীর দিকে ট্রাকটা এগিয়ে চল্‌ল। ভারড্যাণ্ট ভ্যালীর এক জায়গায় ট্রাক থামিয়ে পিপা থেকে আমাদের বের করে কম্বল-ঢাকা দিয়ে দিল আমাদের। মিঃ চার্লস ও পিটি সংজ্ঞাহীন অবস্থাতেই পড়ে রইল। আমার সংজ্ঞা ত একেবারে টনটনে। ট্রাক আবার এগিয়ে চল্‌ল। আমি তখন কম্বলের ভেতর থেকে বেরিয়ে ডায়েরীর পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে পাতায় নম্বর দিয়ে দিয়ে ট্রাকের ডালার ফাঁক দিয়ে ফেলতে লাগলাম। উদ্দেশ্য চিরকুটগুলোর সূত্র ধরে কেউ খোঁজ করলে আমাদের অবস্থিতির হদিস পেয়ে যাবে। জুপিটার, তুই যে কাগজটা দেখেছিস '39' নম্বরের সেটা।

বব বক্তব্য শেষ করলে সবাই বহুভাবে তার বুদ্ধির তারিফ করল।

রকি বীচ-এর ভূতুড়ে বাড়ি ও মিস লিডিয়া গ্রীন-এর মদের কারখানা ও আঙুর বাগানের ভূতের উৎপাত ও মুক্তোর হারছড়াকে কেন্দ্র ক'রে যে জটিল রহস্যের জাল ছড়ানো হয়েছিল তার মীমাংসা সম্ভব হ'ল। তিন

তরুণ রহস্যভেদী এতবড় একটা রহস্যের মীমাংসা করতে পারবে এটা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি।

হ্যারল্ড কার্লসন-ই নাটের গুরু প্রমাণ হয়ে গেল। মিস লিডিয়া গ্রীক কিন্তু তাঁর এ আত্মীয়টির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেন না। বরং নির্বিবাদে সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে সেখান থেকে বিদায় নিলেন। মিঃ ওয়ান্‌'কে পুলিশ ধরতে পারল না। তার তিন সাকরেদকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে এল।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর তারা পাহাড়ের সরু গলিটার কাছে হাজির হ'ল। কিছুটা যেতেই পিটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কারণ, আচমকা পাথরের একটা চাঁই আলগা হয়ে বিকট শব্দ করে গড়িয়ে নীচে পড়তে লাগল। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে পথের-বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। পথ গেল বন্ধ হয়ে। পাথর না সরিয়ে আর এক পাও এগোতে পারল না। আবার দু'জনের পক্ষে পাথর সরানো সম্ভব নয়। অনন্যোপায় হয়ে জেনসন্‌ পিটি'কে নিয়ে খনিতে চার্লস আর বব-এর কাছে ফিরেই এল। ভাবল, দিনের আলোয় পাথর সরাবার চেষ্টা করতে হবে।

পিটি'কে নিয়ে চার্লস খনির মুখটার কাছাকাছি আসতেই শেরিফের কর্কশস্বর শোনা গেল—'জেনসন্‌, পালাবার চেষ্টা করবে না! খবরদার! তোমার চারদিকে পুলিশ। পালাবার চেষ্টা করলে মৃত্যু অনিবার্য।

জেনসন্‌ নিরুপায়! পুলিশের রাইফেল মাথা উঁচিয়ে এগিয়ে আসছে। পালিয়ে বাঁচার কোন সম্ভাবনাই নেই। সে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হ'ল।

পুলিশের সহযোগিতায় শেরিফ রহস্যভেদী বব ও পিটি'কে উদ্ধার করলেন। চার্লস'কেও নিরাপদে ফিরিয়ে আনলেন। সবাইকে লিডিয়া গ্রীন-এর বাড়িতে আনা হ'ল।

কার্লসন তাঁর স্বীকারোক্তিতে বল্‌লেন—'সমস্যা সেখা দিল বছর দেড়েক আগে। চার্লস'কে হংকং থেকে একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে নিয়ে আসার পর থেকে ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হ'ল। লিডিয়া গ্রীন-এর স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি আমি লাভ করব ধরেই রেখেছিলাম। কিন্তু চার্লস-এর আবির্ভাবে আমার সে আশায় ছাই পড়ল। কারখানা বাড়াবার অজুহাতে আমি লিডিয়া'র নামে টাকা ধার করতে লাগলাম। তাঁর কাঁধে চাপিয়ে দিলাম বিরাট ঋণের বোঝা। এদিকে গোপনে লোক লাগিয়ে

যন্ত্রপাতি বিকল করে দিয়ে গ্রায়ই তাঁকে দুর্ভাবনার মধ্যে রাখতাম। সে সঙ্গে ব্যবসায়ে লোকসানের ব্যাপারটা ত রইলই। সব মিলিয়ে তাঁকে চরম অশান্তিতে ডুবিয়ে রাখলাম। বেনামে কারবারটা কিনে ফেলার চক্রান্তেও এক সময় লিপ্ত হলাম। এদিকে লিডিয়া গ্রীন ঠিক করলেন রকি বীচের পুরানো বাড়িটা ভেঙে, মেরামত করে বেঁচে দিয়ে দেনা শোধ করবেন। এবং ব্যবসাটাকে চাঙা করে তুলবেন। ঠিক তখনই আমার হাতে ওয়ান্ নামে এক অতিবৃদ্ধের একটা চিঠি এল। তিনি নিজেকে ম্যাথিউস গ্রীন্-এর উত্তরাধিকারী বলে দাবী করলেন। আমি ঠিকানা অনুযায়ী সানফ্রান্সিসকোতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করি। বৃদ্ধ বল্লেন লিডিয়া জেনসন্ মারফৎ যতটাকা ধার নিয়েছেন সবই তিনি যোগান দিয়েছেন। উদ্দেশ্য, রকি বীচের বাড়িটাকে ভুতুড়ে বাড়ি ব'লে প্রচার করে সেটা ভাঙা বন্ধ করা। আর তার গোপন কুঠরিতে যে মুক্তোর হারছড়া রয়েছে সেটা তাকে দিতে হবে। পরিকল্পনা মাফিক কাজ শুরু হয়ে গেল। রকি বীচের বাড়িটা ভুতুড়ে বাড়ি ব'লে কম হৈ চৈ হয় নি। এটা আপনাদের আর কারো অজানা নয়। লিডিয়া বাড়িটা ভাঙতে মিস্ত্রি লাগাল। পুলিশের বড়কর্তা রেমল্ডস্ নিজে এসে তিন তরুণ রহস্যভেদীকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে বল্লেন—'তোমরা এ বয়সে যে অসম্ভবকে সম্ভব করলে তার জন্য আমার পক্ষ থেকে তোমাদের অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবুজ ভূতের রহস্যের সমাধান করার জন্য তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে সবুজ রঙের কার্ড উপহারস্বরূপ তুলে দিলেন পুলিশ-প্রধান। কার্ডগুলোর গায়ে স্পষ্টাক্ষরে ছাপানো রয়েছে—"এ-কার্ডের মালিক একজন রহস্যভেদী। এ রকি বীচের পুলিশকে জুনিয়র এ্যাসিস্ট্যান্ট ডেপুটী হিসেবে রহস্যের ব্যাপারে সহযোগীতা করে।প্রয়োজনে একে যেকোন রকম রহস্য-সহযোগিতা করলে তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকৃত হবে।"—স্যামুয়েল রেমল্ডস,—পুলিশ প্রধান।

সেদিন চিত্রপরিচালক অ্যালফ্রেড হিচকক এবং তরুণ রহস্যভেদী জুপিটার জোন্স, বব এণ্ডুজ এবং পিটি ক্রেন্স ওয়ার্লড স্টুডিও-তে টেবিলে মুখোমুখি বসে কথা বলছে। মিঃ হিচকক-এর উৎসাহে বব তার লেখা গোয়েন্দা—কাহিনীটা তাঁকে পড়ে শোনাল। বব-এর পড়া শেষ হলে মিঃ হিচকক সোল্লাসে ব'লে উঠলেন 'কাহিনীটা রীতিমত রোমাঞ্চকর, আতঙ্কে ভরপুর ত বটে।' এবার জুপিটার-এর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে

বললেন যদিএ কেসটার রহস্যভেদের ব্যাপারে তোমার তেমন কিছু ভূমিকা নেই, তবু তোমার নায়কত্ব অস্বীকার করা যাবে না।

জুপিটার মুচকি হাসল।

অ্যালফ্রেড হিচকক বললেন—সবই ত হ'ল, কিন্তু দুটো ব্যাপার কুয়াসাচ্ছন্নই রয়ে গেছে।'

জুপিটার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—'দুটো ব্যাপার? কোন দুটো ব্যাপারের দিকে আপনি অঙ্গুলি—নির্দেশ করছেন। দয়া করে বলবেন কি?'

'—ভূতুড়ে বাড়িটার যেদিন ভূত দেখা দিয়েছিল। সেদিন গ্রামবাসীদের একজনের সঙ্গে একটা কুকুর ছিল, তাই না। আর কুকুরটা কোনরকম চীৎকার চেঁচামেচি করে নি। অথচ তোমার বক্তব্যে আছে, কুকুরটা রহস্যভেদের ব্যাপারে তোমাকে নাকি যথেষ্ট সাহায্য করেছিল ব্যাপারটা একটু খোলসা ক'রে বলবে কি?'

'—দেখুন, কুকুরটার নীরবতাই আমাকে শার্লক হোমস-এর একটা কাহিনী আমার স্মৃতির পটে ভেসে উঠতে সাহায্য করে। কুকুরের নীরবতাকে মাথায় রেখেই তিনি একটা ঘটনার রহস্য ভেদ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কাহিনীটা আমার মনে আছে, ঘোড়া চোর কুকুরটার পরিচিত ছিল বলেই সে চীৎকার করে নি? কিন্তু তোমাদের ব্যাপারটা ত একই পর্যায়ে পড়ে না।'

'—হ্যাঁ, আমাদের ঘটনাটা একটু স্বতন্ত্র হলেও মূলতঃ সাদৃশ্য কিছু না কিছু আছেই। আশা করি আপনার জানা আছে, অলৌকিক কোন ঘটনার মুখোমুখি হ'লে কুকুর প্রভৃতি পশুরা বিশ্রী স্বরে গর্জন করতে করতে পালায়। কুকুরটা দু-দু'বার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করল। কুকুরটার নীরবতা আমাকে ভাবতে উৎসাহিত করল, ব্যাপারটা মোটেই অলৌকিক নয়। বরং কোন দুর্বৃত্ত রহস্য সৃষ্টি করে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চাইছে। এবার ভূত যে ভয়ঙ্কর স্বরে চীৎকার করে ছিল, সেটার কথা—'

জুপিটার-এর কথা শেষ হবার আগেই বব ব'লে উঠল—'ঐ বিশ্রী স্বরটা বাড়ির ভেতর থেকে নয়, অবশ্যই বাইরে থেকে স্বরটা এসেছিল।'

'হ্যাঁ, আওয়াজটা বাইরে থেকেও এসেছিল। কেমন মজার ব্যাপার ভেবে দেখুন! ভূত দেখা দিল বাড়ির ভেতরে, আর চীৎকার ভেসে এল

বাইরে থেকে ! তাই ভূতের ব্যাপারটাকে আমি মন থেকে মুছে—'

'—আমরা এতগুলো লোক তবে ভুল দেখলাম ?' পিটি প্রতিবাদ করল মুচকি হেসে অ্যালফ্রেড হিচকক বললেন—' তুমি নিঃসন্দেহ ওটা ভূত ছিল না ? তাই যদি বল তবে ওটা কি ছিল ?'

জুপিটার নির্বাক। সে চেয়ার ছেড়ে ওঠে ধীর পায়ে দেওয়ালের দিকে হেঁটে গেল। হাত বাড়িয়ে পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে বলল—'দেওয়ালের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন।' তার কথা শেষ হতে না হতেই সবুজ একটা আলো দেওয়ালে ফুটে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সবুজ ভূতও ভেসে উঠল সেখানে। ম্যাথিউস গ্রীন্-এর ভাঙাচোরা বাড়িটায় সে-সন্ধ্যায় ছায়া মূর্তিটা আবির্ভূত হয়েছিল অবিকল সে রকম দেখতে দেওয়ালের মূর্তিটা। এমন কি মৃদু দোলও খাচ্ছে। কয়েকমুহূর্ত পরে দেওয়ালের গায়ের সবুজ ছায়ামূর্তিটা মিলিয়ে গেল।

অ্যালফ্রেড হিচকক বিস্ময় ভরা চোখে জুপিটার-এর মুখের দিকে তাকালেন। জুপিটার বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী একটা টর্চ লাইট তার হাতে ছিল। জুপিটার বলল—'এতে ফিল্ম ব্যবহার করা চলে। ভূতের ফিল্ম ভরে আলো ফেললে ভূতের ছবি ফুটে উঠবে, আশ্চর্য কি ! কার্লসন্ এটা ব্যবহার করে ভুত দেখাতেন, মানুষের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার করতেন।'

অ্যালফ্রেড হিচকক-এর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। তিনি সোল্লাসে ব'লে উঠলেন –'চমৎকার ! চমৎকার !'

———

ছেলেবেলায় আমি কাকার আশ্রমে ছিলাম। নরল্যাণ্ডের পাদরিদের পাড়ায় আমার কাকার বসত-বাড়ি ছিল। হাড়ভাঙা খাটুনির বিনিময়ে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দিতেন আমাকে। একচুল এদিক ওদিক হলেই চলত উত্তম মধ্যম। পিটুনির চোটে হাড়-মাস এক করে ছাড়তেন। রীতিমত এক দুর্বিষহ জীবন ছিল সেটা। হাতের মুঠোয় কোন সুযোগ এলেই আমি দড়িছেঁড়া গরুর মত ছুটে যেতাম কোন অরণ্যে নয়ত ধারে-কাছের কোন গীর্জায়।

পাদরিদের বাড়িগুলো ছিল শান্ত-স্নিগ্ধ চমৎকার পরিবেশে। আর গীর্জাটা? অনুচ্চ এক পাহাড়ের ওপর চকচকে ঝকঝকে গীর্জাটাকে দূর থেকে ভারী চমৎকার দেখাত। গীর্জার চত্বরে কোন পাহারাদার ছিল না। আসলে দরকারই বা কি? আর কবরগুলোর ওপর কোনদিন ফুল

ছড়িয়ে থাকতে দেখি নি। প্রত্যেকটা কবরই আমার পরিচিত ছিল। কোনটার গায়ে কি লেখা ছিল তা-ও আমার মুখস্ত। আর সদ্য কবর দেয়া মাটির ওপর ক্রুশ চিহ্ন বসাতেও দেখেছি সামনে দাঁড়িয়ে। এখানকার কিছুই আমার অজানা নয়। এক দুর্যোগের রাত্রে সব ওলট পালট হয়ে গেল। সবগুলো কবর এক সঙ্গে নির্মূল হয়ে গেল।

কবরখানার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আরও গভীর হয়ে উঠল। গীর্জার প্রাঙ্গনে কাটত আমার সারা দিনের একটা বড় ভগ্নাংশ! কর্মরত অবস্থার কথা বলছি। তখন গীর্জার এক কর্মীর সঙ্গে আমার প্রায়ই গল্প হ'ত। সামান্য বেতনের কর্মী। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। খুবই অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে তার দিন কাটত। নিরবচ্ছিন্ন দারিদ্র্য তার মুখের হাসি কেড়ে নিয়েছিল। আমার সঙ্গে কিন্তু তার খুবই হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। অসমবয়সী হলেও সমবয়সী বন্ধুর মত আমরা মেলামেশা করতাম। লোকটা আমার সত্যিকারের হিতাকাঙ্খীও ছিল বটে। কবর খোড়ার সময় সে আমাকে কিছুতেই কাছে যেতে দিত না। একদিন আমি কৌতূহল বশতঃ আড়ালে-আবডালে লুকিয়ে তার কাজ দেখছিলাম। সে কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে একটা উরুর হাড় তুলল। বারকয়েক নেড়ে-চেড়ে দেখে সেটাকে পাশে রেখে দিল। আবার কোদাল চালাতে লাগল। এবার উঠল একটা মাথার খুলি। তার দাঁতের পাটি অক্ষুণ্ণ রয়েছে। আচমকা তাকালে মনে হয় খিল খিল ক'রে হাসছে। ভয়ঙ্কর সে-দৃশ্য। শরীরের সব ক'টা স্নায়ু একসঙ্গে সচকিত হয়ে ওঠে। বুকের মধ্যে ধড় ফড়ানি শুরু হয়ে যায়।

কবরের ওপর দিয়ে ঘোরাফেরা করতে আমার খুব ভাল লাগে। কৌতূহল বশতঃ খোঁজাখুঁজি করে মানুষের শরীরের বিভিন্ন হাড়ের টুকরো কুড়িয়ে পেতাম। গীর্জায় কর্মীটার মত আবার মাটি খুঁড়ে সেগুলো চাপা দিয়ে দিতাম। একাজে আমি এমনই অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিলাম যে, সেগুলো নাড়াচাড়া করতে আমার মোটেই ঘৃণা বা ভয় কোনটাই করত না। ব্যাপারটা এমন হয়ে গিয়েছিল যেন অন্য দশটা কাজের মতই এটাও আমার কাছে স্বাভাবিক ব্যাপার।

গীর্জার একপাশে ছিল সমাধিক্ষেত্রটা। তারই গা-ঘেঁষে ছিল সমাধিকক্ষ। বেশ বড়সড় একটা ঘর। তাতে বহু হাড় মাথার খুলি প্রভৃতি সর্বদা ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে থাকত। আমি প্রায়ই সেখানে সেগুলো

নাড়াচাড়া ক'রে বহু সময় আনন্দ-উৎসাহে কাটিয়ে দিতাম। ছোট-বড় হাড়ের টুকরো দড়ি দিয়ে বেঁধে বেঁধে মালা তৈরী করতাম। একটা খুলিকে লকেট হিসাবে ব্যবহার করতাম! ভারী চমৎকার হ'ত দেখতে।

একদিন সমাধি কক্ষে হাড়গোড় নাড়াচাড়া করতে করতে অদ্ভুত একটা দাঁত আবিষ্কার করলাম। হাত বাড়িয়ে তুলে নিলাম। সাদা ঝকঝকে চকচকে দাঁতটা দেখে আমার খুব কৌতুহল হ'ল। কি জানি কি ভেবে প্যান্টের পকেটে পুরে ফেললাম! ভাবলাম সেটার ওপর নকসা তুললে ভারী চমৎকার একটা জিনিস হয়ে উঠবে। ব্যস, দাঁতটাকে নিয়ে সোজা বাড়ি চলে এলাম। পকেট থেকে বের করে বার কয়েক নেড়েচেড়ে দেখলাম সেটাকে।

আমার ভাললাগা দাতটাকে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলাম। ঘণ্টা দুই ধরে ঘষে ঘষে সেটাকে আরও উজ্জ্বল করে তুললাম। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি হয়ে গেল। আকাশের গায়ে শুক্লপক্ষের চাঁদটা ঝুলে রয়েছে! ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে সেটাকে। ঘরের ভেতরে কোন আলো নেই। জানালা দিয়ে চাঁদের আলো ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে। আলো জ্বালার সব রকম উপকরণই হাতের কাছে মজুত রয়েছে। তবু কাঁচপোকার উপদ্রবের ভয়ে আলো জ্বালতে উৎসাহ পেলাম না। তা ছাড়া চাঁদের আলোতে কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে না। একটা জ্বলন্ত ষ্টোভের আলো যা আমার কাজের সহায়ক হচ্ছে। জরুরী দরকারে আমি মিনিট দু'তিনের জন্য পাশের ঘরে গেলাম। ঘরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারে পা টিপে টিপে ঘরের ভেতরে গেলাম। হঠাৎ একটা অবিশ্বাস্য কান্ড ঘটে গেল। কে যেন আমার পিছনদিক থেকে আলো ফেলল। চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনদিকে তাকালাম। অবাক হতে হ'ল। কাউকেই চোখে পড়ল না। সর্বাঙ্গে কেমন একটা শিহরণ অনুভব করলাম। নিজের পরিস্থিতির ওপর আস্থা হারিয়ে ফেললাম। ভাবলাম, আমি সজাগ, নাকি নিদ্রিত? হাস্যকর ভাবে বার কয়েক নিজের গায়ে হাত বুলিয়ে নিলাম। কই, আমি ত জেগেই রয়েছি। আমার চোখ দুটো বেশ খোলা। কানেও শুনছি পরিষ্কার। মনের সন্দেহ নিরসনের জন্য দু'তিনবার তুড়ি বাজালাম। এই ত, পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। এবার চীৎকার করলাম—'কে? কে এখানে?' হতাশ হতে হ'ল।

আমার চীৎকারে কেউ সাড়া দিল না। আর একটু এগোতেই মাথায় এক ঠোক্কর খেলাম। আচমকা মাথায় হাত দিতেই চমকে গেলাম। একেবারে বরফের মত ঠাণ্ডা।

আমি অন্ধকার ঘরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম! ব্যাপারটা আমাকে একেবারে স্তম্ভিত করে দিল। ভাবলাম, কোথাও আমার ভুল হচ্ছে না ত? নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেললাম। আবার মাথায় হাত দিলাম। না, কিছু নেই, আশ্চর্য ব্যাপার ত! সে-শীতল ভাবটা কেটে গিয়ে স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে।

আমি অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়েই ভাবতে লাগলাম। তবে কি আমি মাথায় ঠোক্কর খাইনি? ওপর থেকে মাথায় কিছু পড়েছিল কি? কিন্তু ছাদে এমন কি থাকতে পারে যা মাথায় পড়ে আমার ভাবান্তর ঘটিয়ে দিতে পারে? আমি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভাসতে ভাসতে কয়েকটা কাঠের টুকরো নিয়ে ঘর-ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

পকেট থেকে দাঁতটা বের করলাম। ফাইল দিয়ে ঘষে ঘষে সেটাকে উজ্জ্বল করে তোলার কাজে মন দিলাম। আচমকা কেমন একটা ঠক্ ঠক্ শব্দ কানে এল। মনে হ'ল, কে যেন জানালায় টোকা দিচ্ছে। ঘাড় ঘুরিয়ে জানালাটার দিকে তাকালাম। অচেনা একটা মুখ জানালায় দাঁড়িয়ে। একেবারেই অজানা অচেনা মুখ। কোনদিন দেখেছি বলেও মনে হল না। পাদরি-পাড়ায় সবাই আমার চেনা। তার ওপর মুখটাও কেমন অস্বাভাবিক। থ্যাবড়া মুখ, নাকটাও অস্বাভাবিক রকম থ্যাবড়া। দাড়িগুলো বড় বড় এবং ঘনলাল। গলায় লাল একটা মাফলার জড়ানো। এমন কি মাথার টুপিটা পর্যন্ত লাল। এ রকম কোন মুখ সত্যি এ তল্লাটে আমার চোখে আগে কোনদিন পড়েনি।

ব্যাপারটা নিয়ে আর ভাবতে পারলাম না। আতঙ্কে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল। শ্বাসক্রিয়া দ্রুততর হয়ে উঠল। মাথার ভেতরে দপ্‌দপানি শুরু হয়ে গেল। আসলে কোন কিছু গভীরভাবে ভাববার মত মানসিকতা সে-মুহূর্তে আমার ছিলই না। অবশ্য মোটামুটি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ঘরের বাইরে তখন চাদের আলো ছিল ঠিকই। কিন্তু রহস্যের আধারে সে চাদের বিপরীত দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল। এ-অবস্থায় আমার পক্ষে তার মুখটা কি করে স্পষ্ট দেখা সম্ভব হতে পারে? আর সে চকের মত সাদা মুখে একজোড়া জ্বলজ্বলে

চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়েছিল। ভয়ঙ্কর সে-দৃশ্যটা সহ্য করার মত মানসিকতার অভাব ছিল আমার। পা দুটো থরথর করে কাঁপছিল, শরীর টলছিল, বুকের মধ্যে অনবরত ঢিবঢিবানি চলছিল। স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকাই আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়েছিল।

আমি জানালার অবাঞ্ছিত মুখটার দিকে আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে রইলাম। লোকটা এবার বিশ্রী স্বরে হেসে উঠল। ভয়ঙ্কর সে-হাসির শব্দ। সে-সঙ্গে বিকট তার মুখ-ভঙ্গিমা। হাসির শব্দ কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের ঢিপঢিবানি অনেকাংশে বেড়ে গেল। ভাবলাম, এই বুঝি সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম আমি। আমার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, বিরাট হাঁ ক'রে বিশ্রী স্বরে লোকটা হেসেই চল্‌ল। ভাবলাম এ কী আশ্চর্য ব্যাপার বাবা? 'লোকটা হাসতে হাসতে হার্ট-ফেল না করে! নাকি আমাকেই হার্টফেল করাতে যাচ্ছে! আমার হাত দুটো ক্রমেই কেমন অবশ হয়ে আসতে লাগল। হাতের জিনিসটা নিজের অজান্তে টপ্‌ ক'রে মাটিতে পড়ে গেল। ভয়ে-আতঙ্কে আমার সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কেঁপেই চলল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার ভয়ঙ্কর সে-মুখটার ওপর থেকে কিছুতেই আমার চোখ দুটোকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হ'ল না। পুরো বত্রিশটা দাঁত বের ক'রে কোন মানুষের পক্ষে এমন ভয়ঙ্কর ভঙ্গিমার যে হাসা সম্ভব সত্যি আমার জানা ছিল না।

ভুল! মারাত্মক একটা ভুল করে বসেছি আমি। বত্রিশটা নয়। তার দাঁতের ওপরের পাটির একটা দাঁত অনুপস্থিত। হঠাৎ সে-ফাঁকা জায়গাটা আমার চোখে পড়ল।

নিরবচ্ছিন্ন আতঙ্কে আমার শরীর এলিয়ে পড়তে চাইল। দাঁড়িয়ে থাকার মত সামান্যতম শক্তিও আমার কম্পমান পা দুটোর মধ্যে রইল না। কপালে হাত দিয়ে মেঝেতে ব'সে পড়লাম। আচমকা একটা গম্ভীর শব্দ হ'ল। ভারী কোন জিনিস হঠাৎ পড়লে যা হয়। আমি কপালে হাত দিয়ে আরও কিছুক্ষণ স্থবিরের মত বসেই রইলাম। আবার ধীরে ধীরে মুখ তুলে জানালার দিকে তাকালাম। এ কী রে বাবা! লাল-দাড়িগুলো জানালায় ঠায় রয়েছে! মুখের সে ভয়ঙ্কর অবস্থাও আগের মতই জানালার শিখ ঘেঁষে অবস্থান করছে। সামান্যতম পরিবর্তন হয়েছে বলেও মনে হ'ল না।

আমি ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে পড়েছি, অস্বীকার করার উপায়

নেই। কিন্তু এ-ও সত্য, ভয়ঙ্কর সে-দৃশ্যটা আমার সংজ্ঞা লোপ ক'রে দিতে পারে নি। স্টোভের আগুন আগের মতই জ্বলছে।

আমার ঘরের দেয়ালের বিপরীত দিকে আর একটা ঘর রয়েছে। এক যুবতী থাকে। অবিবাহিতা। সে-ঘর থেকে দেয়াল-ঘড়ির টিক্‌টিক্‌ আওয়াজ ভেসে আসছে স্পষ্ট শুনতে পেলাম। অতএব আমার জ্ঞান যে টনটনে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

আমি আবার সাহসে ভর করে অনুসন্দিৎসু দৃষ্টিতে জানালার সে-কুৎসিৎ মুখটার দিকে তাকালাম। এবার আর একটা নতুন জিনিস আমার চোখে ধরা দিল। রহস্যময় লোকটার গায়ের রঙ আলকাতরার মত কালো। কোন কিছুর ওপর ব্রাস দিয়ে আলকাতরার প্রলেপ মাখিয়ে দিলে ঠিক যেমনটা হয় সেই রকম।

আমি অপলক চোখে অবাঞ্ছিত লোকটার দিকে তাকিয়েই রইলাম। এবার সে জানালার কাঁচের ওপর তার মাথাটা ঠেকিয়ে দিল। আর খুবই ধীরে মাথাটাকে নিচের দিকে নামাতে লাগল। কেবল মাথাটা নয়, সমস্ত শরীরটাই নীচের দিকে নামাতে লাগল। মিনিট খানেকের মধ্যেই মুখটা জানালা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। ব্যস, তারপরই সব ভোঁ-ভোঁ। আর কিছুই আমার চোখে পড়ল না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আমি প্রকৃতিস্থ হলাম। দেহ-মনের স্বাভাবিকতা ফিরে পেলাম। হাত-বাড়িয়ে মেঝে থেকে সমাধিকক্ষ থেকে পাওয়া দাঁত টাকে কুড়িয়ে নিলাম। হাতের তালুর ওপর রেখে সেটাকে নাড়তে নাড়তে ভাবলাম, আপদ বিদেয় ক'রে দিয়ে আসি। এটাকে যেখান থেকে এনে ছিলাম, রেখে আসি গে। কিন্তু মন ভরল না। আসলে সেখানে যাওয়ার সাহস কুলিয়ে উঠল না। নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলছি, স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। কয়েক পা এগিয়ে চেয়ারের ওপর শরীর এলিয়ে দিয়ে দুর্বল পা দুটোকে রেহাই দিলাম। কতক্ষণ চোখ বন্ধ ক'রে তন্দ্রাচ্ছিন্ন অবস্থায় কাটিয়েছি নিশ্চিত ক'রে বলতে পারব না। আচমকা একটা খট্‌খট্‌ শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল। কার যেন পায়ের শব্দ। ভাবলাম, এ আবার কী নতুন উপদ্রব শুরু হল রে বাবা! উৎকর্ণ হয়ে অবাঞ্ছিত শব্দটাকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। হ্যাঁ, অনুমান অভ্রান্ত। শব্দটা ধীর-মন্থর গতিতে আমার ঘরের দিকেই এগিয়ে আসছে বটে। একটু পরেই আবার দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে পরিচারিকা আমার ঘরের সামনে দিয়ে

চলে গেল। ইচ্ছা হ'ল কাছে ডাকি। কিন্তু কেন জানি সাহসে কুলিয়ে উঠল না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আবার অখণ্ড নীরবতা নেমে এল। আমি আবার চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিলাম আশ্চর্য হতেই হল! কেউ আমাকে উদ্ধার করার জন্য উৎসাহী হয়ে এগিয়ে এল না।

আমি আবার উঠে দাঁড়ালাম। আকস্মিক ভয়-ভীতিটুকু মন থেকে অনেকাংশে মিলিয়ে গেল। সাহস সঞ্চয় করলাম। ঘর ছেড়ে বাইরে, খোলা-আকাশের তলায় এসে দাঁড়ালাম। ঘরের বাইরে একা থাকতে আর ভয় করছে না। ভাবলাম, গুটিগুটি সমাধিগৃহে যাব। তারপর পরিস্থিতি বুঝে হিতাকাঙ্খীদের কাছে পরে না হয় আজকের সন্ধ্যার ভয়ঙ্কর এ-দৃশ্যটার কথা ব্যক্ত করা যাবে।

আমি একাই পাহাড়ের ওপর ওঠলাম। পকেটে সে-দাঁতটা রয়েছে। গীর্জার সদর-দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বুকের মধ্যে অদ্ভুত কাঁপুনি চলছে! মনটা হঠাৎ কেমন দুর্বল হয়ে পড়ল। আমার মন থেকে সাহস যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। চারিদিকে অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করছে। নদীর সে চিরাচরিত কলধ্বনি নীরবতা ভঙ্গ করে সর্বাঙ্গে কেমন একটা আতঙ্কের সঞ্চার করছে। দরজা দিয়ে মাথাটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েও পরমুহূর্তে আবার মাথা বের ক'রে আনলাম। ভেতরে ঢোকা ঠিক হবে কিনা ভেবে থমকে গেলাম।

মনস্থির ক'রে ফেল্‌লাম, যা হয় হবে, যাবই। সদর দরজা থেকে সমাধিক্ষেত্রের দূরত্ব খুবই কম। মাথায় নাবিকের টুপি চাপিয়ে সে-লোকটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম, সমাধিক্ষেত্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। সেই একই ভয়ঙ্কর চেহারা। বিকৃত মুখ। লাল চুল-দাঁড়ি। চকের মত ফ্যাকাসে মুখ। আমাকে দেখেই হাতে ইশারা ক'রে কাছে ডাকল। আমার সাহসে কুললো না তার কাছাকাছি যেতে। পিছন ফিরে দৌড় মারব কিনা ভাবছি। ঠিক তখনই এমন একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটে গেল যা আমার দুর্বল মনটাকে একটু চাঙা ক'রে তুল্‌ল। একজন ছেলেকে কথাবার্তা বলতে বলতে আমার দিকে আসতে শুনলাম।

সমাধিক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে থাকা ভয়াল দর্শন সে-লোকটা এবার গুটিগুটি চলতে শুরু করল। হেঁটে সমাধিক্ষেত্র ছেড়ে চ'লে যাওয়ার জন্য অবশ্যই নয়। সমাধিক্ষেত্রের চৌহদ্দির মধ্যেই হাঁটাহাঁটি করতে শুরু করল। তার নজর কিন্তু আমার দিকেই রইল। আমি সাহসে ভর ক'রে ভেতরের

দিকে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলাম। আমার পা দুটো যেন মাটির সঙ্গে আটকে গেল। আর এক পা-ও এগোতে পারলাম না। কারণ, অবাঞ্ছিত লোকটাকে হাঁটতে হাঁটতে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। আমি অচঞ্চল। পাথরের মূর্তির মত স্থির আমার চোখের মণি দুটো। হাঁটু দুটো ঠক ঠক ক'রে কাঁপছে। কোন অদৃশ্য হাত যেন বুকের মধ্যে অনবরত হাতুড়ি পিটে চলেছে। আমার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ল। যে-কোন সময় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাওয়া কিছুমাত্রও বিচিত্র নয়। নিজের বে-সামাল অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি পকেটে হাতটা গলিয়ে দিলাম। অলক্ষুণে দাঁতটা বের ক'রে এনে সমাধিক্ষেত্রের দিকে সেটাকে ছুঁড়ে দিলাম। আপদ বিদায় হ'ল। কিন্তু দাঁতটা ছুঁড়ে দেবার সময় শরীরে যে-ঝাঁকুনি লাগত তা সামলে উঠতে পারলাম না। হুমড়ি খেয়ে লোহার গেটের ওপরে পড়ে গেলাম। বেশ জোরেই আঘাত লাগল। কাৎরাতে কাৎরাতে উঠে দাঁড়ালাম। তারপর তীব্র যন্ত্রনা নিয়েও আমি পড়ি কি মরি অবস্থায় পাহাড়ের ঢালু পথ বেয়ে বাড়ির দিকে ছুটতে লাগলাম। কনকনে শীতের মধ্যেও আমি ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে গেলাম। হাঁপাতে হাঁপাতে রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম, আমার বুক দ্রুত ওঠানামা করতে লাগল। মুখ রক্ত শূন্যতা মুখের মত ফ্যাকাশে, চোখের তারায় তখনও আতঙ্কের ছাপ।

দীর্ঘ কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে নদী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। চারিদিকে কতই না পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু বীভৎস সে-মুখটার কথা আমার মন থেকে মুহূর্তের জন্যও মুছে ফেলতে পারি নি। গীর্জার সদর-দরজার কাছে দাঁড়ালে আমি যেন আজও প্রায়ই দেখতে পাই লাল দাড়ি, ফ্যাকাশে কুৎসিত মুখ ঝক-ঝকে দাঁতের পাটি আর রোষদীপ্ত একজোড়া ইয়া বড় বড় চোখ আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে। রহস্যময় সে লোকটার বয়স কত অনুমান করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। কুড়ি বল্‌লেও চলে, আবার চল্লিশ বল্‌লেও দৃঢ়তার সঙ্গে আপত্তি করতে পারব না। সেটাই আমার তার সঙ্গে শেষ দেখা নয়! আরও আছে। ভয়ঙ্কর সে মুখটা নিয়ে লোকটা বহু বারই আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। তবে বাঁধাধরা কোন সময়ে অবশ্যই নয়। কখনও সন্ধ্যায় কখনও প্রথম রাত্রে আবার কখনও বা মাঝ-রাত্রে দাঁতের পাটি বের ক'রে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাসে রহস্যময় ভয়ঙ্কর সে-লোকটা।

একটা জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তার খোয়া যাওয়া দাতের ফাঁকা জায়গাটার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেই আচমকা মিলিয়ে যেত। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে কর্পূরের মত যেন উবে যেত সে।

অস্বাভাবিক বরফ পড়তে লাগল। হাঁটু সমান উঁচু হয়ে বরফ জমে থাকায় সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে দাঁতটাকে মাটির নীচে পুঁতে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হ'ল না। ফলে পুরো শীতকালে লোকটা মাঝে মধ্যেই আমার কাছে হাজির হ'তে লাগল। গোড়ার দিকে আমি ভয়ে কুঁকড়ে যেতাম ঠিকই। কিন্তু পরে অবশ্য গা সহা হয়ে গেল। ভয়ঙ্কর সে-মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না। তবে নির্দ্বিধায় স্বীকার করছি, রহস্যময় সে লোকটা আমার জীবনকে একেবারে বিষিয়ে তুল্‌ল। মাঝে মাঝে আমার এমন অবস্থা হত যে, গ্লিম্‌মা নদীর জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে জীবনটাকে শেষ ক'রে সব আতঙ্ক আর জ্বালা যন্ত্রণার হাত থেকে চিরদিনের মত শয়তানটার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যাই।

শীতের পর এল বসন্ত। শীতের সঙ্গে তো রহস্যময় সে-লোকটাও কোথায় যেন চ'লে গেল। গেল বটে কিন্তু চিরতরে অবশ্যই নয়। গ্রীষ্মের শেষটা পর্যন্ত অনুগ্রহ ক'রে আমার সামনে দাঁড়িয়ে পুরনো সে-বিশ্রী স্বরে হাসতে লাগল। আমাকে অবাক ক'রে দিয়ে লোকটা আবার কোথায় উধাও হয়ে গেল। সারাটা শীতকালে মাত্র একটাবারের জন্য আমাকে দেখা দিয়ে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক ক'রে দিয়ে গেল। তারপর দীর্ঘদিন আর আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় নি।

মূর্তিমান শয়তানটার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের তিন বছর পর আমি এক বছরের জন্য নরল্যাণ্ডের বাইরে যাই। বেশ বড় হয়ে দেশে ফিরে এলাম। অকারণে আতঙ্কে শিউরে ওঠার মত ছেলেমানুষ এখন আর আমি নই। আমি কাকার সঙ্গে এখন আর থাকি না, মা-বাবার সঙ্গে নিজেদের বাড়িতেই বসবাস করছি।

নিজেদের বাড়িতে আমার যৌবনের বে-পরোয়া দিনগুলো কাটতে লাগল। এক দুপুরে সবে ঘুমিয়েছি। ঘুম ঠিক নয় তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা বলা যেতে পারে। আচমকা তন্দ্রা কেটে গেল। কে যেন বরফ ঠাণ্ডা হাত আমার কপালের ওপর রেখেছে বলে মনে হ'ল। কয়েক মুহূর্ত আকস্মিক আতঙ্কে কাঠের মত শক্ত হয়ে দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে রইলাম। কিন্তু

আশ্চর্য ব্যাপার! ঠাণ্ডা হাতটা আমার কপালের ওপর তেমনি চেপেই রইল। ভয়ে ভয়ে চোখ মেলে তাকাতেই দেখি, মূর্তিমান সে-শয়তানটা আমার শিয়রে দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে। আমার পাশে আমার ছোট দুটো ভাই ঘুমোচ্ছে। রোজই তারা আমার সঙ্গে শোয়। আমি তাদের ডাকাডাকি করে জাগালাম না। ভয়ে ভয়ে আবার চোখ দুটো বন্ধ করে মাড়ার মত পড়ে রইলাম। আবার সে-ঠাণ্ডা হাতটা আমার কপালের ওপর চেপে বসল। আমি এক ঝটকায় অবাঞ্ছিত সে হাতটা সরিয়ে দিয়ে উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠলাম—'পালা এখান থেকে। আমার সামনে থেকে পালা বলছি!'

আমার চীৎকারে ভাইদের ঘুম ভেঙে গেল। হুড়মুড় করে উঠে বসল। আমাকে ধাক্কা দিয়ে বলল—'দাদা, তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ! বকাবকি করছ কাকে?'

আমি চোখ মেলে তাকালাম। ভাইদের কথার কোন উত্তরই দিলাম না। রহস্যময় সে-লোকটা ততক্ষণে চেয়ারে বসে পা নাচাতে শুরু করেছে। মুখটা তেমনি বিকৃত। দাঁতের পাটি বের করে হাসছে বটে। কিন্তু নিঃশব্দে। ভাইদের চোখ-মুখ দেখে বুঝতে পেরেছি, তারা তাকে দেখতে পাচ্ছে না। আমি তার দিকে আবার চোখ ফেরাতেই দেখি, সে অবিশ্বাস্য একটা কান্ড জুড়ে দিয়েছে। চেয়ারটা ছেড়ে অদ্ভুতভাবে শূন্যে উঠে যেতে লাগল। ছাদে গিয়ে মাথা ঠেকতে তবে থামল। আমি বিস্ময়মাখা চোখে তার কাণ্ড কারখানা দেখতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ ছাদের সঙ্গে ঝুলে থাকার পর লোকটা বুঝতে পারল, আর ওঠা সম্ভব নয়। এবার ঝপাং করে জ্বলন্ত চুল্লিটার ওপর পড়ে গেল। ব্যস, মুহূর্তে সব ভোঁ ভাঁ। চোখের পলকে সে রহস্যজনক ভাবে বাতাসে মিলিয়ে গেল।

আমি সেদিন খুব কাছে থেকে তাকে দেখি। উদাস ব্যাকুলতার চাহনি। চোখের মণি দুটো অচঞ্চল। সব মিলিয়ে আমার মনে হয়েছিল লোকটা এ-জগতের কেউ না। অন্য কোথাও, অন্য কোন অলৌকিক লোকের বাসিন্দা। সেখান থেকে আমার বিচার করতে ছুটে এসেছে। একটা ব্যাপার আমার নজর এড়াল না। আমার কপালের ওপর থেকে ঠাণ্ডা হাতটা সরিয়ে দিয়ে গর্জে উঠতেই সে নির্বিবাদে সরে দাঁড়িয়েছিল। কোনরকম জোর জুলুমের চেষ্টা করেনি মোটেই। সে যতক্ষণ আমার

শিয়রে বা মাথার কাছের চেয়ারটায় বসেছিল মুহূর্তের জন্যও তাকে চোখের পাতা ফেলতে দেখি নি। ব্যাপারটা আমার বিস্ময়ের উদ্রেক করল খুবই। আসলে চোখের পাতা ফেলতে ভুলে গিয়েছিল কিনা তাই বা কে জানে।

শীতের প্রারম্ভে আমি মিঃ ডাল্লে নামে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে কিছুদিন ছিলাম। তাঁর দোকানে কাজ করতাম। মাঝে মধ্যে তার অফিসে গিয়েও বসতে হ'ত। তাঁর বাড়িতে সে-অবাঞ্ছিত লোকটাকে আমি শেষ বারের মত দেখেছিলাম।

এক রাত্রে দোকানের কাজকর্ম মিটিয়ে বাড়ি ফিরলাম। জামাপ্যাণ্ট বদলে মোজা খুলতে গিয়ে উপুড় হতেই দেখি মূর্তিমান সে শয়তানটা বারান্দায় দাঁড়িয়ে। সেই লাল দাড়ি, সেই ভয়ঙ্কর মুখ, সেই জ্বলজ্বলে চোখ আর ধবধবে সাদা দাঁতের পাটি। নিঃশব্দে হেসে চলেছে আমার দিকে অপলক চোখে রোষপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

আমার পাশের ঘরে কয়েকজন লোক থাকে। অতএব ভয় পাবার মত পরিস্থিতি মোটেই নয়। আমি চোখ কটমট ক'রে তার দিকে তাকিয়ে বেশ রাগত স্বরেই বল্‌লাম—'তোমার ব্যাপার কি, বল ত? আবার আমার সামনে এসেছ।'

লোকটা কিছু বল্‌ল না। কেবল বিরাট হাঁ ক'রে আমার দিকে তাকাল। আবার সেই পূর্বপরিচিত ভঙ্গিমায় নিঃশব্দে দাঁতের পাটি বের ক'রে হাসতে লাগল। নতুনত্ব যেটুকু দেখলাম তা হ'ল তার দৃষ্টিতে এখন সে-জ্বলন্ত রোষ অনুপস্থিতই। সে বিরাট হাঁ ক'রে হাসতে শুরু করলে আমি কৌতূহল বসত দাঁতের পাটির সে-ফাঁকা জায়গাটা খোঁজার চেষ্টা করলাম। সচকিত হতে হ'ল। আশ্চর্য ব্যাপার ত। ফাঁকা সে-জায়গাটা এখন পূর্ণ। লোকটা তবে হয়ত তার দাঁতটা ফিরে পেয়েছে।

দাঁতের ব্যাপারটা নিয়ে আমি আবার ভাবতে বসলাম। সেদিন সমাধিক্ষেত্রে আমি সে দাঁতটা ফেলে এসেছিলাম সেটাকে কেউ না কেউ আবার মাটি চাপা দিয়ে দিয়েছে হয়ত বা। নইলে দীর্ঘদিন অযত্নে প'ড়ে থাকায় কোনক্রমে মাটি চাপা পড়ে গেছে। আসল ব্যাপারটা একমাত্র পরমেশ্বরই বলতে পারেন।

রহস্যময় লোকটা কিছুক্ষণ হাঁ ক রে থাকার পর আপনা থেকেই মুখ বন্ধ করল। এবার তেমনি নিঃশব্দে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। ব্যস

চিরতরে সে আমার কাছ থেকে বিদায় নিল।

ভয়াল দর্শন সে-রহস্যময় লোকটা চিরতরে বিদায় নিল ঠিকই। কিন্তু সে আমার যে অপূরণীয় ক্ষতি করেছিল তা আর আমি শোধ করতে পারি নি। জীবনের পরবর্তী ধাপে বহু দেশের, বহু রকম লোকের সংস্পর্শে এসেছি বটে। কিন্তু সে-লোকটা আমার মনে যে-আতঙ্কের ছাপ গেঁথে দিয়ে গিয়েছিল সারাজীবনে তা মুছে ফেলতে পারি নি।

তবে হ্যাঁ, সে আমার যে কেবলমাত্র সর্বনাশই করেছিল একথা বল্‌লে তার প্রতি অবিচারই করা হবে। সে আমার মনে দাঁতের মূল্যবোধের সঞ্চারও করেছিল। খোয়া যাওয়া দাঁতটাকে ফিরে পাবার জন্য তার নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের মাধ্যমে সে আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে শিখিয়ে দিয়ে গেছে দাঁত এক অমূল্য রত্ন।

———

আবছা অন্ধকারে এক শিকারী প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপের আড়ালে বসে। অতন্দ্র প্রহরী। তার হাতের বন্দুকের নলটা তার চোখের সঙ্গে তাল রেখে এদিক-ওদিক ঘুরছে। এমন সময় একটা জানোয়ার অদূরবর্তী ঝোপের আড়াল থেকে গুটিগুটি করে বেরিয়ে এল। চাঁদের মৃদু আলো জন্তুটাকে দেখতে অসুবিধা হ'ল না। তার সর্বাঙ্গে ছাই রঙের কাঁটাকাঁটা লোম। লোমরাশি চামড়ার ওপর সোজা ভাবে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। সজারুর গায়ের কাঁটা ঠিক যেমনটি দেখতে হয়। চোখ-মুখের আকার পরিবর্তিত হতে হতে চোয়াল দুটো শক্ত ও কুদর্শন হয়ে উঠেছে। মুখটা বড়। গ্রীবা বিস্তার করলে এক জোড়া মুলোর মত দাঁত স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ফুটে ওঠে। সর্বাঙ্গে অবাঞ্ছিত কম্পনের সৃষ্টি করে।

কুদর্শন জানোয়ারটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে সংকীর্ণ ফাঁকা জায়গাটায় দাঁড়াল। বিরাট গ্রীবা বিস্তার করে বিশ্রী আওয়া ক'রে হাই তুল্‌ল। তার চোখ দুটো আবছা অন্ধকারে ঝলমলিয়ে উঠল।

শিকারী একটু নড়েচড়ে বসার চেষ্টা করল। বন্দুক দুটোকে শক্ত করে বাগিয়ে ধরল। অমালটাস-এর শুকনো পাতায় মৃদু মচমচ আওয়াজ হ'ল! শিকারী আরও সতর্কতা অবলম্বন করল। শিকারীর পক্ষে শুকনো পাতার শব্দের সৃষ্টি করা সবচেয়ে বড় অযোগ্যতা ব'লে বিবেচিত হয়। আসলে অদ্ভুত দর্শন জানোয়ারটা তাদের মনে কৌতূহলের সঞ্চার করল। শিকারের উদ্দেশ্য বহুবনে বহুরাত্রি কাটিয়েছে। কিন্তু এমন অদ্ভুত জানোয়ার ত এর আগে কোনদিন চোখে পড়ে নি। প্রথম দর্শনে মনে হয়েছিল বুঝি বা ভল্লুক। পিছনের পা দুটোর ওপর ভর দিয়ে দিব্যি হাঁটাহাঁটি ক'রে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তার দৈহিক আকৃতি ও প্রকৃতি তাকে ভল্লুক ব'লে মেনে নিতে উৎসাহ পাচ্ছে না তারা।

শিকারী বন্দুকের ঘোড়ায় আঙুল রাখল। অতর্কিতে বিরাট লাফ দিয়ে জানোয়ারটা চার-পাঁচ দূরের একটা গাছের গুঁড়ির ছায়ার আড়ালে চলে গেল।

তারপর? তারপর কয়েক মুহূর্ত আর কিছুই দেখা গেল না। পাথরের মূর্তির মত গাছের গুঁড়িটার আড়ালে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

শিকারীটি গাছের গুঁড়িটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। বন্দুকের নল তেমনি বাগিয়ে ধরা। বার বার এদিক-ওদিক কাৎ হয়ে অদ্ভুত দর্শন সে-জানোয়ারটাকে দেখার ব্যর্থ প্রয়াস চালাতে লাগল। আর একজন শিকারী তাঁবুতে রয়ে গেছে। বিশ্রাম নিচ্ছে।

শিকারীটি বন্দুকের ঘোড়ায় আঙুল রেখে আতঙ্ক মিশ্রিত কৌতূহলী দৃষ্টিতে গাছের গুঁড়িটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে ঠিক সে-মুহূর্তেই রহস্যের আধার জানোয়ারটা আচমকা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার বিকট দর্শন মুখটা রয়ে গেল গুঁড়িটার ছায়ার আড়ালে।

শিকারীটি রুদ্ধশ্বাসে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল তার দিকে। কিন্তু জানোয়ারটা সে-সুযোগ তাকে দিল না। কাঠের পুতুলের মত সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল একই ভঙ্গিমায়। অস্পষ্ট দেখা গেলেও তাকে কেমন অস্থিরচিত্ত বলেই মনে হ'ল। সামনের একটা পা বার বার পিঠের দিকে নিতে দেখা গেল। গাছের গুঁড়িটার সমসৃন ছালে পিঠের কিছুটা অংশ ছড়ে গেছে,

তারই যন্ত্রণায় সে এখন ছটফট করছে। আর থেকে থেকে চমকে উঠছে। উৎকর্ণ হয়ে শিকারী পায়ের চাপে সৃষ্ট মচমচ শব্দকে অনুধারন করার চেষ্টা করছে। যে-ই হোক, যেকোন জানোয়ারই হোক বা যত হিংস্রই হোক না কেন প্রাণের মায়া ত অবশ্যই রয়েছে। শিকারীটি খুবই সন্তর্পনে ঝোপের মধ্যে অবস্থান করেই উঠে দাঁড়াল। ঝোপের ছায়ার সঙ্গে তার ছায়া মিলেমিশে তাকে কেমন বেটে ও অদ্ভুত দেখাতে লাগল। ছোট্ট ছায়া যেন নিশ্চল নিথর ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে কি জানে তার জন্য অপেক্ষা করছে ভয়ঙ্কর একটা মুহূর্ত? অচিরেই এক চরমতম পরিস্থিতির মুখোমুখি হ'তে হবে তাকে?

এদিকে গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে ভয়াল দর্শন সে-জানোয়ারটা সুযোগের অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে রইল।

শিকারীটি সাহসে ভর ক'রে গুটিগুটি ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে একটা গাছের তলায় এসে দাঁড়াল। মুহূর্তের জন্য ঘাড় ঘুরিয়ে সে ফেলে আসা ঝোপটার দিকে তাকাল। ব্যস, মুহূর্তে ঘটে গেল অঘটন। একেবারেই অপ্রত্যাশিত ভাবে জানোয়ারটা বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে এসে পিছন দিক থেকে শিকারীর গলা টিপে ধরল। শিকারী আতঙ্কিত হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করল। বৃথা চেষ্টা। ইতিমধ্যেই জানোয়ারটার লম্বা ও সুতীক্ষ্ন নখগুলো অদৃষ্টবিড়ম্বিত শিকারীর গলায় গেঁথে যেতে লাগল। শিকারী প্রাণে বাঁচার জন্য ছটফট করতে লাগল। অস্ফুট আর্তনাদ করতে লাগল। কিন্তু তার যাবতীয় চেষ্টা ও যন্ত্রণার অবসান ঘটে গেল একসময়। তার নিষ্প্রাণ দেহটা রক্ত মাখামাখি হয়ে এলিয়ে পড়ল। জানোয়ারটা রক্তাপ্লুত থাবা দুটোকে হেঁচকা টানে মৃত শিকারীর গলা থেকে তুলে নিয়ে এল। এবার মৃতের শরীরের দু'পাশে দুটো পা রেখে তার বুকের ওপর বসে পড়ল। মুখটাকে ধীরে ধীরে নামিয়ে আনল ক্ষতস্থানটার দিকে। কাছে—আরও কাছে নামিয়ে আনল তার মুখটাকে। ব্যাপারটা খুবই রহস্যজনক ঠেকল ঝোপের আড়ালে ব'সে থাকা শিকারীটার কাছে। এরকম আকৃতির কোন মাংসাশী জানোয়ার আছে ব'লে ত তার জানা ছিল না। সে রুদ্ধশ্বাসে ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করতে লাগল। মিনিট দুই পরে জানোয়ারটা ক্ষতস্থানটা থেকে মুখ তুল্‌ল। তার মুখটা একেবারে রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে। রীতিমত এক বীভৎস দৃশ্য। চোখে দেখা যায় না। জানোয়ারটা শিকারীর মৃত-

দেহের বুকের ওপর আবার সোজা হয়ে বসল। বার কয়েক অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে চারদিক ভাল করে দেখে নিল। এবার উঠে দাঁড়াল। মৃত দেহটা থেকে জামা, প্যাণ্ট, কোট ও টুপি প্রভৃতি খুলে নিল। জানোয়ার-টার গায়ে এতক্ষণ কিছু ছিল না। শীতে কাঁপছিল ঠকঠক করে। খুবই কষ্ট পাচ্ছিল। এবার আরও অবিশ্বাস্য একটা কাণ্ড ক'রে বসল। মৃত শিকারীর পোষাক গায়ে চাপিয়ে ফুল-বাবু হয়ে গেল। এ কী তাজ্জব ব্যাপার রে বাবা! তবে কি এটা জানোয়ার নয়! মানুষ? কিন্তু আকৃতি দেখে মানুষ ব'লে ভাবতেও উৎসাহ পাওয়া যায় না। তবে কি বন-মানুষ। নাকি প্রাগৈতিহাসিক যুগের বানরাকৃতি কোন মানুষ? কিন্তু এমন পৈশাচিক আচরণ কোন মানুষের পক্ষে কি করে সম্ভব?

যাইহোক পোষাকগুলো গায়ে চাপানোর পর তাকে খুবই প্রফুল্লই দেখা যাচ্ছে। বার বার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখে নিতে লাগল কেমন মানিয়েছে। মায় কোটটা পর্যন্ত একেবারে মাপমত হয়েছে এবার টুপি টাকে মাথায় গলিয়ে নিল। সেটাকে সামান্য পিছনদিকে ঠেলে দিয়ে একেবারে শিকারীটার ভঙ্গিমায় রাখল টুপিটাকে।

জানোয়ারটা এবার মনের আনন্দে বার কয়েক এদিক-ওদিক হাঁটা-হাঁটি ক'রে দেখল, পোষাকগুলো পরার পর চলাফেরা, দৌড়ঝাঁপ দিতে অসুবিধা হয় কিনা। না, সবদিক থেকে পোষাকগুলো তার উপযোগীই হয়েছে। হাঁটাহাঁটি করতে গিয়ে তার আরও উপকার হ'ল। অদূরে একটা বিশেষ ধরনের পাথরের টুকরো প'ড়ে থাকতে দেখল। উৎসাহী মন নিয়ে সেটাকে তুলে নিল। চমৎকার পাথরটা। একটু বেশ লম্বাটে ধরণের। আবার একটা প্রান্ত ঘষে মসৃণ করা। এবার সে লম্বা লম্বা পায়ে মৃত দেহটার কাছে এগিয়ে এল। ছোরার মত মসৃণ পাথরের টুকরোটা দিয়ে উন্মাদের মত মৃত দেহটার গায়ে আঘাত হানতে লাগল। রীতিমত এক বীভৎস দৃশ্য। মৃতের নাড়িভুড়ি, মাংস ও চামড়া প্রভৃতি ছিন্ন বিছিন্ন করতে লাগল। আর তারই ছোট-বড় টুকরো এদিক ওদিক ছিঁটকে ছিঁটকে পড়ল! এবার রক্ত মাংস মাখা পাথরের টুকরোটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। হাঁপাতে লাগল। হিংস্র চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল।

জানোয়ার ত নয়। একটা মানুষ। মৃত শিকারীর দেহটাকে লোকটা ছিন্নভিন্ন করল কেন? এর একটাই কারণ কেউ যাতে মৃতদেহটাকে সনাক্ত

করতে না পারে ! এর চেয়ে বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কেউ দেখেই যেন বুঝতে পারে কোন হিংস্র জন্তুর কবলে পড়ে শিকারীর এ-হাল হয়েছে। অন্যরকম কিছু ভাববার অবকাশ না থাকে। রহস্যময় লোকটা দু'পা এগিয়ে গিয়ে আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘাড়-ঘুরিয়ে ভাল ক'রে আর একবার দেখল। হ্যাঁ, সে এরকমটাই চেয়েছিল। হিংস্র জানোয়ারের সুতীক্ষ্ম দাঁত আর নখের সাহায্যে শিকারীর দেহটা ঠিক এ রকমই ছিন্নভিন্ন ও বীভৎস হয়ে যায় বটে। নিশ্চিন্ত হ'ল। তার মুখে হাসির ছোপ ফুটে উঠল। আশ্বস্থ হ'ল। ঘুরে দাঁড়াল। কয়েক পা এগিয়ে গেল। সদ্য সংগৃহীত পোষাকগুলোর ওপর আর একটিবার চোখ বুলিয়ে নিল। সত্যি চমৎকার মানিয়েছে তাকে। এবার লম্বা লম্বা পায়ে গভীর অরণ্যের দিকে চলে গেল। লতাপাতা ঝোপঝাড়ের আড়ালে মিলিয়ে গেল এক সময়।

শিকারীর পোষাকে সজ্জিত রহস্যময় লোকটাকে দেখলে যুবক বলেই মনে হয়। বেটে খাটো। ধাড়ী নেকড়ের মত কোমরটা সরু। মেরুদণ্ড সামনের দিকে সামান্য বাঁকানো। হাঁটার সময় শরীরটা সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে।

লোকটা লম্বালম্বা পায়ে ঝোপের ফাঁক দিয়ে, মোটা মোটা গাছের গুড়ির আড়াল দিয়ে এগিয়ে চলল।

এদিকে বনটা বেশ গভীর। ইয়া মোটা মোটা গাছগুলো পাশাপাশি গা-ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে দাঁড়িয়ে। ডালপালার ফাঁক দিয়ে চাঁদের টুকরো টুকরো আলো এখানে-ওখানে ছড়িয়ে পড়েছে। লোকটা হাঁটতে হাঁটতে ছোট্ট শিশুর মত কাণ্ড করতে লাগল। কখনও বার কয়েক ধেই ধেই ক'রে নেচে নিচ্ছে, আচমকা হাত দুটো বাড়িয়ে জ্যোৎস্নার আলোর টুকরো-গুলোকে ধরার চেষ্টা করছে, আবার কখনও বা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে নিজের ছায়াকে লক্ষ্য ক'রে থাপ্পড় দেখাচ্ছে। এমন সময় পাশ থেকে কার কণ্ঠস্বর শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে একজন শিকারী মাত্র হাত দুই ব্যবধানে দাঁড়িয়ে। বন্দুকের নলটা তার গায়ের কাছে। গায়ে না ঠেকলেও মাত্র দু'তিন ইঞ্চি দূরে।

লোকটা সচকিত হয়ে শিকারীর দিকে ঘাড় ঘুরাতেই আবার সে কর্কশ স্বরে গর্জে উঠল—'কে ? কে তুমি ?

লোকটা ভাবতেও পারে নি এরকম কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে

হবে। সে ঘাবড়ে গিয়ে সবিস্ময়ে শিকারীর দিকে তাকিয়ে রইল।

শিকারী এবার বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে গলা ছেড়ে 'আরে, এযে একজন যুবক দেখছি!'

লোকটা থতমত খেয়ে বল্‌ল—'আমি!—আমি মানে দুঃখিত!'

শিকারী এবার বন্দুকটা নামিয়ে নিল। এবার বল্‌ল—'এদিকটায় অরণ্য কী গভীর! একেবারে শিকারের অযোগ্য! লোকটা অস্ফুট উচ্চারণ করল 'হুম্‌!'

কি করি বল ত ভাই? আমার বন্ধু মাইকেল আচমকা একটা গর্জন শুনে ঝোপের আড়াল থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল। তারপর কোনদিকে যে গেল বুঝতে পারি নি। তাছাড়া সেটা যে কিসের গর্জন—'

লোকটা তাকে মুখের কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠল—'নেকড়ে। নেকড়ের গর্জন!'

'—আমিও তা-ই ভাবছি। নেকড়ের গর্জনের মতই মনে হয়েছিল।' এবার আড়চোখে লোকটার দিকে একবারটি তাকিয়ে নিয়ে বলল—'তুমিও বুঝি নেকড়েটার গর্জন শুনেছিলে?'

লোকটা ঘাড়কাৎ ক'রে তার প্রশ্নের জবাব দিল।

কথা বলতে বলতে তারা দু'পা এগিয়ে গেল। শিকারী এবার লোকটার মুখটা ভালভাবে দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু এবারও সম্ভব হ'ল না। গাছের পাতার ছায়া পড়ে মুখটা ঝাপসা দেখাচ্ছে।

শিকারী বলল—'তুমি কে? তোমার পরিচয় কি? এখানে, এই বাড়ীর অরণ্যে কি করছ? এতরাত্রে এরকম একটা বিপদসঙ্কুল অরণ্যে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছো, উদ্দেশ্য কি? কি নাম তোমার?

আচমকা এরকম প্রশ্নের জন্য তৈরী ছিল না লোকটা। হঠাৎ তাকে কেমন অপ্রতিভ হয়ে পড়তে দেখা গেল। বার কয়েক ঢোক গিলে সে জবাব দিল। 'বাপ্পালি, বাপ্পালি আমার নাম।'

'বাপ্পালি?'

লোকটা এবার নীরবে মাথা ঝাঁকিয়ে তার প্রশ্নের উত্তর দিল।

'—ভাল কথা। কিন্তু তোমাকে-ও এখানকার কেউ বলে মনে হচ্ছে হে। এ-অঞ্চলের সবাই আমার পরিচিত।

লোকটা ঘাবড়ে গিয়ে দু'পা সরে গেল।

শিকারী এবার কণ্ঠস্বরে অধিকতর বিস্ময় প্রকাশ করে বলল—'এ

কী কাণ্ড হে! তোমার কাঁধে বন্দুক দেখছি না যে! তোমার বন্দুক কোথায় রাখলে?'

বাপ্পালি এবার সত্যি খুব ঘাবড়ে গেল। এমন বিপদসঙ্কুল অরণ্যে তাও আবার গভীর রাত্রে খালি হাতে ঘুরে বেড়ালে ব্যাপারটা ত সন্দেহের উদ্রেক করারই কথা। অবিশ্বাস্য ত বটেই। মৃত শিকারীর দেহ থেকে পোষাক, এমন কি বুটজোড়া পর্যন্ত খুলে সে ব্যবহার করেছে। মায় তার ছোরাটাও নিয়ে এসেছে সঙ্গে। কিন্তু তার বন্দুকটা তাড়াহুড়োর মধ্যে নিয়ে আসা হয় নি।

শিকারী ফ্রেড আবার বলল—'কি হে, তোমার বন্দুক দেখছি না যে! বন্দুক কোথায়?'

'—বন্দুক? বন্দুক·····মানে বন্দুকটা আমি হারিয়ে ফেলেছি। তাই ত! বন্দুকটা ত খুঁজে আনা দরকার। যাই, দেখি কোথায়—'কথা বলতে বলতে লোকটা বনের অন্ধকার পথে হাঁটতে লাগল।

শিকারী তাকে অনুসরণ করল। লোকটার চেয়ে দ্রুত গতিতে হেঁটে তার পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। এদিকটায় কিছুটা জায়গায় বন একটু হালকা। গাছগুলি একটু ফাঁকা ফাঁকা। চাঁদের আলোয় লোকটাকে অধিকতর স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল।

শিকারী পথ চলতে চলতে বলল—'একটু আগে আমার সঙ্গে কথা বলার সময় তোমার কণ্ঠস্বর কেমন কাঁপা কাঁপা মনে হচ্ছিল। আর তুমি কেমন ঘাবড়ে গেছ দেখলাম। কি ব্যাপার বল ত ভাই! তুমি কি কোন ব্যাপারে খুব ভয় পেয়েছ? আচমকা ঘাবড়ে যাওয়া মানুষের মত কথা—কি হয়েছিল?'

লোকটা শিকারীর প্রশ্নটা শুনেও না শোনার ভান করে পথ চলতে লাগল।

শিকারী এবার বলল—একটা কথা সত্যি করে বল ত? এই বনে আশ্চর্যজনক কিছু তোমার চোখে পড়েছে? এমন কোন ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিলে কি যার জন্য ঘাবড়ে গিয়ে বন্দুকটা হারিয়ে ফেলেছে?' এখানে অন্য কিছু আছে নাকি?'

বাপ্পালী এবারও কোন উত্তর দিল না। অন্যমনস্কতার ভান করে পথ চলতে লাগল।

শিকারী এবার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত বাপ্পালি'র কাঁধের ওপর হাত রেখে

সহানুভূতির সঙ্গে বলল—'তুমি আমাকে তোমার বন্ধু মনে করতে পার। বল না, এ অরণ্যে অদ্ভুত কিছু আছে, যা দেখে তুমি ভয় পেয়েছ? আরে ভাই, এত লজ্জার কি আছে। বলই না, এমন কি দেখলে যার ফলে তোমার মনে এমন আতঙ্কের সঞ্চার হ'ল? আমি ত তোমার সঙ্গেই চলেছি। দুজনে গিয়ে তোমার হারিয়ে যাওয়া বন্দুকটা খুঁজে বের করব। তারপর গভীর জঙ্গলে গিয়ে আমরা ওই নেকড়েটাকে হত্যার চেষ্টা করব। এমন বিপদ সংকুল বনে একা চলাফেরা করা নির্বোধের কাজ। তুমি কি বল, তাই না? একটু আগেই আমার বন্ধু—'

লোকটা মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে বলল—'নেকড়ের পিছনে ধাওয়া করেছিল বুঝি?'

'—বল্‌লামই ত, নেকড়ের হুঙ্কার শুনে বন্দুক হাতে ছুটে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। চল, আগে তোমার বন্দুকটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। তোমার নামটা আমার নামের সঙ্গে প্রায় মিলে যাচ্ছে। আমার নাম বাপ্পারাও ফ্রেড। আর তোমার নাম বাপ্পালি। অতএব তোমাকে সাহায্য করা আমার উচিত বলেই মনে করি।

পথ চলতে চলতে বাপ্পালি তার পায়ের ছাপ দেখতে পেল। বুঝল, সঠিক পথেই চলেছে। মৃত শিকারীর বন্দুকটা না নেওয়ার জন্য খুবই বোকামি করেছিল। এবার মুহূর্তের জন্য চোরাচোখে ফ্রেড-এর দিকে তাকিয়ে নিল। ভাবল, আগের শিকারীটাকে যেমন সহজে কব্জা করে নিতে পেরেছিল একে কাবু করা এত সহজ হবে না লোকটা খুবই চালাক। সাবধানীও বটে।

আরও কিছুটা পথ যাওয়ার পর বাপ্পালি বুঝল, তারা জায়গামত পৌঁছে গেছে। সামনের ওই ঝোপটা পেরোলেই শিকারীর থ্যাংলানো বীভৎস দেহটা পড়ে রয়েছে।

'—তুমি কি এখানেই বন্দুকটা ফেলে গেছ? এখানে ফেলে গেলে ভাল ক'রে খুঁজলে নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে।'

বাপ্পালি মৃতদেহটার দিকে না গিয়ে ঝোপের অন্যপ্রান্তে গিয়ে নীচু হয়ে বন্দুকটা খোঁজার ভান করল। বলা ত যায় না, মৃতদেহটা দেখে ফ্রেড হয়ত তাকেই সন্দেহ ক'রে বসবে।

'—তুমি এখানেই বন্দুকটা ফেলে গিয়েছিলে কি? কবে ভেবে দেখ, ভুল হচ্ছে না-ত?'

বাম্পালি তার প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই পাশের ঝোপ থেকে অস্পষ্ট একটা শব্দ ভেসে এল। ঝোপঝাড় ভেঙে কোন প্রাণী পালিয়ে গেলে যেমন দ্রুত খসখস শব্দ হয় ঠিক তেমনি শব্দ শোনা গেল। মুহূর্তের মধ্যে বিশালায়তন একটা নেকড়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এক লাফে একেবারে ফ্রেড-এর সামনে এসে দাঁড়াল। তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। চোখের পলকে তীব্র গর্জন ক'রে হিংস্র নেকড়েটা বাম্পালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নেকড়ের দাঁতে চাঁদের আলো পড়ে চকচক করতে লাগল। বাম্পালি অদ্ভুত কৌশলে নেকড়েটার ঘাড়ের ওপর চেপে বসল। অমিত শক্তির আধার নেকড়েটা এক ঝটকায় বাম্পালিকে ঘাড় থেকে ফেলে একেবারে ধরাশায়ী ক'রে দিল। ফ্রেড নেকড়েটার দিকে বন্দুকের নিশানা করল। বন্দুকের ঘোড়ায় চাপ দেয়ার আগেই বাম্পালি কোমর থেকে ছোরাটা টেনে নিয়ে নেকড়েটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হয়ে গেল তুমুল জাপ্টাজাপ্টি। ফলে শিকারীর আর গুলি ছোঁড়া হয়ে উঠল না। নেকড়ে মারতে গিয়ে হয়ত বাম্পালির গায়েই আঘাত ক'রে বসাবে। বাম্পালি সুযোগ বুঝে হাতের দোলটা ক্রোধোন্মত্ত নেকড়েটার গায়ে সমূলে গেঁথে দিল। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। তীব্র গর্জনে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল নেকড়েটা। গর্জন করতে করতে বার কয়েক পা গুলোকে ছুঁড়ে দাপাদাপি ক'রে নেকড়েটা লুটিয়ে পড়ল।

ফ্রেড বীরযোদ্ধা বাম্পালিকে ধরে নিয়ে অদূরবর্তী একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসাল। রক্তমাখা ছোরাটা এখনও সে মুঠো ক'রে ধরে রেখেছে। বাম্পালি একটু প্রকৃতিস্থ হলে ফ্রেড বলল—'বন্ধু, একটা ব্যাপার আমার কাছে যেন কেমন মনে হ'ল। দেখলাম, নেকড়েটা তোমার গলা লক্ষ্য করে বারবার আক্রমণ করছিল। তোমার প্রতি তার যেন তীব্র আক্রোশ। সে যেন বুঝতে পেরেছিল, তোমার পরিচয় কি, তোমার পরিচয় তার ভালই জানা। তুমি কি একে দেখেই আতঙ্কিত হয়ে বন্দুক ফেলে পালিয়েছিলে বল ত?

বাম্পালি নির্বাক। সে আপন মনে বার বার হাতের রক্তমাখা ছোরাটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। ছোরাটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই সে বল্‌ল—'নেকড়ে শিকার করতেই বুঝি আপনারা এ-বনে এসেছেন?'

'—হ্যাঁ। তবে নেকড়েটা কিন্তু এখনও মানুষের রূপ ধারণ করেনি।

আচ্ছা মাঝ-রাত্রে কোন নেকড়ে মারা পড়লে মৃত্যুকালে সে মনুষ্যরূপ ধারণ করে? আর ভোরের আলো ফুটে ওঠা পর্যন্ত সে বেঁচে থাকে? যদিও নেকড়ে—মানুষের ওপর আমি আস্থাভাজন নই। আসলে নেকড়েটাই একটা নেকড়ে মানুষ। তবে আমি যেটুকু জানি চাঁদের আলোয় নেকড়েটা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। থালার মত অত্যুজ্জ্বল চাঁদটা দেখে তারা অনবরত গর্জন করতে থাকে। আমি মনে করি, নেকড়ে-মানুষের প্রতি তোমার আস্থা নেই। কি গো, বিশ্বাস কর নাকি?

'—করি। বিশ্বাস ত করিই।

'—বিশ্বাস কর তুমি! তোমার পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে ত মনে হয় শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও সংস্কারবিহীন এক যুবক। আর তুমি কিনা বলছ, এসব আজগুবি ব্যাপার বিশ্বাস কর! ঠিক আছে, তুমি একটু বিশ্রাম কর। আমি বরং ধারে-কাছে একটু ঘোরাঘুরি করে দেখি আর কোন নেকড়ে বাবাজীর দেখা পাই কিনা? কথা বলতে বলতে ফ্রেড বনের ঝোপ ঝাড়গুলোর দিকে গুটিগুটি এগিয়ে গেল।

আকাশের গায়ে ঝুলে থাকার মত অত্যুজ্জল চাঁদটা হাঁটি হাঁটি পা-পা ক'রে মাঝ আকাশে উঠে এসেছে বাপ্পালিকে যেন শয়তানি ইঙ্গিত দিচ্ছে। কি সে শয়তানির ইঙ্গিত? তার শারীরিক পরিবর্তনের নাকি স্বভাব পরিবর্তনের ইশারা করছে? রূপান্তরের উশ্‌কানি। রূপান্তরটা কি তার ইচ্ছাবিরুদ্ধ কাজ? আর নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কি সে—হত্যা আর পৈশাচিকতায় মত্ত হয়? তার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর হত্যাকারীতে পরিণত হয়ে যায়? কিন্তু একটু পরেই যখন সকালের ঝলমলে আলোতে পূব আকাশ—তখন কি গতি হবে তার?

গাছের গুঁড়িটার ওপর বসে বাপ্পালি শিকারীর গতিবিধির ওপর নজর রেখে চল্‌ল। সে চাইলেন মুহূর্তের মধ্যে তার কাছে পৌঁছে যেতে পারবে। তারপর···

আচমকা শিকারীর ভয়ার্ত চীৎকার বাপ্পালির কানে এল। সে দৌড়ে তার কাছে হাজির হ'ল। দেখল, মৃত ও থ্যাৎলোনো সে-শিকারীটার কাছে কপালে হাত দিয়ে বসে। কাঁদো-কাঁদো স্বরে সে ব'লে চল্‌ল—'মাইকেল আমার বন্ধু মাইকেল-এর মৃতদেহ! কিন্তু এ কী অবিশ্বাস্য কাণ্ড? তার জামা, প্যাণ্ট, কোট ইত্যাদি কোথায় গেল! হায় মাইকেল! একী—।

ফ্রেড-এর কথা শেষ হবার আগেই বাপ্পালি পিছন দিক থেকে অতর্কিতে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চোখের পলকে তার হাতের রক্তমাখা ছোরাটা শিকারীর গলার কাছে সমূলে গেঁথে দিল। ফিনকি দিয়ে তাজা রক্ত বেরিয়ে এল। যন্ত্রনায় ফ্রেড কাৎরাতে লাগল। বার কয়েক মাটিতে আছাড় খেয়ে তার দেহটা মাটিতে এলিয়ে পড়ল। নিজের মুখটাকে ক্ষতটার দিকে নামাল।

বাপ্পালি আতঙ্কিত চোখে পূব-আকাশের দিকে তাকাল। সময় খুবই কম। পূর্ব-আকাশের গায়ে রক্তিম ছোপ ফুটে উঠল ব'লে। ফ্রেড-এর মৃতদেহটাকে আগেরটার মত ছিন্নভিন্ন ক'রে দেয়ার মত সময় হাতে নেই! ভোরের আলো ফুটে উঠল বলে। তার আগেই তাকে বনের গভীরে চলে যেতে হবে। তার চরমতম শত্রু সূর্যালোক যেখানে পৌঁছতে সাহস পায় না ঠিক তেমনই একটা জায়গা তাকে বেছে নিতে হবে। উন্মাদের মত জামা, প্যাণ্ট ও কোট প্রভৃতি খুলে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল সে। বিবস্ত্র বাপ্পালি গভীর বনের দিকে ছুটল। শেষ রক্ষা করতে পারল না। সূর্যের ক্ষীণ আলো তার দেহে পড়ল। শুরু হয়ে গেল দৈহিক পরিবর্তনের অসহ্য জ্বালা। সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতাটুকুও সে হারিয়ে ফেলল। তার হাত দুটো ক্রমে মাটি স্পর্শ করল। সে বুঝতে পারল, তার দৈহিক রূপান্তর ঘটতে শুরু করেছে। আর তার নিজস্ব অবয়ব সে ফিরে পাচ্ছে। ছাই রঙের মোটামোটা লোম তার গায়ের চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে আসছে। আর? আর পাল্টে যাচ্ছে তার চোখ-মুখের আকৃতি। মুখটা লম্বাটে, চোখ দুটো অত্যুজ্জ্বল হয়ে উঠছে। ইয়া বড় বড় সুতীক্ষ্ম চক-চকে ঝকঝকে দুটো দাঁত মুখের দুপাশ থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসছে। বাপ্পালি এবার বিশালায়তন একটা নেকড়ের রূপ ধারণ ক'রে ক্রোধোন্মত্ত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতে লাগল। বাতাসের গন্ধ নিল। কিসের গন্ধের খোঁজ করছে সে? মানুষের? হ্যাঁ, ধারে-কাছে কোন মানুষের উপস্থিতি বাতাস জানান দিচ্ছে কিনা, লক্ষ করতে লাগল। বার কয়েক এদিক-ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে সে দেখে নিল নিজের অবয়বটাকে। হ্যাঁ, নিখুঁত নেকড়ে বনে গেছে সে। এবার চারদিক কাঁপিয়ে কর্কশ স্বরে গর্জন ক'রে উঠল। তারপরই লম্বা লম্বা পায়ে গভীর বনের দিকে চলে গেল।

———

রবার্ট ব্লচ

পাশের বাড়ির আতঙ্ক

হাইটাওয়ার স্টেশন।

বিকট আর্তনাদ করতে করতে একটা ট্রেন রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে হাইটাওয়ার স্টেশনের দিকে এগিয়ে এল। কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে এক সময় স্টেশনে এসে দাঁড়াল দৈত্যাকৃতি ট্রেনটা। নির্দিষ্ট সময় থেকে অনেক দেরী করে এসেছে। নাতালি ট্রেন থেকে নামল।

রাত্রি অনেকই হয়ে গেছে। আজ রাত্রের শেষ ট্রেন এটা। আর কোন ট্রেন হাইটাওয়ারে থামবে না।

স্টেশন মাস্টারের ঘরও বন্ধ হয়ে গেল। প্লাটফর্ম জনমানব শূন্য। নাতালি হতাশ দৃষ্টিতে একবার চারদিকে চোখের মণি দুটো বুলিয়ে নিল। সত্যই ধারের-কাছে কাউকেই চোখে পড়ল না তার। রাত্রিটুকুর জন্য মাথা গুঁজবে?

নাতালি দু'-চার পা এগিয়ে চারদিকে তাকিয়ে আরও হতাশ হয়ে পড়ল। যতদূর দৃষ্টি যায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। ধূ ধূ ফাঁকা মাঠ। অন্ধকারে লোকবসতির চিহ্ন মাত্রও নজরে পড়ল না তার। এমন একটা পাণ্ডববর্জিত স্থানে সরাইখানার চিন্তা লাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না। আর হোটেলের খোঁজ করার ত প্রশ্নই ওঠে না। এখন উপায়? চার-দিক থেকে জমাট বাঁধা অন্ধকার তাকে ঘিরে ধরেছে।

নাতালি ট্রেন থেকে নামার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আশা করেছিল, তার ডাক্তার-কাকাকে অবশ্যই স্টেশনে পেয়ে যাবে। এরকম আশা করার কারণও ছিল যথেষ্ট। লণ্ডন থেকে যাত্রা করার আগে তাঁকে একটা টেলিগ্রাম করে আগমনবার্তা জানিয়েছিল। এখন কি কোন্ ট্রেনে আসবে সে-কথাও টেলিগ্রামে উল্লেখ ছিল। তাই তাঁকে প্লাটফর্মে না দেখে প্রথমে একটু অবাকই হয়েছিল সে। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভাবল, ট্রেনটা কল্পনাতীত দেরী করে স্টেশনে ঢুকেছে। তাই তিনি হয়ত অপেক্ষা করে করে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। ডাক্তারী পেশায় নিযুক্ত। একটু বেশী রকম ব্যস্তবাগীশ হওয়াই স্বাভাবিক। হাতের কাজ রেখে ভাইঝির জন্য কতক্ষণ আর অপেক্ষা করতে পারেন? ততক্ষণে দু'জনের রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের ব্যবস্থা করে ফেলবেন। কাজের ক্ষতি করে ত আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্লাটফর্মে কাটানো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সব চেয়ে বড় কথা, তার পেশার দিকটা বিবেচনা করে তা উচিতও নয়। এদিকে নাতালি'র যে শিরে সংক্রান্তি! ডাক্তার কাকার উচিত-অনুচিত বিচার করার সময় এটা নয়। এ মুহূর্তে তার একমাত্র চিন্তা, ঠাণ্ডার মধ্যে রাত্রি কাটায় কোথায়? একটা মেয়ের পক্ষে নিরাপত্তার প্রশ্নও রয়েছে, অস্বীকার করার উপায় নেই।

নাতালি হতাশ মনে আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে প্লাটফর্মের নরজার কাছে এসে দাঁড়াল। অসহায় দৃষ্টি মেলে আর একবার চারদিকে তাকাল। অকস্মাৎ একটা অনুজ্জ্বল আলো তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। খুবই অস্পষ্ট—ম্লান। কুয়াশার জন্যই এমনটা দেখাচ্ছে, ধরে নিল। অদূরেই আলোটা জ্বলছে। আশার সঞ্চার হ'ল। ধীর পায়ে সামান্য এগিয়ে যেতেই তার মনে হ'ল টেলিফোন-বুথের আলো। আরও কিছুটা এগোতেই নিঃসন্দেহ হ'ল। হ্যাঁ, টেলিফোন বুথই বটে। প্রাণে এবার জল এল নাতালি'র।

ব্যাগ হাতড়ে নাতালি ডাক্তার কাকার শেষ চিঠিটা বের করল। প্যাডের

কাগজে চিঠিটা লিখেছিলেন তিনি। নাতালি আপন মনে বলে উঠল, ভাগ্যিস আসার সময় চিঠিটা ব্যাগের কোণে ফেলে রেখেছিলাম! নইলে টেলিফোন করার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হতে হ'ত।

চিঠিটার ভাঁজ খুলে নাতালি টেলিফোন বুথের একবার চোখ বুলিয়ে নিল। প্যাডের কাগজের মাথার দিকের নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বারের জায়গাটা ভাল করে দেখল।

নাতালি টেলিফোন নাম্বার অনুযায়ী ডায়াল করল।

হতাশ হতে হ'ল নাতালিকে। মহামুশকিলে পড়া গেল ত! কী ঝকমারীতেই না পড়া গেল রে বাবা! বারবার ডায়াল করেও কিছুতেই লাইন পাওয়া যাচ্ছে না! এ কী নতুন উপদ্রব!

টেলিফোন ছেড়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য বিরক্তিভরে সরে দাঁড়াল নাতালি। ভাবল, একটু পরে আবার চেষ্টা করবে।

আবার নাতালি এগিয়ে গেল। ডায়াল করল। চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর। লাইন পেয়েছে এতক্ষণে।

নতুনতর উপদ্রবের মুখোমুখি হ'ল নাতালি বিপরীত দিক থেকে একাধিক কণ্ঠের সমবেত ধ্বনি ভেসে আসছে। ঠিক যেন দূর থেকে শোনা গেল হাটের কোলাহল। কারো কথাই পরিষ্কার বোঝার উপায় নেই। নাতালির মনটা হঠাৎ অস্বাভাবিক বিষিয়ে উঠল। কী ব্যাপার, কাকার বাড়িতে এত কোলাহল কিসের? এমন কি অঘটন ঘটল যে, হাটুরে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল! কোন উৎসব, নাকি আকস্মিক কোন দুর্ঘটনা? নতুনতর এক দুশ্চিন্তা নাতালির মাথায় ভর করল। একে নিজের চিন্তায় বাঁচে না, তার ওপর আর একটা বোঝা মাথায় চাপল।

নাতালি রিসিভারটা ধরেই আছে। প্রায় মিনিট খানেক পরে বিপরীত দিক থেকে কোলাহল ছাপিয়ে একটা কণ্ঠস্বর স্পষ্ট হয়ে তার কানে বেজে উঠল--'হ্যালো·····হ্যালো।' এক মহিলা কণ্ঠ ভেসে এল নাতিলির কানে।

নাতালি সচকিত হয়ে জবাব দিতে গিয়ে বলল—'হ্যালো, আমি নাতালি বলছি। নাতালি রিভার্স।'

বিপরীত দিক থেকে মহিলা কণ্ঠে বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠল—কে? কে বলছেন?' রীতিমত তীব্র ও অদ্ভুত কণ্ঠে মহিলাটি কথা বলতে লাগলেন।

'—আমি নাতালি রিভার্স বলছি। ডাক্তার ব্রেসগার্ডল-এর বাড়ি কি এটা ?'

'—ডাক্তারবাবু ?'

—হ্যাঁ, ডাক্তার ব্রেসগার্ডল-এর বাড়ি কি এটা ?

—হ্যাঁ। কিন্তু কি চান ? আপনি কে ?'

'—আমি ডাক্তারবাবুর ভাইঝি ?'

'—ডাক্তারবাবুর কে আপনি ? কি বললেন, ভাল বুঝলাম না।'

'—ভাইঝি নাতালি রিভার্স। ডাক্তারবাবুর ভাইঝি আমি।'

'—ডাক্তারবাবুর ভাইঝি ? বেশ, ভাল কথা। কিন্তু কি দরকার, বলুন ?'

'—ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একবারটি কথা বলতে চাই। দয়া করে তাঁকে একটু—'

'—আচ্ছা, ডাক্তারবাবুকে দিচ্ছি, ধরুন।'

'—অশেষ ধন্যবাদ !'

মহিলার কণ্ঠস্বর থেমে যেতেই আবার বিপরীত দিক থেকে হৈ হট্ট-গোল পুরোদমে শোনা যেতে লাগল। নাতালির চোখে-মুখে বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠল।

কয়েক মুহূর্ত পরে কোলাহল ভেদ করে এক পুরুষ কন্ঠ নাতালির কানে এল। বেশ ভারিক্কি কণ্ঠস্বর। কোলাহল প্রায় চাপা পড়ে গেল।

নাতালি ফোনের রিসিভারটা বেশ শক্ত করে ধরল। বিপরীত দিক থেকে মোটা-কর্কশ স্বর ভেসে এল—'হ্যালো, আপনি কে বলছেন ?'

নাতালি আগ্রহান্বিত হয়ে জবাব দিল—'নাতালি—আমি নাতালি রিভার্স বলছি।'

'—নাতালি ? নাতালি বলছ ?

'—হ্যাঁ, আমি নাতালি বলছি।'

'—তাই নাকি ? আমি তোমার ডাক্তারকাকা। ডক্টর ব্রেসগার্ডল বলছি। তুমি যে আসবে আমি কিন্তু ভাবতেই পারিনি।'

'—তুমি ভাবতে পারি নি !' নাতালি'র চোখে মুখে বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠল।

'—শোন নাতালি, তোমার আসার খবর পেয়ে খুবই আনন্দিত

হয়েছি! খুবই আনন্দিত! সত্যি খুব আনন্দিত—'

নাতালি সবিস্ময়ে বলে উঠল—, বলছ কি! আমি যে আজ আসব তুমি জানতে না?' নাতালির কণ্ঠে রীতিমত বিস্ময়ে ফুটে উঠল।

'—তুমি যে আজই আসবে জানব কি করে, বল?'

'—আমি ত লণ্ডন থেকে রওনা দেবার অনেক আগেই টেলিগ্রাম করেছিলাম।'

'—টেলিগ্রাম! আমাকে টেলিগ্রাম—।

'—কেন, আমার সে-টেলিগ্রাম কি তুমি হাতে পাও নি?'

'—কই, না-ত। এটা অসম্ভব কিছু নয়। আসল কথা কি জান? ব্যাপার হচ্ছে, এখানকার টেলিগ্রাম-টেলিফোনের ব্যাপার স্যাপার তেমন সুবিধের নয়।

'—আমি আরও ভাবলাম—।

নাতালির কথা শেষ হবার আগেই ডক্টর ব্রেসগার্ডেল বলে উঠলেন—'বললাম ত, তোমার কোন টেলিগ্রাম আমার হাতে আসে নি। যাক গে, তুমি কোত্থেকে ফোন করছ, বল ত নাতালি?

'—হাইটাওয়ার স্টেশনের বুথ থেকে।

'—হাইটাওয়ার স্টেশন?

'—হ্যাঁ।'

মুহূর্তের জন্য বিপরীত দিকের কণ্ঠস্বর বন্ধ হয়ে গেল। তারপরই আবার ডক্টর ব্রেসগার্ডেল-এর কণ্ঠস্বর নাতালির কানে ভেসে এল—'একটু সমস্যা দেখা দিল!

'—সমস্যা? কিসের সমস্যা কাকাবাবু?

'—পথটা পুরো বিপরীত দিকে হয়ে গেল।

'—বিপরীতদিকে? কিসের বিপরীত দিকে কাকাবাবু, বুঝলাম না-ত।

'—মানে পিটারবির কথা বলছি।

'—মানে হাইটাওয়ার বিপরীত দিকে ত অবশ্যই।

'—তাতে কি হয়েছে?

'—ব্যাপারটা হচ্ছে একটু আগেই পিটারবি থেকে টেলিফোন এসেছিল। মানে কল এসেছে। অ্যাপনডিক্সের এক রোগীকে দেখতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। রোগীর কঠিন সমস্যা দেখা দিয়েছে। আবার

এমনও হতে পারে গিয়ে দেখব, রোগ কিছুই না, সামান্য পেটের গোল-যোগমাত্র। একেবারেই মামুলি ব্যাপার।

নাতালি শুকনো গলায় কোনরকমে উচ্চারণ করল—'ও তাই বুঝি?

'—আসলে সমস্যাটা এখানেই। আমি তাঁদের কথা দিয়েছি, এক্ষুণি যাব।'

'—কিন্তু কাকাবাবু তুমি না একজন বিশেষজ্ঞ। লোকে আজও খুটখুট রোগের জন্য তোমার মত একজন স্পেশালিস্টকে ডাকে? কী যে বলছ, ভেবেই পাচ্ছিনে!

'—রোগ নাকি খুবই কঠিন আকার ধারণ করেছে। রোগী খুবই কষ্ট পাচ্ছে। একেবারে বিছানায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। আর বল কেন, এ-অঞ্চলে আর ডাক্তার কোথায় যে, হাত বাড়ালেই পাবে।'

'—হ্যাঁ, জায়গাটা দেখে ত সেরকমই মনে হচ্ছে।

'—তাইত সাধারণ-অসাধারণ সব কেসই আমাকে দেখতে হয়। সবে ধননীলমণি হলে যা হয়ে থাকে।' কথাটা হাসতে হাসতে ছুঁড়ে দিলেন ডক্টর ব্রেসগার্ডল।

'—হ্যাঁ সেরকমই ত দেখছি।'

'—তারপর সে-কথা বলতে চাইছি, শোন—

'—ডক্টর ব্রেসগার্ডল-এর মুখের কথা শেষ হতে না দিয়েই নাতালি বলে উঠল—'তবে এত রাত্রে শীতের মধ্যে আমি কতক্ষণ এখানে অপেক্ষা করব! বেশীক্ষণ—

'আর তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে না। সে-কথাই ত বলতে চাইছি।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নাতালি বল্‌ল—'তুমি রোগী দেখে কখন ফিরবে তার কি কোন নিশ্চয়তা আছে? তা-ও আবার বলছ, বিপরীত দিকে।'

'—আরে না। এক্ষুনি মিস গ্লুম'াকে পাঠাচ্ছি। তিনি গাড়ী নিয়ে যাচ্ছেন তোমাকে স্টেশন থেকে নিয়ে আসার জন্য।

'—ও তাই বুঝি?

'—হ্যাঁ, ভাল কথা। তোমার সঙ্গে লটবহর মানে মালপত্র বেশী কিছু আছে কি?'

'—না। ধরতে গেলে আমি খালি হাতেই এসেছি! কেবলমাত্র একটা বাক্স আমার সঙ্গে রয়েছে।'

'—আর বাকী মালপত্র ?'

'—সঙ্গে আনিনি।

'—তবে ?

'—সবই বোটে তুলে দিয়েছি।'

'—বোটে। ডক্টর ব্রেসগার্ড'ল-এর কণ্ঠস্বরে বিস্ময় প্রকাশ পেল।

'—কেন তোমাকে ত সবই চিঠি লিখে জানিয়েছি কাকাবাবু।'

'—জানিয়েছ ? চিঠি লিখে জানিয়েছ ? ও—হ্যাঁ, অবশ্যই জানিয়েছ। তবে মিস গ্লুমার'কে গাড়ী দিয়ে পাঠাচ্ছি।

'—তবে তা-ই কর।'

'—আর একটা কথা, তুমি কোথায় থাকবে বল ত ?

'—আমি ত স্টেশনেই রয়েছি। প্লাটফর্মে'ই অপেক্ষা করব।'

'—ঠিক আছে। আমার এখানে আবার একটা পার্টি চলছে কিনা।

'—পার্টি ?'

'—হ্যাঁ। তবে তেমন কিছু নয়। ছোটখাট একটা ঘরোয়া পার্টি। শুকনো গলায় নাতালি বল্‌ল—'তোমার ওখানে পার্টি চলছে, আমি গিয়ে হাজির হলে—।

নাতালির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ডক্টর ব্রেসগার্ড'ল হাসতে হাসতে বললেন—'তাতে কি হয়েছে ? তুমি ত আমার ঘরের লোক।'

—মানে আমার আকস্মিক উপস্থিতির ফলে অতিথি-অভ্যাগতরা বিব্রত বোধও ত করতে পারেন।'

ডক্টর ব্রেসগার্ড'ল কণ্ঠস্বরের হাসিটুকু অক্ষুণ্ণ রেখেই বললেন—বিকৃত হবার কি আছে, বুঝছি না ত !

'—মানে তুমি বা তোমার নিমন্ত্রিত অতিথিরা ত আমার উপস্থিতির কথা কিছুই জানেন না।'

হো হো রবে হেসে ডক্টর ব্রেসগার্ড'ল বলে উঠলেন—' এসে পাগলের মত কথা ! ঘরের মেয়ে ঘরে আসবে তাতে পার্টি থাকলেই বা কি আছে ? যাক, পার্টির জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। কেন না নিমন্ত্রিত অতিথিরা এক্ষুনি বিদায় নেবেন।

'—তবে গাড়ী পাঠাচ্ছ, কি বল ?'

'—হ্যাঁ মিস গ্লুমার এক্ষুনি রওনা দিচ্ছেন।'

'—আচ্ছা।'

'—তুমি প্লাটফর্মেই আর একটু অপেক্ষা কর নাতালি। বেশী দেরী হবে না। একটু কষ্ট হ'ল, এই আর কি।' কথা বলতে বলতে আগের স্বর অনুকরণ করেই ডক্টর ব্রেসগার্ডল হাসলেন। প্রতিবার একই স্বরে হেসেছেন নাতালি এটুকু অন্ততঃ লক্ষ্য করল।

ডাক্তার ব্রেসগার্ডল এবার বললেন—'তবে আর একটু ধৈর্য ধর। আর কিছু বলবে কি?'

'—না, টেলিফোনে আর কি বলার থাকতে পারে, বল? তা ছাড়া আর একটু পরেই ত পেঁাছে যাচ্ছি। দেখা হচ্ছে। যা কিছু কথাবার্তা সাক্ষাতেই হবে।'

'—হ্যাঁ, সে-ত নিশ্চয়ই। তবে রাখলাম।' বিপরীত দিক থেকে রিসিভার রেখে দেবার শব্দ শোনা গেল।

নাতালি হাতের রিসিভারটা নামিয়ে রাখল। এবার ধীর পায়ে টেলিফোন বুথ ছেড়ে বেরিয়ে এল।

নাতালি ব্যাগ হাতে প্লাটফর্মে এল। অন্ধকারে বসার জায়গা খোঁজার চেষ্টা না করে ব্যাগ হাতে পায়চারী করতে লাগল। ভাবল, কত আর দেরী হবে? ডাক্তারকাকা ত বললেনই, এক্ষুণি মিস গ্লুমার গাড়ী নিয়ে রওনা দিচ্ছেন। কতক্ষণ আর লাগবে? এ রকম চিন্তা করে নাতালি প্লাটফর্মেই হাঁটাহাঁটি করে সময় কাটাতে লাগল।

একটা স্টেশন ওয়াগান কিছুক্ষণ পরেই তীব্র গর্জন করতে করতে স্টেশনের প্রধান ফটকের কাছে এসে দাঁড়াল। গতিবেগ খুব বেশী ছিল। হঠাৎ করে থামানো খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার বটে। তবে আচমকা ব্রেক কষে গাড়ীটাকে থামানো হ'ল যেন।

গাড়ীর দরজা খুলে গেল। ছিপছিপে চেহারার এক মহিলা গাড়ী থেকে নামলেন। গাড়ীর আলোয় দেখা গেল কেবলমাত্র রোগাই নন, লম্বাও খুবই। মাথায় একরাশ তামাটে রঙের চুল। কপালের ওপর ঝুলে পড়া কয়েকটা চুল বাতাসে হাল্কাভাবে দোল খাচ্ছে। তাঁর পরিধানে সাদা পোষাক। ব্যবহারের ফলে দুমড়ে-কুঁচকে গেছে।

গাড়ী থেকে নেমে মহিলাটি লম্বা-লম্বা পায়ে কয়েক পা এগিয়ে প্লাটফর্মের দিকে এগোলেন। গাড়ীর শব্দ শুনে নাতালিও ইতিমধ্যে প্রধান ফটকের দিকে কিছুটা এগিয়ে এসেছে।

মহিলাটি নাতালি'কে হাত তুলে ইশারা করে ডাকলেন। চেঁচিয়ে

বললেন—'চলে আসুন, তাড়াতাড়ি আসুন। আমার আবার একটু তাড়া আছে. তাড়াতাড়ি এসে গাড়ীতে বসুন। একদম দেরী করতে পারব না —চলে আসুন।'

নাতালি ব্যাগ-হাতে স্টেশন ওয়াগানটার দিকে প্রায় ছুটে গেল।

নাতালি গাড়ীর কাছাকাছি এসে পেঁছিতে না পেঁছিতেই মহিলাটি ধরতে গেলে এরকম জোর করেই তার হাতের ব্যাগটা নিয়ে নিলেন।

নাতালি তাঁর ব্যস্ততায় বিস্মিতই হ'ল।

মহিলাটি ব্যাগটা নিয়ে গাড়ির পিছন দিকে যেতে যেতে বললেন—এক কাজ করি, এটা গাড়ীর পিছনেই রাখি।' কথা বলতে বলতে হাতের ব্যাগটাকে পিছন দিকে ছুঁড়ে দিলেন। ব্যাগটা ধপাস করে গাড়ীর মেঝেতে আছাড় খেয়ে গিয়ে পড়ল।

ব্যাগটা ফেলে দিয়েই মহিলাটি বিদ্যুৎ গতিতে ঘাড় ঘুরিয়ে নাতালির দিকে তাকালেন। এবার রীতিমত আদেশের সুরেই কথাটা ছুঁড়ে দিলেন —'তার এক মুহূর্তেও দেরী নয়, উঠে পড়ুন···গাড়ীতে উঠুন। এক মুহূর্তও দেরী করা যাবে না। উঠুন!—উঠে পড়ুন! এই ত—কাছেই, চোখের পলকে ডাক্তারবাবুর বাড়ি পেঁছে যাবেন।'

মহিলাটির তাড়া খেয়ে নাতালি ব্যস্ত পায়ে গাড়ীতে উঠল।

নাতালিকে গাড়ীর দরজা ভালভাবে বন্ধ করার সুযোগ না দিয়েই মহিলাটি গাড়ী ছেড়ে দিলেন। ব্যস, চোখের পলক পড়তে না পড়তে উল্কার বেগে গাড়ী ছুটতে শুরু করল। অবিশ্বাস্য তার গতি। মিটারের কাঁটা লাফিয়ে একেবারে সত্তরের ঘরে চলে গেল।

মহিলাটির কাণ্ড দেখে নাতালি'র চোখ একেবারে ছানাবড়া হয়ে গেল। আপন মনে বলে উঠল—'একী কেলেঙ্কারী কাণ্ডরে বাবা! দুম্ করে একেবারে সত্তর মাইল বেগে গাড়ী ছুটিয়ে দেন! গ্রামের কাঁচা রাস্তায় সত্তর মাইল বেগে—ভাবাই যায় না! নাতালি'র আপাদমস্তক কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। মহিলাটিকে বলে—'এ কী করছেন। মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যাবে যে!'

নাতালি'কে কিছু বলতে হ'ল না। তার চোখ-মুখের আকস্মিক ভয়-ভীতির ছাপটুকু মিস গ্লুমার-এর নজর এড়াল না। ম্লান হেসে বললেন —'ভয়ের কিছু নেই। এমন দ্রুত গতিতে গাড়ী চালাতে হচ্ছে বলে আমি সত্যি দুঃখিত!

নাতালি নীরব চাহনি মেলে মুহূর্তের জন্য মহিলাটির মুখের দিকে তাকাল। পর মুহূর্তেই আবার গাড়ীর মিটারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

মিস গ্লুমার এবার বললেন—'এ ছাড়া কোন উপায় নেই। ডাক্তারবাবু বাইরে। জরুরী কল পেয়ে বাইরে গেছেন। তাঁর অবর্তমানে আমার পক্ষে বেশীক্ষণ বাইরে থাকা একেবারেই সম্ভব নয়। তাই নিতান্ত অনন্যোপায় হয়েই গাড়ীর গতি বাড়াতে—

'—কথাটা ঠিকই বটে। বাড়ীতে আবার নিমন্ত্রিত লোকজন সব রয়েছেন। খালি বাড়িতে নিমন্ত্রিতদের ফেলে—।

নাতালি'র মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মিস গ্লুমার আচমকা ব'লে উঠলেন —'নিমন্ত্রিত লোক! কিসের নিমন্ত্রিত লোক! কার কাছে শুনেছেন? অত্যাশ্চর্য সরু-গলায় কথাটা ছুঁড়ে দিলেন তিনি।

নাতালি স্বাভাবিক স্বরেই জবাব দিল—'কেন? কার কাছে আবার শুনব? ডাক্তার কাকাই ত পার্টির কথা বলেছেন।

'—ডাক্তারবাবু বলেছেন? কখন? কখন বলেছেন, বলুন ত?

'—যখন আমাদের মধ্যে ফোনে কথা হচ্ছিল। বাড়িতে লোকজন রয়েছেন। ঘরোয়া পার্টি—

নাতালি'র মুখের কথা কেড়ে মিস গ্লুমার বললেন—'তাই বুঝি। একটু আগে আপনাদের ফোনে পার্টির কথা বলেছেন!'

আচমকা গাড়ী একটা বাঁক ঘুরল। এক্ষুণি কেলেঙ্কারী ঘটতে যাচ্ছিল। মনে হল যেন আর মাত্র সামান্যর জন্য গাড়ীটা রাস্তা থেকে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। আচমকা ব্রেক কষায় চাকাগুলো তীব্রস্বরে গুমড়ে উঠল। যেন বিদ্রোহ করতে চাইছে। সশব্দে রুখে দাঁড়াতে চাইছে। মিস গ্লুমার ব্যাপারটাকে আমলই দিলেন না। আগের মতোই বেহুঁশ-ভাবে গাড়ী ছুটিয়ে দিলেন।

মিসেস গ্লুমার-এর কাণ্ড দেখে নাতালি উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় একেবারে মুষড়ে পড়ার উপক্রম হল। অবাঞ্ছিত ভয়-ভীতি তার মন প্রাণ জুড়ে বসল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবার জোগাড়। মিস গ্লুমারকে আর কিছু বলতেও সাহসে কুলিয়ে উঠছে না। একে বেপরোয়া ভাবে গাড়ী ছুটিয়ে দিয়েছেন, তার ওপর কথার উত্তর দিতে গেলে ভয়ঙ্কর একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দিতে পারেন। তবে আর দেখতে হবে না। বেঘোরে

প্রাণ দিতে হবে। কিন্তু তিনি যা শুরু করেছেন তাতে মুখ বুজে থাকাও মুশকিল। উৎকণ্ঠায় দেহ-মন অবশ হয়ে পড়ার উপক্রম। নাতালি শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত করল, বরাতে যা আছে হবে। কথা বলে মহিলাটিকে অন্যমনস্ক করে দিয়ে বিপদ ত্বরান্বিত করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

নাতালি গাড়ীর মিটারের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে গুম হয়ে বসে রইল। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? মিটারের কাঁটাটা সত্তরের ঘর থেকে নেমে আসা ত দূরের কথা, বরং কিছুটা এগিয়েই গেছে। সে মুখ খুলতে বাধ্য হ'ল—মিস গ্লুমার!

'—কিছু বলবেন?

'—আমার ডাক্তারকাকার সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইছি।

'—যেমন? কি জানতে চাইছেন?'

'—লোক হিসেবে তিনি কেমন, বলুন ত?

'—কেন? জানেন না আপনি? সবিস্ময়ে মিস গ্লুমার পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

নাতালি পূর্বস্বরেই বলল—'না। তার সম্বন্ধে তেমন কিছুই আমার জানা নেই।

'—সে কী! আপনার কাকাকে এর আগে কোনদিন দেখেন নি?

'—না। সে সৌভাগ্য আমার কোনদিন হয় নি।'

'—কথাটা কিরকম হল না। আপনার কাকা, অথচ আপনি তাঁকে কোনদিন দেখেনও নি!'

নাতালি বেশ একটু অপ্রস্তুতেই পড়ে গেল। সে আমতা আমতা করে বল্‌ল—'না' মানে—আসলে আমার শৈশবে আমার বাবা-মা রুজি রোজগারের জন্য অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমিয়েছিলেন।

'—তারপর?'

তারপর এতগুলো বছর সেখানেই কাটিয়েছি।'

'—এর আগে কোনদিন ইংলণ্ডে আসেন নি?'

'—না। এই প্রথম আসছি।'

'—বুঝেছি।'

'—আসলে এই প্রথম আমি কমবেরা ছেড়েছি।'

'—তাই নাকি?'

মিস গ্লুমার আগের মতই বিচিত্র স্বরে প্রশ্নটা নাতালি'র দিকে ছুঁড়ে দিলেন। কাঁপা কাঁপা, খুবই সরু বিচিত্র এক কণ্ঠস্বরে কথা বলছেন তিনি।

কণ্ঠস্বরের বৈচিত্রটুকু নাতালি'র নজর এড়াল না। বিস্মিত হ'ল খুবই। বিস্ময়ের ঘোরটুকু চেপে রেখে কণ্ঠস্বরে স্বাভাবিকতা বজায় রেখেই নাতালি মিস গ্লুমার-এর প্রশ্নের উত্তর দিল—'হ্যাঁ। এই প্রথম কমবেরার বাইরে এসেছি।

'—আপনার বাবা-মা ?'

'—তারা স্বর্গে গেছেন।'

'—তাই নাকি ? কবে ? কতদিন হ'ল ?'

'—দু'মাস। দু'মাস আগে মারা গেছেন।'

'—এক সঙ্গেই উভয়ে মারা গেছেন কি ?'

'—হ্যাঁ, এক সঙ্গেই।'

'—কিভাবে ? কি হয়েছিল ?'

'—মোটর দুর্ঘটনায় দু'জন একই সঙ্গে মারা গিয়েছিলেন।

'—বুঝেছি। তাই আপনি গাড়ীর গতি দেখে ভয়ে এমন মুষড়ে পড়েছেন ?'

'—হ্যাঁ। সেরকমই ভাবতে পারেন।'

'—এবার বুঝলাম।'

'—কেন ডাক্তার কাকার মুখে একথা শোনেন নি আগে ?'

'—না। না শোনার কারণও আছে।'

'—কি সে কারণ ?'

'—কারণ, আমি ত খুব বেশীদিন হয় নি ডাক্তারবাবুর কাছে এসেছি। অতএব এসব পারিবারিক ব্যাপার স্যাপার নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে যাবেনই বা কেন ?'

'—হ্যাঁ। তবে ত না শোনারই কথা।'

নাতালি'র মুখের কথা শেষ হতে না হতেই গাড়ীটা আবার একটা সঙ্কটজনক বাঁক ঘুরল। ক্যাঁ, ক্যাঁ শব্দ করে চাকাগুলো আর্তনাদ করে বিদ্রোহ জানাল।

পর মুহূর্তেই মিস গ্লুমার-এর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'মোটর দুর্ঘটনায়, তাই না ?'

'—হ্যাঁ।'

'—দেখুন, যারা গাড়ীর স্টিয়ারিং পর্যন্ত ভালভাবে ধরতে জানে না। গাড়ীর কলকব্জা সম্বন্ধে তাদের সামান্যতম জ্ঞানও নেই, আর তাহারা যদি গাড়ী চালাতে যায় তবে দুর্ঘটনা হবে এতে আর আশ্চর্য কি? ডাক্তার-বাবুর মুখেও এরকম কথা শুনেছি। আসলে সবার সব কাজ মানায় না।'

কথা ক'টা ব'লে মিস গ্লুমার ঘাড় ঘুরিয়ে আবার পিছনের দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে বল্লেন—একটা কথা জিজ্ঞেস করতে—।

তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই নাতালি ব'লে উঠল—'কি? কি কথা?'

'—আপনার আর কে কে আছেন?'

'—কাকা ছাড়া পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কেউ-ই নেই আমার!

'—তবে এখন থেকে তাঁর কাছেই বুঝি থাকবেন মনস্থ করেছেন?'

'—অবশ্যই। তা ছাড়া যাবই বা আর কোথায়? আজ কাকাবাবুই আমার নিদেনের সম্বল।'

মিস গ্লুমার নির্বাক।

নাতালি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে চল্ল—'আজ কাকাবাবু ছাড়া আমার এমন কেউ নেই যার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। আমার অসহায় অবস্থার কথা জানতে পেরে কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারলেন না। বরং সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমার প্রকৃত অভিভাবকের কাজ করলেন। চিঠি লিখে বলে পাঠালেন, আমি যেন যত শীঘ্র সম্ভব তাঁর কাছে চলে আসি।'

'—তাই বুঝি চলে এলেন?'

'—দেখুন চিঠির মাধ্যমে একজন লোক সম্বন্ধে কতটুকু অনুমান করা যায়! তিনি কি ধাতের মানুষ জানতে হলে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের দ্বারাই তা সম্ভব। তাই ভাবছি, কাকাবাবু লোকটা কেমন জানার জন্য বড়ই উৎসাহী। তাই আপনাকে বিরক্ত করা, এরকম প্রশ্নের অবতারণা করা।'

মিস গ্লুমার নীরবে অদ্ভুত ভঙ্গিমায় হাসলেন।

নাতালি এবার বল্ল কাকাবাবুর সান্নিধ্যে যাচ্ছি বটে। কিন্তু একেবারে দ্বিধা - ভয় যে মনে নেই এমন কথা বলতে পারব না।

মিস গ্লুমার যন্ত্রচালিতের মত মুহূর্তের জন্য ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে নাতালি'র দিকে তাকালেন। পর মুহূর্তেই সামনে রাস্তার দিকে মুখ

ঘুরাতে ঘুরাতে কণ্ঠস্বরে বিস্ময় প্রকাশ করে বল্‌লেন 'ভয়' ? ভয় কেন ? কিসেরই বা ভয় ।' তাঁর কণ্ঠস্বর অদ্ভুত । নাতালির কানে তা রহস্যজনক ঠেকল ।

নাতালি নিজেকে সামলে নিয়ে বল্‌ল—'না, মানে কাকাবাবু একজন প্রখ্যাত মনোরোগের চিকিৎসক । এ-রোগের ক্ষেত্রে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ । সত্য বলতে কি, কোনদিন মনোরোগের চিকিৎসকের মুখোমুখি হওয়ার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যা-ই বলুন না কেন আমার হয় নি । তাই এরকম একজন লোকের মুখোমুখি হওয়ার আগে ভয়-ডর একটু-আধটু মনের কোণে উঁকি মারা কিছুমাত্র বিচিত্র নয় ।'

'—এর আগে কোনদিনই মনোরোগের ডাক্তারের মুখোমুখি হন নি বুঝি ?'

'—না কোনদিনই না ।'

'—দেখুন, অনেক মনোরোগের ডাক্তারের মুখোমুখি আমি হয়েছি । আমি ভালই জানি, এ-রোগের ব্যাপারে আপনার কাকা একজন মস্ত বড় চিকিৎসক ।'

'—আমি তা জানি । এ-রোগের কেবলমাত্র একজন সাধারণ চিকিৎসকই তিনি নন । একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট নাম ডাক রয়েছে ।'

'—ঠিক তাই । তার চেয়েও বড় কথা, রোগীদের ওপর তাঁর মত অসীম সহানুভূতিও মমত্ববোধ দ্বিতীয় কারো মধ্যে আমি দেখিনি । আর রোগীদের হাজার আবদার, অনুরোধ উপরোধ মেনে নিয়ে ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করার মানসিকতা তার আছে ।'

'—শুনেছি, কাকাবাবুর নাকি খুবই বশ ।'

নাতালি'র মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মিস গ্লুমার বলে উঠলেন 'এত খুবই স্বাভাবিক কথা । ডাক্তার হিসাবে তার তুলনা হয় না । রোগীদের অসীম আস্থা তাঁর ওপরে । আর একটা কথা খুবই সত্য, মনোরোগাক্রান্ত ব্যক্তির ত অভাব নেই ।'

'—তা বটে !'

'—বিশেষ করে ইদানিং সঙ্গতি সম্পন্ন ও তথাকথিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ঘরে ঘরে এরোগের নিশ্চিন্ত আবাসস্থল ।

'—খুবই সত্য বটে ।'

'—ফলে আপনার কাকার ত পোয়াবারো ! দু'হাতে টাকা কামাচ্ছেন ।

আখের গুছিয়ে নিয়েছেন ! সত্য বলতে কি, আজ তিনি একজন রীতিমত ধনকুবেরে পরিণত হয়ে গেছেন। গাড়ী-বাড়ী, দাস-দাসী কোন কিছুরই অভাব নেই। হাত বাড়ালেই চাহিদা পূরণ হয়ে যায়। তাছাড়া এনিয়ে মিছে ভাবনারই বা কি আছে ? আর ত মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার। ব্যস তারপরই সশরীরে তাঁর রাজকীয় প্রাসাদে পেঁছে যাচ্ছেন। তাঁরই বাড়িতে, তাঁর সান্নিধ্যে বসবাস করছেন। সব কিছু নিজের চোখে দেখবেন, বুঝবেন—'অসুবিধা কোথায়, বুঝছি না-ত। ধৈর্য ধরুন, নিজের চোখেই দেখেশুনে উৎকণ্ঠামুক্ত হবে না।'

মিস গুমার-এর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই বাড়ীটা একদিকে মারাত্মক রকম কাৎ হয়ে তুমুল ঝাঁকুনি দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে বাঁক ঘুরল। এবার বিশালায়তন একটা বাড়ি নাতালির চোখের সামনে ভেসে উঠল। বাড়িটা বহু পুরনো বলেই মনে হ'ল। সদর রাস্তার ওপরে বাড়ির প্রধান ফটক। বেশ বড়ো সড়ো। বাগান বাড়ির ফটকের মতই বড় সেটা। প্রধান ফটক থেকে অনেকখানি ভেতরে আসল বাড়িটা অবস্থিত। আর বাড়ির বাইরে ? বাইরে চার দিকেও অনেকখানি জায়গা রয়েছে। দেখতে গেল নাতালি।

প্রধান ফটকটা খোলাই রয়েছে। গাড়ীটা দ্রুতগতিতে ভেতরে ঢুকে গেল ! ভেতরে অনেকখানি কাঁকড় বিছানা পাকা রাস্তা পেরিয়ে গাড়ীটা বাড়ির সদর-দরজায় গিয়ে প্রবল একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

নাতালি আপন মনে বলে উঠল 'ব্যাপারটা আমার মোটেই ভাল লাগছে না।'

মিস গুমার নাতালি'র দিকে মুহূর্তের জন্য ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে নিয়ে গাড়ী থেকে নামার উদ্যোগ করলেন।

নাতালি এবার বল্‌ল 'কী বিচ্ছিরি ব্যাপার হয়ে গেল, বলুন ত ! সারাদিনের ধকলে জামা-কাপড়ের যা হাল হয়েছে ভদ্রসমাজে যাওয়ার মত নয় !'

আগের মতই অদ্ভুত স্বরে হেসে মিস গুমার বল্‌লেন 'তাতে কি হয়েছে ? এনিয়ে মিছে ভাববার —'

'—সত্যি বিচ্ছিরি লাগছে ! কাকাবাবুর বাড়িতে আবার পার্টি রয়েছে। নিমন্ত্রিত অতিথিরা রয়েছেন। এ-পোষাকে গিয়ে হাজির হলে কি ভাববে সবাই ! কী অপ্রস্তুতেই না পড়তে হবে !'

'—বুঝলাম। এই কথা! কথাটা নাতালির উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিয়ে মিস গ্লুমার পূর্বস্বর অনুকরণ করে হেসে উঠলেন।

নাতালি বিস্ময়ভরা চোখে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মিস গ্লুমার হাসি থামিয়ে এবার অদ্ভুত এক রহস্যজনক স্বরে বলতে লাগলেন —'দেখুন, এটা কোন ব্যাপারই নয়। এটা নিয়ে মিছে ভেবে অস্থির হওয়ার কিছুমাত্র কারণই নেই।

নাতালি চোখের তারায় বিস্ময় অবিশ্বাসের ছাপ এঁকে তাঁর মুখের দিকে তাকাল।

মিস গ্লুমার একই রকম বিচ্ছিরি স্বরে বলে চল্‌লেন—'কেন ভাবতে বারণ করছি জানেন? আমাদের এখানে সামাজিকতা ও লৌকিকতার কোন ব্যাপারই নেই। ডাক্তারবাবু প্রায়ই একথা বলেন।

'—তাই বুঝি?'

'—হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমি তাঁর কাছে প্রথম আসার দিনই আমাকে ঠিক এ-কথাই বলেছিলেন। এটাকে বাড়ির দূরবর্তী আর একটা বাড়ি মনে করতে পার।

আমাদের স্টেশন ওয়াগানটা একটা গাড়ীর ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে। মিস গ্লুমার দরজা খুলতে খুলতে বল্‌লেন—'নেমে আসুন। কথাটা নাতালির উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিয়েই যন্ত্রচালিতের মত ঝট করে পিছনের দিকে রক্ষিত ব্যাগটা টেনে নিলেন। এমন অবিশ্বাস্য রকম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তিনি কাজটা সারলেন যা নাতালি'র বিস্ময় উৎপাদন করল।'

নাতালি গাড়ী থেকে নামল।

মিস গ্লুমার তেমনি অদ্ভুত সরু গলায় বল্‌লেন—'আসুন আমার সঙ্গে।' কথা বলতে বলতে তিনি লম্বা-লম্বা পায়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন। লম্বা বারান্দা। বারান্দাটা পেরিয়ে ভেতরে যাবার দরজা। দরজা বন্ধ। তালা দেয়া। চাবিটা খোঁজার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তিনি। আপন মনে বলে উঠলেন—'দরজার কড়া নাড়ার চেষ্টা করে কোনই লাভ নেই। ভেতরের সবাই নিজেদের নিয়ে এমনই মাতামাতি জুড়ে দিয়েছে যে, কড়া নাড়ার শব্দ শুনতেই পাবে না। সে চেষ্টা বৃথা।

নাতালি অদূরে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হয়ে ঘরের ভেতরের কোলাহল শোনার চেষ্টা করতে লাগল। দরজার ফাঁক-ফুঁকো দিয়ে যে অস্পষ্ট কোলাহল তার কানে এল তার সঙ্গে টেলিফোনে শোনা সে-কোলাহলের

যথেষ্ট সাদৃশ্য খুঁজে পেল না। বরং এখন সে কোলাহল অধিকতর প্রবল ও স্পষ্টতর।

মিস গ্লুমার দরজা খুলে ঘরটার দিকে দু'পা এগোলেন। এর দরজা ভেজানোই রয়েছে। হাল্কা চাপ দিয়ে দরজাটা খুলে ফেললেন। নাতালি দরজার বাইরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। কর্তব্য সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তায় মগ্ন।

মিস গ্লুমার দরজা দিয়ে সামান্য ঢুকে ঘাড় ঘুরিয়ে বল্লেন—'বাইরে দাঁড়িয়ে যে! ভেতরে আসুন। চলে আসুন আমার সঙ্গে।'

নাতালি নিজের পোষাকের দিকে চেয়ে আমতা আমতা করে বললেন—'এভাবে ভেতরে সবার সামনে—।'

'—কেন যে এমন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছেন, বুঝছি না। আগেই ত বলেছি, এখানকার কেউই লৌকিকতার ব্যাপার স্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না। আসুন, চলে আসুন।

অনন্যোপায় হয়ে নাতালি দ্বিধাজড়িত পায়ে চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল।

নাতালি ঘরের ভেতরে যাওয়ামাত্র মিস গ্লুমার দুম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

অত্যুজ্জ্বল আলোকচ্ছটা সারা ঘরময় ছড়িয়ে রয়েছে। নাতালি'র চোখে অসহ্য লাগল। সবকিছু কেমন যেন ঝাঁপসা দেখতে লাগল সে। একটু পরেই অত্যুজ্জ্বল আলোকচ্ছটার সঙ্গে তার চোখ দুটোর বোঝাপড়া হয়ে গেল। এবার সে বুঝল, এটা ঘর নয়, লম্বা একটা বারান্দা বারান্দায় মিস গ্লুমার-এর সঙ্গে কে দাঁড়িয়ে।

নাতালি সামনে একটা সিঁড়ি দেখতে পেল। সোজা ওপরে উঠে গেছে। সিঁড়ি আর দেয়ালের মাঝখানে এক চিলতে জায়গা। সেখানে একটা টেবিল পাতা। টেবিলটার লাগোয়া একটা চেয়ার গদি দেয়া।

নাতালি ডান দিকে চোখ ফেরাল। সুদৃশ্য একটা দরজা চোখের সামনে ফুটে উঠল। দরজার গাঢ় রঙের প্রলেপ তার সৌন্দর্য অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

নাতালি, দরজাটা এক পলক দেখে বুঝে নিল, দরজার ওদিকে অবশ্যই ডাক্তারকাকার চেম্বার। তাঁর নামযুক্ত পেতলের প্লেটটা একথাই বলে দিচ্ছে দরজার নেমপ্লেটটা দেখার পর এ-ব্যাপারে তার আর কোন সন্দেহের

অবকাশই রইল না এবার ডানদিকের বিশালায়তন একটা ঘরের দিকে নাতালির নজর গেল। বুঝল, বসবার ঘর এটা। ঘরের জানালাগুলোতে মোটা কাপড়ের পর্দা লাগানো। সব ক'টা জানালাই বন্ধ! সে ঘরটা থেকেই বহুলোকের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। অনেকের এক সঙ্গে কথা বলার ফলে রীতিমত হাটুরে কোলাহলে পরিণত হয়েছে। নাতালি বুঝল, পার্টি বেশ জমে উঠেছে। এটা আগন্তুক অতিথি অভ্যাগতদের কোলাহল, উচ্ছ্বাস।

নাতালি সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলল। সিঁড়ির কাছাকাছি যেতেই তার চোখ পড়ল বসবার ঘরটার দিকে। আসলে তার চোখ দুটো কৌতূহল বশতঃই সেদিকে চলে গেল।

ঘরের ভেতরে বিশালায়তন একটা টেবিল পাতা রয়েছে. নাতালি দেখতে পেল। অতিথি-অভ্যাগতরা টেবিলটাকে ঘিরে কেউ কেউ দাঁড়িয়ে, আবার সেটাকে মাঝখানে রেখে ঘোরাফেরা করেছেন কয়েকজন। আবার কেউ-কেউ নানারকম অঙ্গভঙ্গিও করছেন।

বিশালায়তন সে টেবিলের দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে নাতালি তাকাল। দেখতে পেল, নানারকম পানীয়ের কতগুলো বোতল টেবিলের ওপর সাজানো রয়েছে।

নাতালি মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে আবার সিঁড়ির দিকে যাবার জন্য সবে গা-বাড়াতে যাবে অমনি ঘরের ভেতর থেকে আচমকা উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

নাতালি উৎকর্ণ হয়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য করার চেষ্টা করল। তার কানে এল, গৃহকর্তা ডাক্তারের আতিথেয়তা সম্বন্ধে বক্রোক্তি করে উঠেছেন। আর তা শুনেই অতিথিরা এক সঙ্গে সরবে হেসে উঠেছেন।

নাতালি লম্বা লম্বা পায়ে দরজা পথটুকু পেরিয়ে এল। অতিথিদের নজরে যাতে না পরে সেজন্যই তার এ-ব্যস্ততা, উৎকণ্ঠা।

দরজার এলাকাটুকু ডিঙিয়ে নাতালি মুহূর্তের জন্য ঘাড় ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকাল। মিস গ্লুমার ব্যাগটা হাতে নিয়ে তার পিছনে বসেছেন কিনা, বুঝার চেষ্টা করল।

হ্যাঁ, মিস গ্লুমার তার পিছনেই রয়েছেন বটে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, তার হাতে নাতালি'র ব্যাগটা এখন আর দেখতে পেল না। তার হাত

দুটো একেবারেই খালি। নাতালি ব্যাপারটা নিয়ে ভাবিত হলেও এ-প্রসঙ্গে একটা কথাও বলল না জিজ্ঞেসও করল না।

সিঁড়ির কাছে পেঁাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল নাতালি। ঘাড় ঘুরিয়ে মিস গ্লুমার—এর দিকে তাকাল। মিস গ্লুমার ছোট্ট করে, অদ্ভুত সে সরু গলায় উচ্চারণ করলেন—'এখনই কি ওপরে যেতে ইচ্ছুক?'

'—হ্যাঁ এরকমই ইচ্ছা আমার।' স্বাভাবিক স্বরেই নাতালি মিস গ্লুমার-এর কথার উত্তর দিল।

মিস গ্লুমার সবিস্ময়ে বলে উঠলেন—'সে কী! এখনই ওপরে যেতে চাইছেন কি।

'—কেন? অসুবিধা কোথায়?'

'—ওপরে যাবার আগে সবার সঙ্গে আলাপ—পরিচয় সেরে যাবেন না।'

'—না। আগেই ত বলেছি, আমি এ-ব্যাপারটা নিয়ে বড়ই বিব্রত বোধ করছি।'

'—কেন যে সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে এমন মাথা ঘামাচেছন, ভেবে পাচ্ছি না!'

নাতালি নিজের সর্বাঙ্গে এক পলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বিষন্নমুখে বললেন—'দেখছেন না, আমার চেহারা ছবি পোষাক-পরিচ্ছদের কী হাল হয়ে রয়েছে! আগে ওপরে গিয়ে স্নান সেরে, পোষাক বদলে নিতে চাচ্ছি।'

'—তা না হয় হ'ল। কিন্তু আরও ত সমস্যা আছে—'

মিস গ্লুমার-এর মুখের কথা শেষ হবার আগেই নাতালি ব'লে উঠল—'অসুবিধা, কিসের অসুবিধা বুঝছি না—ত।'

'—অসুবিধা তেমন কিছু নয়। আপনার থাকার ঘরটা এখনও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও গোছগাছ করা হয়ে ওঠে নি! আসলে ডাক্তারবাবু ত আপনার আগমনবার্তা আগেভাগে আমাদের দেন নি। আগে জানা থাকলে অসুবিধায় কিছু ছিল না। ঘরটা গুছিয়ে রাখা যেত।

'—হ্যাঁ, কাকাবাবুর কথায়ও এরকমই বুঝলাম। আমার টেলিগ্রামটা তিনি হাতে না পাওয়াতেই সব কিছু কেমন ওলটপালট হয়ে গেল।'

মিস গ্লুমার ব্যস্ততা প্রকাশ করে বললেন—'ঠিক আছে, আপনি একটু কষ্ট করুন, এখানটায় দাঁড়ান। আমি আপনার জন্য একটা ঘরের

ব্যবস্থা করে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসছি।'

'আপনি মিছে ব্যস্ত হচ্ছেন, এই মুহূর্তে ঘর না হলেও আমার চলবে। ধীরে-সুস্থে সে-ব্যবস্থা করলেও অসুবিধা হবে না। আপাততঃ হাত —মুখ ধুতে পারলে অনেকটা সতেজ হতে পারতাম।

'—আপনি একটু অপেক্ষা করুন। ডাক্তারবাবুর ফেরার সময় প্রায় হয়ে গেছে। ফিরে এলেন বলে।

'—কাকাবাবু কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসতে পারেন?'

—আমার ত তা-ই মনে হয়। 'কথাটা কোন রকমে শেষ করেই মিস গ্লুমার খপ্ করে নাতালি'র একটা হাত সজোরে চেপে ধরলেন। ব্যস, এবার রীতিমত টেনে হিঁচড়ে তাকে বিশালায়তন সে বসবার ঘরটার মধ্যে নিয়ে গেলেন। আনন্দ উচ্ছ্বাসরত অতিথি অভ্যাগতদের উদ্দেশ্যে বেশ চড়া গলায় বলতে লাগলেন উপস্থিত সবার সঙ্গে ওনার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি—ইনি হচ্ছেন মিস নাতালি রিভার্স। ডাক্তার ব্রেসগার্ডল-এর ভাইঝি ইনি। অস্ট্রেলিয়া থেকে সবে এখানে এসেছেন।

মিস গ্লুমা-এর দিকে ঘরের কারো নজর দেবার অবকাশ নেই। নাচ-গানে সবাই মাতোয়ারা। ফলে তাঁর কণ্ঠস্বর অসহায় ভাবে চাপা পড়ে গেল। তা সত্ত্বেও কয়েকজন চোখে-মুখে কৌতূহলের ছাপ এঁকে নাতালির দিকে তাকাল। তার আপাদমস্তক খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে লাগল।

বেটে খাটো নাদুস নুদুস একজন নাচ থামিয়ে নাতালি'র দিকে দু' পা এগিয়ে এল। হাতে তার একটা গ্লাস। আধগ্লাস মদ তাতে দেখা যাচ্ছে। লোকটা সবিস্ময়ে বলে উঠল—কি? কোথা থেকে এসেছেন? অস্ট্রেলিয়া থেকে? ইনি অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছেন? তবে ত অনেক পথ আসতে হয়েছে ওনাকে।

মিস গ্লুমার কি যেন বলতে চাচ্ছিলেন। ভদ্রলোক তাকে সে সুযোগ না দিয়েই নাতালি'কে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে এবার বল্লেন··· 'অস্ট্রেলিয়া? সে-ত পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে এসে হাজির হয়েছেন একেবারে অপর আর এক প্রান্তে! অনেক—অনেক পথ। তবে ওঁর নিশ্চয়ই তেষ্টায় খুবই কষ্ট হচ্ছে কিন্তু—কিন্তু—' কথা বলতে বলতে এক পলকে টেবিলটার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বল্লেন—'যাকগে, আমার গ্লাসটাই নিন।' হাতের গ্লাসটা নাতালি'র দিকে এগিয়ে ধরে একবার বল্লেন—'আমারটাই নিন। আমি না হয় অন্য আর একটা নিয়ে যাচ্ছি। নিন, ধরুণ—'

নাতালি'র দিকে হাতের গ্লাসটা আবার এগিয়ে দিলেন।

ভদ্রলোক নাতালি'কে ধন্যবাদ জানাতে যাবে, অমনি ভদ্রলোক ভিড়ের মধ্যে কোথাও উধাও হয়ে গেলেন। নাতালি ধন্যবাদ জানাবার সুযোগ না পাওয়ায় বিব্রত বোধ করতে লাগল।

নাতালি'র কানের কাছাকাছি-মুখ দিয়ে মিস গ্লুমার অনুচ্চ কন্ঠে বলতে লাগলেন—ভদ্রলোকের পরিচয়, ইনি মেজর। মেজর হ্যামিলটন। মানুষ হিসাবে খুবই ভাল। অমায়িক ব্যবহার।'

নাতালি নীরবে চাহনি মেলে মিস গ্লুমার-এর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মিস গ্লুমার ব'লে চল্‌ল—'মাত্রাতিরিক্ত পান করে একটু বেসামাল হয়ে পড়েছেন, এই না।

নাতালি মেজর হ্যামিলটন-এর দেয়া গ্লাসটা হাতে নিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। মুহূর্তে'র জন্য সেটার দিকে তাকাল। মিস গ্লুমার ইতিমধ্যে অন্যদিকে চলে গেছেন।

নাতালি'র হাতের গ্লাসটায় অনেকটা পানীয়ই রয়েছে দেখল। কিন্তু এটাকে নিয়ে সে এখন করে কি? ফেলে দেয়া ত আর যায় না। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ভাবতে লাগল, গ্লাসটাকে কোথায় সরিয়ে রাখা যায়।

ইতিমধ্যে এক ভদ্রলোক নাতালি'র দিকে এগিয়ে এলেন। খুবই উঁচা লম্বা। মোটাসোটাও বেশ। মুচকি হেসে ভদ্রলোক তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লেন—'অনুমতি পেলে গ্লাসটা নিয়ে আপনাকে অব্যাহতি দিতে পারি।' কথা বলতে-বলতে ভদ্রলোক তার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে নিলেন। অনুমতির অপেক্ষা আর করলেন না।

নাতালি মুহূর্তে'র মধ্যে ভদ্রলোকের আপাদ মস্তক একবার নিরীক্ষণ করে নিল। তাঁকে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলেই মনে হল তার। ভদ্রলোকের মাথার চুল তামাটে রঙের। কিন্তু গোঁফ জোড়া কালো। খুবই কালো। 'অশেষ ধন্যবাদ!' নাতালি সেজন্য প্রকাশ করতে গিয়ে বল্‌ল।

ভদ্রলোক উত্তর দিতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বল লেন—'এর জন্য এমন করে ধন্যবাদ জানাবার দরকার নেই। একটা কথা। মেজর সাহেব আপনার সঙ্গে যে ব্যবহার করলেন তার জন্য কিছু মনে করবেন না যেন।

'—না না মনে করার আর কি থাকতে পারে?'

'—তবু, অশোভন ঠেকলে মাফ করে দেবেন। ভদ্রলোক কিন্তু মানুষ হিসেবে যথেষ্ট সজ্জন।'

'—সে ত নিশ্চয়ই।'

'—আসল কথা কি জানেন? এখানে আমরা লৌকিকতা, সৌজন্য—প্রভৃতি নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাই না। আমাদের কাছে এসব নিছকই মামুলি ব্যাপার।'

কথা বলতে বলতে ভদ্রলোকটি আচমকা ঘাড় ঘুরিয়ে ঘরের এক কোণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

ব্যাপারটা নাতালি'র নজর এড়াল না। সে-ও তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে সে বিশেষ কোণের দিকে তাকাল।

নাতালি যেমন, তিনজন ভদ্রলোকের সঙ্গে এক মহিলা গল্পে মশগুল। অনবরত বকেই চলেছেন। কোনদিকে হুঁস মাত্র নেই তাদের। কথার ফাঁকে ফাঁকে ভদ্রলোক তিনজন থেকে থেকে সরবে হেসে উঠছেন। আর টুকরো টুকরো কথা ছুঁড়ে দিচ্ছেন!

নাতালি'র পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তামাটে কেশ ভদ্রলোকটি ঘাড় ঘুরিয়ে নাতালি'র দিকে আবার তাকালেন। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বল্‌লেন—'আজকের এ-পার্টির উদ্দেশ্য কি, বলতে পারেন?'

নাতালি'র উত্তরের অপেক্ষা না করেই নিজেই আবার বলতে লাগলেন—'মনে করতে পারেন, এটা একটা বিদায় পর্ব—মানে বিদায়—অনুষ্ঠানের কথা বলতে চাইছি। এখানে যাঁদের উপস্থিত দেখতে পাচ্ছেন তাঁরা সবাই—'

ভদ্রলোকের মুখের কথা শেষ হবার আগেই মেজর হ্যারিলটন কাঁটা-মারা বুটে গুরুগম্ভীর আওয়াজ তুলে আবার নাতালি'র কাছে ফিরে এসে ব'লে উঠলেন—'আরে, আপনি এখনও এখানে রয়েছেন দেখতে পাচ্ছি!'

মেজর হ্যামিলটন-এর হাতে একটা গ্লাস। পানীয়ে পূর্ণ। অন্য আর একটা গ্লাস।

হাসিমাখা মুখে এবার বল্‌লেন—'আবার কেমন ফিরে এলাম, দেখলেন ত। চরকি বাজির মত আবার আগের জায়গায় ঠিক ফিরে এসেছি।' কথাটা শেষ করেই সরবে হেসে নিজের রসিকতাটাকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করলেন।

নাতালি নির্বাক। কেবল ঠোঁটের কোণে হাল্কা এক টুকরো হাসি

ফুটিয়ে তুল্‌ল। সে-ও মুহূর্তের জন্য। পরমুহূর্তেই আবার মুখে পূর্ণ গাম্ভীর্য ও কৌতূহলের ছাপ ফুটিয়ে তুল্‌ল।

ভদ্রলোক হাসি থামিয়ে নাতালি'র দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। বললেন, 'আপনি অস্ট্রেলিয়া থেকে আসছেন, সেরকমই ত বল্‌লেন?'

'—হ্যাঁ। অস্ট্রেলিয়া থেকেই এসেছি।'

'—দেখুন, গ্যালিপোলিতে আমি এক সময় চাকরির তাগিদে কিছুদিন ছিলাম। সেখানে তখন অনেক অস্ট্রেলিয়ান—ভদ্রলোকের সান্নিধ্যে এসেছিলাম। সে অনেক, অনেক আগেকার কথা।'

'—তাই বুঝি?' নাতালি ছোট্ট প্রশ্ন করল।

'—হ্যাঁ। হয়ত তখন আপনার জন্মও হয় নি। অবশ্যই—'লম্বা ভদ্রলোক বিরক্তি ভরে বলে উঠলেন—'মেজর, কি সব অবান্তর কথা বলছেন মাথা ঠাণ্ডা রাখুন। মাত্রাতিরিক্ত পানীয়ই আপনাকে এসব বলাচ্ছে।'

নাতালি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লম্বা লোকটার মুখের দিকে আবার তাকাল। সেই থেকে তার মনে হচ্ছে, ভদ্রলোককে কেমন যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কবে, কোথায় যেন দেখেছে। কোন সূত্রে যেন পরিচয় হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। কিন্তু কোথায়? অনেক ভেবেও ঠিক স্মরণে আনতে পারছে না। পরমুহূর্তেই মনে হল, চোখের ভুল, অহেতুক দ্বিধা ছাড়া কিছুই নয়। কোথায় আবার এঁকে দেখছে। সে-ত ইতিপূর্বে অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে বাইরে আসে নি। তার ওপর সবে এখানে পা দিয়েছে। এ-দেশের কোন লোকের সঙ্গেই পরিচয় ঘটার সুযোগ ঘটেনি। তা সত্ত্বেও কেন যেন এ ভদ্রলোকটির কিছু গুণ খুঁজে পাচ্ছে। ভাবল, এর ওপর নির্ভর করা চলে কি? বহু ভেবেও কোন সদুত্তর খুঁজে পেল না সে। কিন্তু তবু যেন অন্তরের গোপন গভীরে একই কথা বার বার পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে, কেমন যেন চেনা চেনা, কোথায় যেন দেখেছে এঁকে, আবার মনের সঙ্গে শত বোঝাপড়া করেও কোন সদুত্তর খুঁজে পেল না। নাতালি গভীর চিন্তায় মগ্ন হল।

চিন্তার জট ছাড়াতে ছাড়াতে নাতালি অন্যমনস্ক ভাবে চোখ ফেরাতেই দেখল, ভদ্রলোক মেজর হ্যামিলটন-এর হাত থেকে লম্বা ভদ্রলোকটি পাণীয়ের গ্লাসটা একরকম জোর করেই নিয়ে নিচ্ছেন।

মেজর কিছুতেই গ্লাসটা হাতছাড়া করতে চাইছেন না। সেটাকে শক্ত করে ধরে কাতর স্বরে বলছেন—'আরে করছেন কি? করছেন কি? আর

একটু—আর মাত্র একটা গ্লাস !—এ-ই শেষ।

'—না। আর এক ফোঁটাও নয় মেজর। এমনিতেই মাত্রাতিরিক্ত হয়ে গেছে !

'—বল্‌লাম ত, আর এক গ্লাসমাত্র।

'—দয়া করে গ্লাসটা ছেড়ে দিন মেজর। আর খেলে সত্যি একেবারে বেসামাল হয়ে যাবেন। আমর কথা শুনুন, আর খাবেন না। কেন ভুলে যাচ্ছেন, আমাদের একটু পরেই যেতে হবে, আর সময় নেই।'

মেজর আবার কাতর মিনতি রাখলেন—'যেতে হবে ? তবে ত শেষ গ্লাসটা হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। পথে যেতে যেতে এক গ্লাস ত অবশ্যই চাই। গলা শুকিয়ে যাবে না বুঝি ?'

'—না। কোন অজুহাতেই—'

'—কেন যে এমন করছেন, বুঝছি না মশাই। চেয়ে দেখুন ত অন্য দশজনের দিকে। সবাই কেমন গলা পর্যন্ত রঙিন-জল চাপিয়ে নিচ্ছে !

ইতিমধ্যে তামাটে চুল লম্বাটে ভদ্রলোকটির হাতে মেজরের গ্লাসটা চলে গেছে। মেজর অসহায় দৃষ্টিতে এক পলকে গ্লাসটার দিকে তাকিয়ে নিয়ে গ্লাসটা হাত থেকে কেড়ে নেবার জন্য তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ভদ্রলোক আগে ভাগেই এরকমটা যে হবে অনুমান করছিলেন। তাই এ-ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন। মেজরের বাহুবন্ধন এড়িয়ে পাশ কাটিয়ে অন্য প্রান্তে চলে গেলেন।

নাতালি চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে নীরবে তাঁদের কাণ্ড কারখানা দেখতে লাগল।

তামাটে চুল ভদ্রলোক মুহূর্তের জন্য নাতালির দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে হাসলেন ?'

তামাটে চুল ভদ্রলোক এবার মেজরের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁকে টানতে টানতে ঘরের অন্য প্রান্তে নিয়ে গেলেন। নেশার ঝোঁকে মেজর বেসামাল। একটু-আধটু মোঁচকে-মুচড়ি দিলেও কাঁপা কাঁপা পায়ে তার সঙ্গে গেলেন। ভদ্রলোক এবার গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে কি যেন বুঝতে চেষ্টা করলেন। নেশার ঝোঁকে মেজর ঘন ঘন ঘাড় ঝাঁকিয়ে ভদ্রলোকটির কথায় প্রতিবাদ করতে লাগলেন। পরিষ্কার বুঝা গেল। মেজর স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলেছেন। একেবারে বেহুস না হলেও

মদ তাঁর সংজ্ঞা প্রায় লোপ করে দিয়েছে।

নাতালি যত দেখছে ততই তার কাছে সব কিছু কেমন যেন অবাঞ্ছিত বোধ হচ্ছে। ভাবছে, এ কী চক্করে এসে পড়লাম রে বাবা !

নাতালি বিস্ময় ও কৌতূহল মিশ্রিত দৃষ্টি মেলে ঘরের চারদিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিল। হঠাৎ চোখ পড়ল, পিয়ানোর দিকে। ওটার কাছে টুলের ওপর এক মহিলা একা বসে। তাঁর হাতে গ্লাস নেই। বৃদ্ধা না হলেও প্রৌঢ় বলা চলে। তিনি স্থির দৃষ্টিতে নাতালি'র দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। হয়ত তার উপস্থিতি মহিলাটির বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে। আর একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ-ই তাকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। সবাই ত মদের নেশায় বুঁদ হয়ে রয়েছেন। নাতালি'কে নিয়ে মাথা ঘামাবার অবকাশই কোথায় তাঁদের। আসলে তামাটে চুল ভদ্রলোক আর মেজর হ্যামিলটন ছাড়া আর কেউ-ই নাতালি'র দিকে অন্য কোন অতিথির নজরই পড়েনি, সামান্যতম কৌতূহলও কারো নেই।

প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলাটি নাতালি'র দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে তার খুব খারাপ লাগল। কেমন একটু অস্বস্তি বোধও করতে লাগল সে। এ মুহূর্তে তার মনের কোনে একটা কথাই বার বার উঁকি দিচ্ছে, সে যেন এখানে অবাঞ্ছিতা অনাহূতাও বটে।

নাতালি বেশীক্ষণ প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলাটির দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না। অনন্যোপায় হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। এবার তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সে-মহিলাটির দিকে যিনি একই সঙ্গে তিন-তিনজন পুরুষের সঙ্গে সেই থেকে এক নাগাড়ে কথা বলে চলেছেন। মহিলাটির পোষাকের বিশেষত্বটুকু তার নজর এড়াল না। জামাটা খুবই নীচু গলার। নিজের পোষাকের দিকে আচমকা চোখ পড়ল নাতালি'র। পোষাক বদলাবার প্রয়োজনটুকু আবার তার মনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও এ মুহূর্তে তা আর সম্ভব হবার নয় ! কারণ, তার ব্যাগটা মিস গ্লুমার কোথায় যেন সরিয়ে ফেলেছেন।

নাতালি পিছন ফিরে তাকাল। মিস গ্লুমার-এর খোঁজ করল। তাঁকে দেখতে পেল না। এরই মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি।

মিস গ্লুমার'কে পাশে না দেখতে পেয়ে নাতালি আরও অসহায় বোধ করল। ঘরের সর্বত্র একবার চোখ বুলিয়ে নিল। না, কোথাও তাঁকে

দেখতে পেল না। আশ্চর্য ব্যাপার ত! এটুকু সময়ের মধ্যেই তিনি কোথাও উঠে গেলেন! ব্যস্ত-পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। বাইরের দিকে গলা বাড়িয়ে তাঁকে খুঁজল। না, সিঁড়ির দিকটায় নেই। লম্বা বারান্দার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত দেখে নিল। না, তবে কি, হ্যাঁ, তার মনে পড়েছে, তিনি ঘরের ব্যবস্থা করতে ওপর তলায়ই গেছেন। একটু আগে এরকম ইঙ্গিতই ত দিয়েছিলেন।

হলঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল নাতালি। লম্বা বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গেল সিঁড়িটার দিকে। সিঁড়ির গোড়ায় এসে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওপর তলায় উঠে যাবে কিনা ভাবল, কিন্তু ভরসা হ'ল না। উপায়ান্তর না দেখে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে মিস গ্লুমার-এর নাম ধরে ডাকাডাকি করল। কেউ-ই সাড়া দিল না।

আরও গলা চড়িয়ে ডাকল—'মিস গ্লুমার! মিস গ্লুমার!' না। এবারও কেউ সাড়া দিল না।

নাতালি'র কাছে ব্যাপারটা খুবই বিস্ময়ের উদ্রেক করল। আপন মনে বলে উঠল—'কী ঝকমারিতেই না পড়া গেল রে বাবা! কাকাবাবু ফিরে না আসা পর্যন্ত একমাত্র তিনিই ত নিদানের সম্বল। সে ভাবল বরাতে যা আছে পরে দেখা যাবে। ওপর তলায়ই উঠে যাবে সে, সবে প্রথম ধাপটায় পা রাখতে যাবে অমনি অদূরবর্তী একটা ঘরের দরজা সামান্য ফাঁক দেখতে পেল। তবে খুবই সামান্য ফাঁক। নাতালি কর্তব্য নির্দ্ধারণ করার আগেই দরজাটা আচমকা খুলে গেল।

মিস গ্লুমার পিছু-হেঁটে খোলা দরজাটা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর হাতে বেশ বড়সড় কি যেন একটা রয়েছে নাতালি দেখল। ভাল করে নজর দিতেই নাতালি সচকিত হয়ে পড়ল। দেখল তাঁর হাতে ইয়া বড় একটা কাঁচি। চকচক করছে।

মিস গ্লুমার ঘর থেকে বেরিয়ে ত্রস্ত পায়ে হাঁটতে লাগলেন। নাতালি তাঁকে ডাকবে ভাবল। কিন্তু সে-সুযোগ পেল না। ইতিমধ্যে তিনি অনেকখানি এগিয়ে গেছেন।

নাতালি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল না। লম্বা-লম্বা পায়ে তাঁকে অনুসরণ করল। প্রায় ছুটতে ছুটতে সে একটা খোলা-দরজার সামনে হাজির হ'ল। এ-ঘরটাকেই সে একটু আগে কাকাবাবুর চেম্বার বলে ভেবেছিল। তখন ঘরের দরজা বন্ধ দেখে গিয়েছিল। এখন আবার

দেখছে, খোলা। কিন্তু ঘরটা খুলল কে? তার কাকবাবুত এখনও ফেরেন নি বোধ হয়। নইলে নাতালির উপস্থিতির কথা শুনে নিশ্চয়ই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে তার কাছে আসতেন! তবে? হয়ত তিনি মিনিট কয়েকের মধ্যেই বাড়ি ফিরবেন। এসেই নিজের ঘরে বসবেন। তাই হয়ত ঘরের দরজাটা খুলে দেওয়া হয়েছে। পরমুহূর্তেই ভাবল, নাকি তারই জন্য ঘরটা খোলা হয়েছে। তার কাকাবাবু না ফেরা পর্যন্ত, তার জন্য ঘরের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত এখানেই তার বসার ব্যবস্থা করছেন মিস গ্লুমার? সবই নাতালির অনুমানের ব্যাপার। নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তেই সে পেঁছিতে পারল না।

নাতালি তার কাকাবাবুর চেম্বারের দরজায় দাঁড়িয়ে বিস্ময় ভরা চোখে ঘরের ভিতরটা দেখতে লাগল। ঘরটা মোটামুটি ছোটই বলা চলে। কয়েকটা আলমারি সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো। সব ক'টা আলমারিই বইয়ে ঠাঁসা। অধিকাংশ বই-ই মোটা ও বাঁধানো। আর যা কিছু আসবাবপত্র রয়েছে সবই সাবেকী ধরণের। চামড়া দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। একটা ব্যাপার তার কাছে কেমন অবাক লাগল। আসবাবপত্র সবই আলমারিগুলোর কাছে জড়ো করে রাখা হয়েছে। এর কারণ কিছু ভেবে পেল না সে। রোগীদের বসার বেঞ্চটা দেওয়ালের একেবারে গা-ঘেঁষে রেখে দেওয়া হয়েছে।

আর সেটার সামনে বেশ বড়সড় একটা টেবিল। মেহগনি কাঠের তৈরী। দেখে মনে হয় খুবই মজবুত। টেবিলটার ওপরে কেবলমাত্র একটা টেলিফোন রয়েছে। ব্যাপারটা নাতালির খুবই বিস্ময়ের উদ্রেক করল। ডাক্তারের টেবিল কখনো এমন খালি থাকতে পারে, বিশ্বাসই করা যায় না।

বিশেষ করে একটা ব্যাপার নাতালির চোখে অদ্ভুত ঠেকল। ফোনটা থেকে মেটে রঙের একটা তার—তারের ফাঁস বেরিয়ে সরীসৃপের চলনভঙ্গির মত হেলেদুলে এগিয়ে গেছে। বিচিত্র ভঙ্গিমায় ঝুলছে। নাতালি বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে সেটার দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল।

ফোনের গা থেকে বেরিয়ে যাওয়া ব্যাপারটাকে নাতালি কিছুতেই স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারছে না। বরং নিরবচ্ছিন্ন অস্থিরতা তাকে পেয়ে বসল। পুরো ব্যাপারটাই তার কাছে অসংগতিপূর্ণ মনে হ'ল। হঠাৎ

করে গানের তাল ভঙ্গ হয়ে গেলে যা হয়ে থাকে। কথাটা ভাবতে গিয়ে নাতালি বারবার চমকে উঠতে লাগল। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তার।

নাতালি চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়েই সাধ্যমত ঘরের ভিতরের দিকে ঝুঁকে ব্যাপারটাকে আরও ভালভাবে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ যাতে না থাকে ঠিক তেমনিভাবেই টেলিফোনের তারের ব্যাপারটা দেখার চেষ্টা করল। হঠাৎ যন্ত্রচালিতের মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখে-মুখে বিস্ময়ের ছাপ এঁকে আপন মনে বলে উঠল--'একী! টেলিফোনের তারটা যে কেটে ফেলা হয়েছে। কে কাটল? কেনই বা কাটল টেলিফোনের তারটা?

টেলিফোনের কাটা তারটা অবচেতন মনকে বার বার আন্দোলিত করতে লাগল। তার বুকের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তির ঝড় বয়ে চল্‌ল। মাথা ঝিম্‌ঝিম করতে লাগল। সে চমকে উঠে আবার স্বগতোক্তি করল —'কে কাটল! কে তারটাকে কাটল? টেলিফোনের তারটা কেন কাটল? এমন কি দুরভিসন্ধি রয়েছে এ-কাজের পিছনে?

নাতালির মনে পড়েছে। একটু আগেই মিস গ্লুমারকে বেশ বড় সড় একটা কাঁচি নিয়ে ছুটোছুটি করতে দেখেছিল বটে। সে নিঃসন্দেহ হল মিস গ্লুমার-এরই কাজ বটে এটা। কি উদ্দেশ্যে? কেনই বা কেটেছেন?

টেলিফোনের তারটা কেটে এ-বাড়ির সঙ্গে বাইরের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার উদ্দেশেই কাজটা করা হয়েছে। কিন্তু কেন? নাতালি যখন ফোনের তারটার ব্যাপার নিয়ে আকাশ-পাতাল ভেবে চলেছে ঠিক তখনই তামাটে চুলের লম্বাটে ভদ্রলোকটি গুটিগুটি নাতালি'র পিছনে এসে দাঁড়ালেন। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে নীরবে নাতালিকে দেখতে লাগলেন। তার অদ্ভুত দুশ্চিন্তার কারণ সম্বন্ধে আঁচ করে নিয়ে বল্‌লেন —'টেলিফোনের তারের ব্যাপারটা আপনাকে বড়ই ভাবিয়ে তুলেছে, ঠিক বলি নি?

নাতালি আচমকা ঘাড় ঘুরিয়ে তাঁর দিকে তাকাল।

নাতালি'কে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ভদ্রলোক আবার বলতে লাগলেন 'আপনার অনুমান অভ্রান্ত। টেলিফোনের তারটা কেটেই দেওয়া হয়েছে। আসলে ফোনটার আর দরকার হবে না। যা কিছু দরকার ছিল, মিটে গেছে।

নাতালি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালাম। ভদ্রলোক নাতালি'র প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা না করেই আবার বলতে লাগলেন—'সত্যি বলছি, টেলিফোনটার প্রয়োজন মিটে গেছে। তাই ইচ্ছে করেই—।

ভদ্রলোকটির কথা শেষ হবার আগেই নাতালি সচকিত হয়ে বলে উঠল -'কেন? প্রয়োজন মিটে গেছে—বুঝলাম না।

ম্লান হেসে ভদ্রলোক এবার বল্‌লেন—দেখুন, আমি কিন্তু আগেই আপনাকে আজকের অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যের কথা বলেছিলাম, মনে পড়ছে?

নাতালি আবার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিকে তাকাল।

ভদ্রলোক মুখে ছোট্ট হাসির রেখাটুকু অক্ষুণ্ণ রেখেই নাতালি'র জিজ্ঞাসা নিরসনের চেষ্টা করলেন—'মনে পড়ছে না? আপনাকে যে বলেছিলাম আজকের এ-অনুষ্ঠানটা মূলতঃ বিদায় অনুষ্টান।'

কথাটা নাতালি'র দিকে ছুঁড়ে দিয়েই ভদ্রলোক হেসে উঠলেন।

নাতালি'র কাছে ব্যাপারটা এবার ছবির মত পরিষ্কার হয়ে গেল। এবার বুঝল, ভদ্রলোকটিকে দেখার পর থেকে তার মনে বার বার কেন খটকা লাগছিল। কেন মনে হচ্ছিল, ভদ্রলোক যেন তার পরিচিত। তাঁকে দেখে অবশ্যই নয়। তাঁর হাসি আর মনের কোনে এরকম সন্দেহের বীজ বারবার দানা-বেঁধে উঠছিল হাসি? হ্যাঁ, ভদ্রলোকের অদ্ভুত হাসিটাকে ফোনেও এরকমই অদ্ভুত ও রহস্যময় মনে হয়েছিল তাঁর কাছে। স্টেশনের টেলিফোন বুথে দাঁড়িয়ে ফোনে তার কাকাবাবু ডক্টর ব্রেসগার্ডল-এর হাসির সে-স্বরটা যেন এখনও তার কানে লেগে রয়েছে।

একবার নয়। নাতালি'র কাকাবাবু তার সঙ্গে কথা বলার সময় একাধিকবার সরবে ও খুবই অদ্ভুত স্বরে হেসেছিলেন। তবে কি তাবে এই তামাটে চুল দীর্ঘদেহী এই ভদ্রলোকই তার কাকাবাবু, ডক্টর ব্রেসগার্ডল নাতালিকে কাছে পেয়েও, চিনতে পেরেও তার সঙ্গে একটু মজা করছেন? নাতালি তাঁকে চিনতে পারে কিনা, পরীক্ষা করে দেখছে? এরকমটা হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। আদরের ভাইঝিকে নিয়ে একটু-আধটু মজা ত করাই চলে। নাতালি নিঃসন্দেহ হ'ল, এ-ভদ্র লোকটিই তার বহু বাঞ্ছিত কাকাবাবু।

নাতালি এবার সাহসে ভর করে ভদ্রলোকটিকে লক্ষ্য করে কথাটি ছুঁড়ে দিল—'আপনিই কি—আপনি নিশ্চয়ই আমাকে নিয়ে মজা করছেন।

'—মজা ? কিসের মজা ? কেনই বা আপনাকে নিয়ে মজা করতে যাব।'

'—আপনিই আমার কাকা। ডাক্তার ব্রেসগার্ডল, যার ভরসায় আমি এখানে ছুটে এসেছি।'

'—আপনি ভুল করছেন।' ভদ্রলোক দৃঢ়তার সঙ্গে বল্লেন—আপনি মোটেই ঠিক বল্ছেন না।'

—'আমি কিন্তু তবু বলছি, আপনিই ডক্টর ব্রেসগার্ডল, আমার কাকা।' ভদ্রলোকটি আবারও বাধা দিলেন—'সত্যি বলেননি, আপনি ভুল করছেন। আসল ব্যাপারটা বলছি তবে শুনুন—আপনি যে এখানে আসছেন আমাদের কারোরই জানা ছিল না।

নাতালি বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ভদ্রলোকটি বলে চল্লেন—'বিশ্বাস করুন, সত্যি বলছি, আপনার আসার কথা আমাদের বিন্দু বিসর্গও জানা ছিল না। আপনার ফোনটা যখন এল তখন আমরা এ-বাড়ি ছেড়ে যাবার উদ্দ্যোগ নিচ্ছিলাম।

'—ঠিক বুঝলাম না।'

'—আপনার ফোনটা এল। ধরা দরকার। ধরা হলও। আবার আপনার কথার উত্তরে কিছু ত বলা দরকার। অনন্যোপায় হয়েই আপনার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে হ'ল। আপনার কথার উত্তরও দিতে হ'ল আমাকে।

ভদ্রলোক নাতালি'র দিকে কথা ক'টি ছুঁড়ে দিয়ে নীরব হলেন। ঘরের মধ্যে নেমে এল নীরবতা। অখণ্ড নীরবতা। একটা পিন ফেল্লেও যেন শোনা যায়, ঠিক এরকমই স্তব্ধতা। ভদ্রলোকের কথায় নাতালি'র সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল। মুখ শুকিয়ে চুন। গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে এল। কথা বলার মত সামান্যতম শক্তিও যেন তার নেই। কোন অদৃশ্য শক্তি যেন তার কণ্ঠনালী সজোরে চেপে ধরেছে।

নাতালি বার-কয়েক ঢোক গিলে গলাটি একটু ভিজিয়ে নেবার চেষ্টা করল। একটু বল সঞ্চয় করে নীরবতা ভঙ্গ করল—'তবে আপনিই আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন, তা-ই ত বল্লেন ?

'—হ্যাঁ। আমিই বলেছিলাম।'

'—আপনি তবে আমার কাকা নন ? ডক্টর ব্রেসগার্ডল নন আপনি ?

—'অবশ্যই নয়। ডক্টর ব্রেসগার্ডল হতে যাব কেন আমি।'

'—ভাল কথা। আমার কাকা কোথায়?'

'—আছেন।'

'—আছেন? কোথায়? কোথায় আছেন?'

ভদ্রলোকটি নির্দ্বিধায় জবাব দিলেন—'আছেন। এ-ঘরেই তিনি তাঁকে পেয়ে যাবেন।'

'—সে কী! এ-ঘরেই তিনি রয়েছেন। কে? কোথায় তিনি। কে আমার কাকা ডক্টর ব্রেসগার্ডল?

এখানকার অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা দেখে নাতালি সত্যিই হতভম্ব হয়ে গেল। কি করবে। এ-মুহূর্তে কি-ইবা তার কর্তব্য ভেবে উঠতে পারল না।

ভদ্রলোকটি এবার বল্‌লেন—'আপনার কাকা, মানে ডক্টর ব্রেসগার্ডলকে চাচ্ছেন ত?'

'—হ্যাঁ। কোথায়—কোথায় তিনি?'

'—ঐ যে, ঐখানে রয়েছেন।'

নাতালি অত্যুগ্র আগ্রহান্বিত হয়ে তামাটে চুল ও লম্বাটে ভদ্রলোকের আর রোগীদের জন্য রক্ষিত বেঞ্চটার ফাঁক দিয়ে দেয়ালের দিকে তাকাবার চেষ্টা করল। হেলে—বেঁকে রীতিমত কসরৎ করে তাকে দেয়ালের কাছের ফাঁকা জায়গাটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হ'ল।

ভদ্রলোকটির তর্জনি নির্দেশিত স্থানে চোখ পড়তেই নাতালি চমকে উঠে বল্‌ল—'কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য! কী বীভৎস ব্যাপার! একী নরক, নাকি—'নাতালি আর বলতে পারল না! আকস্মিক ভয়-ভীতিতে দু'হাতে চোখ দুটো ঢেকে ফেল্‌ল। মুহূর্তে নাতালির শরীরের সব ক'টা স্নায়ু এক সঙ্গে সচকিত হয়ে উঠল। ঘাড়ের কাছ থেকে কি যেন একটা ঠাণ্ডা জিনিস দ্রুত নীচের দিকে নেমে গেল। সত্যি এমন নারকীয় দৃশ্য মানুষের পক্ষে চোখের ওপর দেখে সুস্থ-স্বাভাবিক থাকা সম্ভব নয়।

নাতালি'র মনের অবস্থা পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোকটির বুঝতে বাকী রইল না। কিন্তু কিভাবে ব্যাপারটাকে নাতালির কাছে তুলে ধরবে ভাবতে লাগলেন। মুহূর্তের মধ্যে মনস্থির করে নিলেন। ক্ষণিক ইতস্ততের পর বল্‌লেন—'দেখুন, স্বীকার করছি, ব্যাপারটা খুবই বীভৎস। আপনার পক্ষে অবশ্যই ভয়ঙ্কর। অসহনীয় ত বটেই।

নাতালি চোখের তারায় আতঙ্কের ছাপ এঁকে আবার সে বীভৎস

কদাকার দৃশ্যটির দিকে তাকাল। পরমুহূর্তেই ঘাড় ঘুরিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোকটির দিকে দৃষ্টি ফেরাল।

ভদ্রলোকটি বলে চল্‌লেন—'দেখুন, ঘটনাটা বাস্তবিকই বীভৎস!—কদর্য! আপনার কাছে ত বটেই। আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা, জানি না। ঘটনাটা কিন্তু সত্যি আকস্মিক ভাবেই ঘটে গেছে। আসলে সুযোগটাও এসে গেল হঠাৎই। একেবারেই অপ্রত্যাশিতভাবে। আর ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতেও বেশী সময় লাগল না।—তারপর—হ্যাঁ, তারপরই তারা পার্টিতে মেতে গেল। গ্লাসের পর গ্লাস মদ গলায় ঢালতে লাগল। কী পরিমাণে মদ যে এক একজন গিলেছে, বলে বুঝানো যাবে না! আর একমাত্র এ-কারণেই আমাদের এত দেরী হয়ে গেল। তাদের জন্যই আমরাও আটকা পড়ে গেলাম এখানে। নইলে অনেক আগেই অন্ততঃ আমরা ক'জন এ-জায়গা ছেড়ে চলে যেতাম। আপনার মুখোমুখি অন্ততঃ আমাদের হতে হত না।'

কথা ক'টা বলে তামাটে চুল ভদ্রলোক চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার বল্‌লেন—আসলে ব্যাপারটা ঘটনাচক্রে ঘটে গেল!'

ভদ্রলোক খুবই চড়া গলায় কথা ক'টা বল্‌লেন। ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে তাঁর কণ্ঠস্বর ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঘরের দেয়ালে বাধা পেয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে চল্‌ল।

পার্টির হৈ হট্টগোল অনেক আগেই থেমে গেছে। নিমন্ত্রিত অতিথিরা মুখে লুপ এঁটে দিয়েছেন। কারো কারো হাতে এখনও পানীয়ের গ্লাস এখনও ধরা রয়েছে। অনেকের গ্লাসই শূণ্য।

তামাটে চুল ভদ্রলোকের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে সবাই শঙ্কিত মনে বৈঠকখানার দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। মুখে জিজ্ঞাসার ছাপ এঁকে নাতালির মুখের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন। হ্যাঁ, তারা নাতালি'কেই দেখছেন। কি যেন বুঝতে চেষ্টা করছেন অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে। সবার চোখের তারা অত্যুজ্জ্বল। অস্বাভাবিক চক্‌-চক্‌ করছে।

ভিড় ঠেলে এক মহিলা নাতালির দিকে এগিয়ে এলেন। কে এই মহিলা? নাতালি'র খুবই পরিচিতা এ-মহিলাটি। হ্যাঁ, পরিচিতা ত বটেই। স্টেশন থেকে গাড়ীতে একসঙ্গে এতটা পথ এসেছে। এ-বাড়িতে এসেও দীর্ঘ সময় এঁর সঙ্গে পাশাপাশি ও মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা

বলেছে। হ্যাঁ, ইনি মিস গ্লুমারই বটে।

মিস গ্লুমার ভিড় ঠেলে ব্যস্ত-পায়ে নাতালি'র দিকে এগিয়ে এলেন। আগের আধ-ময়লা কোঁচকানো পোষাকই তাঁর গায়ে রয়েছে। তবে নতুন যেটুকু নজরে পড়ছে তা হল গায়ে জড়ানো একটা লোমশ চাঁদর! পশুলোমের চাঁদর। পোষাকের যা ছিরি, তার সঙ্গে চাঁদরটা একেবারে বে-খাপ্পা।

মিস গ্লুমার নাতালির কাছে এসে দাঁড়ালেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লেন—পেয়েছেন?'

নাতালি নীরব চাহনি মেলে তাঁর মুখের দিকে তাকাল।

মিস গ্লুমার এবার বল্লেন—'আপনার কাকার কথা বলছি। পেয়েছেন কি? আপনার কাকাকে পেয়েছেন?'

নাতালির মধ্যে অস্থিরতা ফুটে উঠল। গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছে তার। সে চেঁচিয়ে উঠল—'এসব কি! কি ব্যাপার এসব, বুঝছি না-ত রীতিমত বীভৎস নারকীয় ব্যাপার! এর একটা বিহিত করতেই হবে। এমন পৈশাচিক কাণ্ডকারখানা—বিহিত করতেই হবে আপনাকে।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে গ্লুমার বল্লেন—'পৈশাচিক ব্যাপার? এতেই এমন মুষরে পড়ছেন! তবু ত অন্য লোকদের কাণ্ডকারখানা এখনও আপনার চোখে পড়েনি। ভয়ঙ্কর সে সব দৃশ্য দেখলে ত আপনি সংজ্ঞাই হারিয়ে ফেলবেন।'

নাতালি ভয়-বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

মিস গ্লুমার বলে চল্ল—'তবুত আপনি সে সব কাণ্ডকারখানা এখনও দেখেনই নি। আপনার কাকাবাবুর সহকর্মী আর তাঁর অধীনস্থ কর্মীদের কাণ্ডকারখানার কথা বলছি। এখানে নয়। তাদের কীর্ত্তিকলাপের পরিচয় পেতে হলে আপনাকে যেতে হবে দোতলার হল-ঘরে। কী বীভৎস কদাকার দৃশ্য। আপনার গায়ের রোম খাড়া হয়ে যাবে!' তাচ্ছিল্যের হাসি মুখে ফুটিয়ে তুলে এবার বল্লেন—'হুঃ! একজনকে দেখেই ভয়ে এমন কুঁকড়ে যাচ্ছেন! এতগুলো লোকের বীভৎস দেহ দেখলে ত আপনি সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়বেন দেখছি!'

এ-অবসরে পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। যেসব পুরুষ ও মহিলা উৎসাহিত হয়ে বৈঠকখানার দরজায় এসে জড়ো হয়েছিলেন তাঁরা ততক্ষণে গুটিগুটি সরে পড়েছেন। বেশী দূরে নয়। ঘরের ভেতরে ঢুকে

মিস প্লুমার-এর পিছনে দাঁড়িয়ে রইলেন সবাই। কারো মুখে টু-শব্দটি পর্যন্ত নেই। মুখে কলুপ এঁটে দিয়েছেন যেন। সবাই নিষ্পলক চোখে নাতালির দিকে তাকিয়ে। তাঁদের চোখের মণিগুলো অত্যুজ্জ্বল। ঠিকরে আগুন বেরোচ্ছে যেন।

নাতালি বার কয়েক ঢোক গিলে নিজেকে একটু সামলে নেবার চেষ্টা করল। সাহসে ভর করে কোন রকমে উচ্চারণ করল—'কী ভয়ংকর ব্যাপার! এযে বদ্ধ পাগলের কাণ্ড! সুস্থ-স্বাভাবিক কোন মানুষের পক্ষে এমন জঘন্য কাজ কিছুতেই সম্ভব নয়!

মিস প্লুমার নীরবে ম্লান হাসলেন।

নাতালি বলে চলল—'অবশ্যই এমন সব বিকৃত মস্তিষ্ক লোক যদি সমাজে থাকে তবে ত পুরো সমাজই নরকে পরিণত হয়ে যাবে। এধরণের লোকদের একমাত্র যোগ্য স্থান পাগলাগারদ। যত শীঘ্র সম্ভব হাত-পা বেঁধে—।

মিস প্লুমার অধিকতর ব্যস্ত দেখা গেল। তিনি লম্বা-লম্বা পায়ে এগিয়ে গিয়ে ঝট্ করে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। এবার তেমনি ব্যস্ততার সঙ্গে তালা লাগিয়ে দিলেন দরজাটায়। উপস্থিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা এতক্ষণ চিত্রার্পিতের মত তাঁর পিছনে যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁরা এবার তৎপর হয়ে উঠলেন। ক্রমে একপা দু'পা করে এগিয়ে এলেন।

নাতালির মুখের বিস্ময়ের ছাপটুকু অধিকতর গাঢ় হয়ে উঠল।

মিস প্লুমার ম্লান হাসলেন। এবার কেটে কেটে বলতে লাগলেন—'দেখুন, আপনি যথার্থই বলেছেন। এখানে বিকৃত মস্তিষ্ক। আর আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেটা কিন্তু পাগলাগারদই বটে। আমরা? হ্যাঁ, আমরা সবাই এক একজন—

ইতিমধ্যে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা পুরুষ ও মহিলার দল নাতালির দিকে আর—আর অনেকটা এগিয়ে এসেছে। নাতালি আতঙ্কে শিউরে উঠল। অবাঞ্ছিত ভয়-ভীতি তার মন-প্রাণ জুড়ে বসল। ভয়ে-আতঙ্কে শরীর অবশ হয়ে আসতে লাগল। বিকট আর্তনাদ করে দু'হাতে চোখ ঢাকল।

———

পাথরের গায়ে শরীর এলিয়ে দিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সময় কাটাচ্ছিলাম। আধো মুখ আধো জাগরণ যাকে বলে। আচমকা তন্দ্রা চটে গেল। লাইকা-লাইকার কর্কশ কণ্ঠস্বর কানে যেতেই চোখ দুটো বন্ধ রেখেই ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক ফিরলাম। মৃদুস্বরে ধমক দিয়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। বারদু'-তিন ধমক ধামক দিতেই সে যেন গর্জন থামিয়ে একটু প্রকৃতিস্থ হ'ল।

আবার শরীর এলিয়ে দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঘুম ত আর আমার পিতৃপুরুষের চাকর নয় যে ডাকামাত্রই সুড়সুড় করে এসে আমার চোখে ভর করবে। ব্যর্থ প্রয়াস। লাইকার আকস্মিক

চেঁচামেচি আমাকে ভাবিয়ে তুলল। অকারণে সে এখন তর্জন গর্জন করতে যাবে কেন? কিসের যেন একটা অবাঞ্ছিত ভয়—ভীতি আমার মধ্যে ভর করল। নিজের ব্যবহারে নিজেই বিস্মিত হলাম। হঠাৎ কেন এমনটা হ'ল? চোখ মেলতেও সাহস হ'ল না। ভাবলাম, চোখ মেললেই বুঝি কিছু একটা অঘটন ঘটে যাবে। অনন্যোপায় হয়ে চোখ বন্ধ করে সিঁটকে লেগে পড়ে রইলাম অনেকক্ষণ। অবাঞ্ছিত ভয় ও আতঙ্ক ক্রমে আমাকে গ্রাস করতে লাগল।

সত্যি আমার সব কিছু যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। লাইকা আর আমার মধ্যে সে বিস্তর ব্যবধান কিছুতেই আমার মাথায় আসছে না। আর পাঁচ বছর আগে আমাদের মধ্যে সে পরিচয়ের বন্ধন ছিল হৃদ্যতার আকর্ষণ ছিল আছ তা ছিন্ন করে কোটি কোটি মাইল দূরে সে চলে গেছে। অতএব তার উপস্থিতি অনুমান করা নিছক পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কি-ই বা হতে পারে? নিজের ব্যবহারে নিজেকে ধিক্কার দিলাম। লজ্জিতও কম হলাম না। নিজের প্রতি ক্ষুব্ধ হলাম। চোখ মেলে তাকালাম। অতীত কল্পনা থেকে নিজেকে বর্তমানের বাস্তব জগতে ফিরিয়ে আনার জন্য সচেষ্ট হলাম।

সোজা হয়ে বসে চারিদিকে একবারটি চোখের মণি দুটোকে বুলিয়ে নিলাম। না, সর্বত্র ফাঁকাই রয়েছে আগের মতই। তবে? আমি চোখ বন্ধ করে অতীত স্মৃতি মন্থন করতে লাগলাম তেমনি চোখ বন্ধ করে। তারপর? তারপর কখন যে তন্দ্রা নেমে এসেছিল বুঝতেই পারি নি। বর্তমানের যন্ত্রণাদগ্ধ পরিস্থিতির হাত থেকে নিজেকে কিছু সময়ের জন্য মুক্ত করতে চেষ্টা করলাম। হ'লও তা-ই।

লাইকা। আমার প্রিয় কুকুর লাইকা।

লাইকার সঙ্গে আমার পরিচয়ের প্রথম মুহূর্তটা আজও আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে ছবির মত জ্বলজ্বল করছে। শত চেষ্টা করেও কোনদিন সে-বিশেষ মুহূর্তটার কথা মন থেকে মুছে ফেলতে পারব না। কোনদিন না। কিছুতেই না।

সেটা ছিল গ্রীষ্মের এক দুপুর। চারদিক নিষ্ঠুর সূর্যের প্রখর তেজে খাঁ খাঁ করছে। চোখ মেলে বেশীক্ষণ একভাবে তাকিয়ে থাকলে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল। বাস্তবিক এক অসহনীয় পরিস্থিতি। আমি মোটর নিয়ে পালামৌয়ের দিকে যাচ্ছিলাম। আচমকা গাড়ী দাঁড়

করাতেই হ'ল। দেখি, রাস্তার ওপর ছোট্ট একটা কুকুর-শাবক পড়ে রয়েছে।

আমি গাড়ী থেকে নেমে ভাগ্যহত কুকুর শাবকটার দিকে এগিয়ে যেতে সে ছোট ছোট চোখ দুটো মেলে আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। অস্ফুট কুঁৎ-কুঁৎ শব্দ করছিল আর পা চারটেকে সামনের দিকে বার বার ছুঁড়ে দিচ্ছিল। আর একটু এগিয়ে গিয়ে তার দিকে হাত বাড়াতে গিয়েও আচমকা হাত দুটোকে টেনে নিলাম। মুহূর্তের জন্য আমার মনের কোণে কেমন একটা ঘৃণা চাঙা হয়ে উঠল। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? পরমুহূর্তেই অসহায় কুকুর শাবকটার জন্য স্নেহ-মায়া-মমতায় আমি উদ্বেল হয়ে পড়লাম। যন্ত্রচালিতের মত হাত দুটো তার দিকে বাড়িয়ে রাস্তা থেকে তুলে কোলে নিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম।

আর একটু হলেই অদৃষ্ট বিড়ম্বিত কুকুর-শাবকটা মোটরের চাকার তলায় পড়ে থ্যাতলে যেত। সামান্য একটা পথের বেওয়ারিশ কুকুর-শাবকের জন্য কে-ই ভেবে চিন্তে গাড়ী চালাতে যাবে। পথে জন্ম, মৃত্যুও পথেই হবে। আর এটাই ত স্বাভাবিক।

আমি দু'হাতের বন্ধনীর মধ্যে কুকুর-শাবকটাকে নিয়ে গাড়ীর পিছনদিকে চলে গেলাম। গাড়ীটা সদ্য কেনা! এখনও গায়ের নতুন গন্ধটা যায় নি। আদিখ্যেতা দেখতে গিয়ে, মায়ামমতার আড়ম্বর ভুলে তাকে সীটে নিয়ে বসিয়ে দিলে যাচ্ছে তাই কিছু একটা করে ফেলতে কতক্ষণ। দরকার নেই বাবা এত সোহাগ দেখিয়ে। অনেক ভেবেচিন্তে পিছনের কেরিয়ারের ডালা তুলে সেটাকে ভেতরে চালান দিয়ে দিলাম।

ব্যস, আমি এবার গাড়ীতে উঠে গেলাম। শক্ত-হাতে স্টিয়ারিং ধরলাম। এবার দিলাম উল্কার বেগে গাড়ী ছুটিয়ে। ভাবলাম, পথে নির্ভরযোগ্য কাউকে পেলে আমার সঙ্গী কুকুর-শাবকটাকে তার হাতে তুলে দিয়ে কর্তব্য সম্পাদন করব। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। আমি গন্তব্যস্থল জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বাসস্থল, মনস্টোরীর সামনে পেঁাছে গেলাম। সজোরে ব্রেক কষে গাড়ী দাঁড় করালাম।

মহাসমস্যায় পড়া গেল ত। পিছনে গিয়ে ক্যারিয়ারের ডালাটা খুলতেই দেখি কুকুর-শাবকটা সামনের পা দুটোর ওপর ভর দিয়ে পিছনের পা দুটোর ওপর বসে। মৃদু মৃদু লেজ নাড়ছে। আমি তার দিকে

হাত বাড়াতেই করুণস্বরে কুঁ্য কুঁ্যং করে উঠল। হাত দুটো সরিয়ে এনে কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে নীরবে মুহূর্তকাল তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ব্যস, আর দেখতে হ'ল না। মায়ার ফাঁদে জড়িয়ে পড়লাম। তার চোখ দুটোর মধ্যে এমন মায়া-কাজল মাখানো ছিল যা অগ্রাহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হ'ল না। শত চেষ্টা করেও তাকে কেরিয়ার থেকে বের করে প্রহরীর হাতে তুলে দিতে পারলাম না। যত বারই হাত বাড়াতে চেষ্টা করেছি বিবেকের দংশনে জর্জরিত হতে হয়েছে। পারলাম না, ছোট কুকুর-শাবকটার কাছে আমি হেরে গেলাম।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেরিয়ারের ডালাটা আবার বন্ধ করে দিলাম। লাইকা যতই বড় হতে লাগল ততই তার দুষ্টমি নতুন নতুন রূপ নিয়ে প্রকাশ পেতে লাগল। একদিন দেখি, আমার মোজাটা নিয়ে সে দাঁতের শক্তি-পরীক্ষায় মেতেছে। আর একদিন চোখে পড়ল, চেয়ারের ওপর উঠে টেবিল থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পত্রিকার পাতাগুলো নিয়ে কসরৎ দেখাচ্ছে। মহাফাঁপড়ে পড়া গেল ত!

পড়াশোনার ফাঁকে লাইকা'র দুষ্টুমিতে অসহ্য হয়ে আমি মাঝে-মধ্যে তাকে কড়া স্বরে ধমক দিয়ে উঠতাম। আবার কখনও বা হাতটা তার গালের কাছে নিয়ে চড় দেখাতাম। কিন্তু কাকে শাসন করছি আমি! সে যে আমাকে কিছুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ করছে না। আমি যতই তার ওপর তম্বি করি না কেন সে যে নির্বিকার দৃষ্টি মেলে পিটপিট করে তাকিয়ে মৃদু মৃদু লেজ নাড়ে।

লাইকা দুষ্টু! অস্বাভাবিক দুরন্ত! কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার মান-মন্দির দিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলে লক্ষ্মীটির মত সোজা সামনের মাঠটায় চলে যেত। গাছের তলায় চুপটি করে শুয়ে নীরব চাহনি মেলে এদিক-ওদিক তাকাত। ভুলেও সে কোনরকম উৎপাত করত না। আমার বিশ্বাস দু'শ ইঞ্চি ডোলের মধ্যে প্রবেশ করা লাইকা ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না।

আমি দীর্ঘসময় মানমন্দিরে কাজে লিপ্ত থাকতাম। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, ভেতর থেকে আমার কণ্ঠস্বর ভেসে এলে তার মধ্যে কোনরকম চাঞ্চল্য প্রকাশ পেত না। আপন মনে শুয়ে চারদিকে তাকাত আর নির্বিকার ভাবে ছোট্ট লেজটাকে নাড়াত।

ডাক্তার এণ্ডারসন লাইকা'কে খুব ভালবাসতেন। অন্যান্যরা সে

কিছুমাত্র ভালবাসতেন না এতবড় অপবাদ দিয়ে নিজেকে অপরাধী করব না। কিন্তু ডাঃ এন্ডারসন-এর মত নিখাঁজ ভালবাসা সে অন্য কারো কাছ থেকে পেয়েছে বলে আমার অন্ততঃ জানা ছিল না। তিনিই একদিন সস্নেহে তার গায়ে মাথায় হাত বুলতে বুলতে 'লাইকা' নামকরণ করে-ছিলেন।

আমি কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করতাম, লাইকা তার মনিবকেই সব চেয়ে বেশী ভালবাসত, মান্যিগন্যি করত। আমার একেবারে বাধ্য না হলেও বড় রকম অবাধ্যতা আমার চোখে পড়ে নি।

আমার প্রিয় কুকুর লাইকা ছিল খুবই সুন্দর। তার দেহের রঙের প্রায় পঁচানব্বই ভাগই ছিল এ্যালসেসিয়ান জাতভুক্ত। তাই অচিরেই গায়ে গতরে সে বেড়ে উঠতে লাগল। ছাই রঙের ঘন লোমে আবৃত ছিল তার শরীরটা। আর ডাগর ডাগর চোখ দুটোর ওপরের কালো দুটো ছোপ তার সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। আমি বন্ধু-বান্ধবদের আসরে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত থাকতাম তখন সে কানখাড়া করে আমাদের কথাবার্তা শুনত, সঙ্গত-অসঙ্গত নিয়ে ভাবনা চিন্তা করত। আমার নিজের অজান্তে কিছুদিনের মধ্যেই সে কি ক'রে যে আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে স্থায়ী আসন পেতে বসল আমি নিজেই জানতে পারি নি। সত্যি বলছি, আমার একাকীত্ব তার উপস্থিতিতেই বুঝতেই পারতাম না।

দিনের শেষে মানমন্দির থেকে আমি ফিরে এসে তার মধ্যে যে কী এক অবর্ণনীয় পুলকের সঞ্চার হ'ত তা বাস্তবিকই বুঝিয়ে বলা অসাধ্য। নিরতিশয় আনন্দ ও উত্তেজনায় একেবারে উন্মাদের মত হয়ে উঠত। কাছে যেতে না যেতেই আমার কাঁধের ওপর সামনের পা দুটো তুলে দিয়ে আনন্দের স্বাদটুকু পুরোপুরি উপলব্ধি করত। আর ? আর অস্ফুট স্বরে অখণ্ড আনন্দের বহিঃপ্রকাশ করত।

সত্যি বলতে কি আমার লাইকা'র ভালবাসার ধরণ ধারণগুলো অন্য দশটা কুকুরের চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই আমার অবস্থা এমন দুর্বল হয়ে গেল যে, ধারে-কাছে কোথাও গেলে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য মনের তাগিদ অনুভব করতাম। সে সঙ্গে না থাকলে বড়ই নিঃসঙ্গ বোধ করতাম, অবুঝ মনটা ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠত।

বারকেলিতে এক ভয়ঙ্কর সভা হয়েছিল। বাস্তবিকই এক মারাত্মক

পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল সেখানে। সে-সভায় আমি লাইকা উভয়েই ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু বন্ধু-বান্ধবও সেখানে সমবেত হয়েছিল। কাছে পিঠে যাদের বাড়ি তাদের অনেকেই আমাকে আতিথ্য গ্রহণের জন্য বহুভাবে অনুরোধ উপরোধ করতে লাগল। কিন্তু একটা ব্যাপার আমার নজর এড়াল না। লাইকাকে মন থেকে বরদাস্ত করতে পারছে না। তাদের মানসিক পরিস্থিতির আঁচ পেয়ে আমি হেসে হেসে অভয় দিলাম—'আরে মশাই, লাইকা কি আমার সেরকম কুকুর নাকি যে, কারো আতিথ্য গ্রহণ করে অবুঝের মত গোল বাঁধিয়ে শান্তি বিঘ্নিত করবে!

শত্রুর মোকাবেলা করে নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখতে এর মত দ্বিতীয়টি মিলবে না।'

নিতান্ত অনিচ্ছায় ভদ্রলোক আমার কথায় সম্মত হ'ল। লৌকিকতার খাতিরে সামনা সামনি একটু আধটু হাসলও বটে। তবে অস্ফুটস্বরে বলতেও ছাড়ল না—'বারকেলিতে দুর্জনেও উপদ্রব নেই। চোর ডাকাত এখানে দেখা যায় না।'

নৈশ-ভোজ সেরে বিছানায় আশ্রয় করতেই চোখ দুটো ঘুমে জড়িয়ে এল। সারাদিন সভার ধকল গেলো। শরীর ক্লান্ত। মাঝরাত্রে আচমকা ঘুম ভেঙে গেল। লাইকা'র গর্জন কানে এল। ভাবলাম, বাড়িতে চোর ঢুকেছে। লাইকা তর্জন গর্জনের মাধ্যমে সবাইকে সতর্ক করে দিচ্ছে। একবার গরু দেখেও সে ভয়ঙ্কর গর্জন জুড়ে দিয়েছিল। তার ব্যাপার স্যাপার বুঝতে না পেরে হুড়মুড় করে উঠে পড়লাম। অপরিচিত বাড়ি। সুইচ কোথায় খেয়াল নেই! অন্ধকারে দেয়ালে হাতড়ে বাঞ্ছিত বোর্ড-টাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে লাগলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বোর্ডটা ত বাইরে, বারান্দায় দেখেছিলাম বটে। দরজাটা হাতে ঠেকতেই ব্যস্ত-হাতে খিলটা খুলে ফেল্‌লাম। চৌকাঠ ডিঙিয়ে এলাম বাইরে। আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম, লাইকার চীৎকারে গৃহকর্তার ঘুম ভেঙে গেছে। আর চোরকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছেন। কিন্তু লাইকা'র তর্জন গর্জন সমান তালেই চলেছে। কান ঝালাপালা হবার জোগাড়। ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল! কড়া ধমক দিয়ে বলে উঠলাম—'লাইকা, হচ্ছে কি! চুপ করবি কিনা শুনতে চাই।'

লাইকা'কে থামাবার চেষ্টা করতে করতে আমি জমাটবাঁধা অন্ধকারে

হাতড়ে হাতড়ে সে স্যুইচবোর্ডের খোঁজে সিঁড়ির কাছে হাজির হলাম। আসলে আচমকা হোঁচট খেয়ে আমাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেই হ'ল।

হ্যাঁ হ্যাঁ, পেয়েছি। স্যুইচবোর্ডটা খুঁজে পেয়েছি। স্যুইচে হাত দিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেলাম। আলো জ্বালব কিনা, দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম। না, আর ভাবতে পারলাম না। অদৃষ্ট সম্বল করে স্যুইচটায় সামান্য চাপ দিতেই ঝলমলে আলো চারদিকে আছাড় খেয়ে পড়ল। আলোটা সিঁড়ির নীচ পর্যন্ত পেঁছে গেল। সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে লাইকা অনবরত গর্জেই চলেছে। এমন দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে যে, শিকলটা বুঝি ছিঁড়েই ফেলবে। ব্যস্ত-আতঙ্কিত চোখের মণি দুটোকে একটিবার চারদিকে বুলিয়ে নিলাম। কই, কিছুই দেখা যাচ্ছে না ত!

লাইকা'র আচরণে ক্ষুব্দ হলাম। তার কৃতকর্মের জন্য বার বার ধমক দিতে লাগলাম। এমন বেয়াদপি দেখলে কার না গায়ে জ্বালা ধরে যায়।

আমি রাগে গজ গজ করতে করতে সিড়িঁর তলার দিকে এগিয়ে গেলাম। চোখে-মুখে বিতৃষ্ণার ছাপ এঁকে তার কুঠরির দরজাটা খুলে দিলাম। দরজার শেকল খুলে পাল্লাটা ফাঁক করতেই লাইকা দ্রুত গতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি ঘাড় ঘুরাতে না ঘুরাতেই অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেল।

চারদিকে নিস্তব্ধ নিঃঝুম। চারদিকে ঘন অন্ধকার আর কুয়াশার দাপট। কোথাও কোন টু শব্দটি পর্যন্ত নেই। আমি মাঝরাত্রে অন্ধকারে লাইকা'র আগমন প্রতীক্ষায় দরজা খুলে ভূতের মত বসে রইলাম।

আচমকা এক হৃদয় বিদায়ক আওয়াজে সচকিত হয়ে পড়লাম। বুঝলাম ভূমিকম্প হচ্ছে। আমার চেতনা বিপর্যস্ত হলেও আমি কিন্তু সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়লাম না। তবে কেমন যেন অবাঞ্ছিত ভয়-ভীতি আমার দেহ-মনের ওপর ভর করল। আমি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নিজেকে শক্ত রাখতে লাগলাম। আমি ভূ-তাত্ত্বিকদের ওপর মনে মনে ক্ষুব্ধই হলাম। ভাবলাম তাঁদের অবশ্যই উচিত ছিল ভূমিকম্পের ব্যাপারে জনসাধারণকে সতর্ক করে দেয়া। তাহলে এমন আকস্মিক ভয়-ভীতিতে পড়তে হ'ত না। পর মুহূর্তেই ভাবলাম, ভূমিকম্পের এমন ভয়ঙ্কর আওয়াজ ত এর আগে কোনদিন শুনিনি। পরদিন সকালে বুঝতে পারলাম, এ-ভূমিকম্প স্বাভাবিক কারণে হয় নি। রেডক্রসের কর্মীরা আমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে

দিলেন। আমাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আমি সম্মত হইনি। আমার প্রাণাধিক প্রিয় লাইকা'কে এভাবে ফেলে রেখে আমার পক্ষে চলে যাওয়া কি ক'রে সম্ভব। তার ভালবাসাকে অগ্রাহ্য করে নিজে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে পারলাম না।'

ভূমিকম্পের তাণ্ডবে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আমি একা জীবিত। আমার চারদিকে মরা মানুষের স্তূপ। পরম করুণাময় ঈশ্বর বুঝি বা আমাকে লাইকার জন্য প্রাণে বাঁচিয়ে রেখেছেন। সাহায্যকারী রেডক্রসের কর্মীরা ধরেই নিয়েছেন, আমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। এটা অমূলকও নয়। ভয়াবহ ভূমিকম্পের হাত থেকে যারা কোনরকমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল তারা আত্মজনের খোঁজে হন্যে হয়ে উন্মাদের মত দাপাদাপি করছে, দেখলাম।

আমি লাইকার অবর্তমানে চারদিকে ছুটোছুটি করে হাহুতাশ করতে লাগলাম। এক সময় আমার উদ্বেগ-উৎকন্ঠার অবসান ঘটিয়ে লাইকা আমার কাছে ফিরে এল। এবার থেকে আমি আমার শান্তি-সুখের প্রিয় লাইকাকে নিয়ে দিন কাটাতে লাগলাম। লাইকা ছাড়া বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয় পরিজন কারো সংস্রবই আর আমার কাছে আনন্দদায়ক বলে মনে হয় না। ফলে তাদের সতর্কতার সঙ্গেই এড়িয়ে চলতে লাগলাম। শান্তি-সুখ চিরদিন কাউকে সমান ভাবে সঙ্গদান করে না।

উনিশ'শ ষাট সাল থেকেই আমার অন্যান্য জ্যোতির্বিদদের মত আমার মনের গভীরে বিশ্বাস দানা বাঁধল, মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণায় মানমন্দির উপযুক্ত স্থান নয়। কারণ? আমার বিশ্বাস, চাঁদের বুকে একটা খুদে যন্ত্রের কাজেরও গুরুত্ব অনেক বেশী। আমার মনে এ-ধারণা বদ্ধমূল হ'ল যে, এবার আমাদের গ্রীণ উইচ, মাউণ্ট উইলসন, প্যালেসার প্রভৃতি মানমন্দিরগুলো মহাকাশের যাত্রী হতে হবে। এবং আর সে সময় আগত পায়।

আমার বরাত খুলে গেল। পদোন্নতি ঘটল। ক্যারসাইড মানমন্দিরের সহ কার্য নির্বাহকের পদলাভে ধন্য হলাম।

আমি নিঃসন্দেহ হলাম, আমাকে গবেষণায় সাফল্য লাভ করতে হ'লে এখানে নয়, গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে হবে চাঁদের মাটিতে বসেই। কিন্তু এতে লাইকাকে পৃথিবীতে ফেলে রেখে আমাকে একাই যেতে হবে। কর্তৃপক্ষ অবশ্যই একটা জন্তুকে সঙ্গে নিয়ে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ

কাজে যেতে অনুমতি দেবেন না। অন্ততঃ একযুগ পরে এমন কোন অনুমতি দিলে দিতেও পারেন। তবে আজ অবশ্যই নয়।

চাঁদের মাটিতে বসে গবেষণায় লিপ্ত হলে আমি সাফল্যলাভ করতে পারব এ-বিশ্বাস আমার মনের কোণে দানা বাঁধল। আমার সামনে দুটো পথ খোলা। লাইকাকে নিয়ে মহাকাশে পাড়ি জমানো, নতুবা পৃথিবীর বুকে পড়ে থেকে গবেষণার ব্যাপারে ব্যর্থতার জ্বালায় দগ্ধে মরা। এদের মধ্যে কোনটিকে বেছে নেব আমি? দোটনায় পড়ে গেলাম। একবার ভাবলাম, এক যুগ অনেক দিনের ব্যাপার। আর লাইকার আয়ু এক-যুগও নয়। আর তার মায়া-মোহে এতগুলো বছর অপেক্ষা করতে হলে আমার জীবনকে ব্যর্থ করে দেওয়া ছাড়া কাজের কাজ কিছুই হবে না। দীর্ঘ কয়েক বছরের গবেষণার ফল হবে শূন্য। যে কোন সুস্থ মস্তিকের ব্যক্তি যুক্তি দেবেন লাইকার মায়া-মোহ ছিন্ন করে একাই চাঁদের উদ্দেশে পাড়ি জমাতে। কিন্তু লাইকা'র মায়া ত্যাগ করতে যে কিছুতেই পারছি না।

অনন্যোপায় হয়ে সব দায়িত্ব অদৃষ্টের হাতে অর্পন ক'রে নিজেকে হাল্কা করার চেষ্টা করলাম। ডাঃ এণ্ডারসন ও তার সহধর্মিনী আমার দ্বিধা-দ্বন্দের অবসান ঘটালেন। লাইকা'র সার্বিক দায়িত্ব তাঁরা সেচ্ছায় গ্রহণ করলেন। লাইকা'র কাছে নিজেকে কেমন অপরাধী হতে হ'ল আমাকে।

আমাকে তবে প্রিয়তম লাইকা'র মায়া ত্যাগ ক'রে চলে যেতেই হবে। লাইকাকে নিয়ে শেষবারের মত পার্বত্য অঞ্চলে বেড়াতে গেলাম। এটাই আমাদের শেষ প্রমোদ-ভ্রমণ। তার সঙ্গে শেষ দেখাও বটে।

চাঁদের উদ্দেশে আমার পাড়ি জমানোর দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেল। পৃথিবীর কমপক্ষে এক আকস্মিক বিদ্যুতিক ঝড় দেখা দিল। বাধ্য হয়েই আমার যাত্রাকে চব্বিশ ঘণ্টা পিছিয়ে দিতে হ'ল। এ-সময় উত্তরমেরুর উপরের কক্ষপথ ধরে যাওয়া উচিত নয় মনে করে ড্যাম হাজির হলেন। আমরা তেজোস্ক্রীয় বিরোধী ওষুধ খেয়ে এলাম। তাছাড়া আমাদের দেহের ওজনও খুব হ্রাস পেয়েছিল। ফলে যাত্রায় বাধা পড়ল।

সাইড-কারে আমরা যখন হাজির হলাম তখন আমি জেগেই ছিলাম। কিন্তু তার আগেই আমরা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এলাকার বাইরে চলে

গেছি। একদিকে বুকের ভেতরে একটা অপরাধ ক্রিয়া করছে। তার ওপর ভবিষ্যৎ কার্যাবলীর চিন্তাও মনের কম অংশ জুড়ে নেই। আমার প্রাণাধিক লাইকা'র ভালবাসা থেকে আজ আমি বঞ্চিত। তার বিশ্বাসও আমি সম্পূর্ণরূপে হারিয়েছি। এ-অব্যক্ত যন্ত্রণায় আমি ভেতরে ভেতরে খাঁক হচ্ছিল। লাইকা'র চোখে আজ আমি প্রবঞ্চক বিশ্বাসঘাতক ছাড়া কিছু নই।

আমার মনের কোণে যে আশঙ্কা বার বার উঁকি দিচ্ছিল আজ তা কঠোর বাস্তবে পরিণত হ'ল। এক মাস পরে মিঃ এণ্ডারসন-এর একটা চিঠি পেলাম। তাঁদের সাধ্যতীত সেবাকে অবহেলা-অবজ্ঞা করে, নিদারুণ অভিমানে লাইকা নিষ্ঠুর পৃথিবী ছেড়ে লোকান্তরে চলে গেছে। সে মরে গেলেও আমার প্রতিটি পদক্ষেপে তার উপস্থিতি আমি উপলব্ধি করেছি। তাকে ভোলা, তার স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলা আমার পক্ষে বাস্তবিকই অকল্পনীয় ব্যাপার। নইলে পৃথিবী থেকে দূরে বহু দূরে চাঁদের মাটিতে অবস্থান করে এতগুলো বছর পরও তাকে মুহূর্তের জন্য মন থেকে মুছে ফেলতে পারলাম না।

আমি নিজেকে হাল্কা করার জন্য যখন লাইকা'র বিরুদ্ধে আমার সপক্ষে একটা যুক্তি দাঁড় করাবার চেষ্টা করছিলাম তখন যেন অকস্মাৎ প্রচণ্ড একটা ধাক্কায় পুরো বাড়িটা থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। উপায়ান্তর না দেখে আমি গায়ে বর্মটা চাপিয়ে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ঠিক তখনই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে বিকট শব্দ করে বাড়ির দেয়ালগুলো হুড়-মুড় করে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দমকা বাতাস বাড়ির ভেতরে আছাড় গেয়ে পড়ল। প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আমার হাতটা বিপদ-সঙ্কেতের স্যুইচের ওপর গিয়ে পড়ল। আমার দলের দু'জন ভাগ্যহত প্রাণ দিল। অন্যান্য যারা ছিল প্রাণে বেঁচে গেল। ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের হাত থেকে আমাদের মানমন্দিরটা রক্ষা পেল না। তিন-তিনটে প্রেসার ডোল চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।

মনমরা হয়ে আমি ভাবতে লাগলাম। সানফ্রান্সিসকোতে থাকাকালীন একমাত্র কুকুর লাইকাই যে ভূমিকম্পের আগমনবার্তা পেয়েছিল তা নয়। আর সুদূর মহাকাশে আমি সতর্ক হয়ে গেলাম। এটা বুঝে ও তবু কেন যেন আমার বার বার মনে হ'তে লাগল, আমার রক্ষার্থে লাইকা'ই মহাকাশে কোন গোপন সঙ্কেত বার্তা পাঠিয়ে আমাকে সতর্ক করে

দিয়েছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই আমার সচেতন অবস্থায় ভাবি লাইকার প্রতি আমার প্রগাঢ় স্নেহ বশতঃ মনের কোনো এমন ভাবনার উদয় হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। তাই এটা নিছক কল্পনাই, রূঢ় বাস্তব জগতের এর যোগাযোগ থাকা সম্ভব নয়। এরকম ভাববার সঙ্গত কারণও রয়েছে যথেষ্ট। লাইকা আর আমার মধ্যে কোটি কোটি মাইলের ব্যবধান। সে রয়েছে সেই কোথায় আর আমি চাঁদের মাটিতে। এ দুস্তর ব্যবধান কেবলমাত্র ক্ষুদ্র জন্তু লাইকা কেন মানুষের পক্ষেও অসাধ্য। এমন একটা যুক্তি গ্রাহ্য কারণ মনে মনে বার বার আওড়েও মানসিক স্বস্তি ও তুষ্টি আনতে পারলাম না। ভালবাসার কাছে আত্মসমর্পন করে পরম পিতার কাছে বার বার কাতর মিনতি জানাতে লাগলাম, আর একটু—আর একটু দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য আমার ঘুমদায়ী স্বপ্নটাকে আমি যেন স্পষ্ট দেখেছি, ভালবাসার প্রলেপ মাখানো লাইকার চোখ দুটো যেন আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। তার সে খাদ্যহীন ভালবাসাটুকুকে আমি পৃথিবীর যেকোন অমূল্য সম্পদের বিনিময়ে কিনে নিতে কুণ্ঠিত নই। হে ঈশ্বর! হে পরমপিতা, আমার স্বপ্নকে আর একটু স্থায়ী করুন। আর একটু! আর একটু—।

——–

বহু পুরনো একটা বাড়ি। দেয়ালের বহু জায়গা সিমেণ্ট-বালির আস্তরণ খসে পড়েছে। ইটগুলো যেন দাঁত বের ক'রে হাসছে। আর সিঁড়ি? সিঁড়িটার অবস্থাও শোচনীয় বুড়ো-মানুষের দাঁতের মত নড়বড়ে। যে কোন সময় হুড়মুড় ক'রে প'ড়ে গেলে কিছুমাত্র আশ্চর্য হবার নয়। ফাকার ব্রাউম্যান সিঁড়ির রেলিঙ ধ'রে ধ'রে সন্তর্পণে নেমে আসতে লাগলেন।

মিস বারবারা এ্যালেন বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে ফাদারকে নেমে আসতে দেখলেন। তাঁর মুখে বিষণ্ণতার ছাপ। চোখের তারায় অন্তহীন বিস্ময়।

ফাদার বিষণ্ণ মনে সিঁড়ির শেষ-ধাপে পা রাখলেন। তিনি ওপর-তলায়

মিস গ্র্যাণ্ট-এর সঙ্গে কথা বলার জন্যই উঠেছিলেন। তাঁকে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজী করাতে গিয়েছিলেন, যাতে যত শীঘ্র সম্ভব এ-বাড়িটা তিনি ছেড়ে অন্যত্র বাড়ি ভাড়া করে চলে যান। কিন্তু ফাদারের চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছে তার প্রয়াস ফল প্রসূ হয় নি।

মিসেস গ্রাণ্ট সবেমাত্র ক'দিন আগেই এ-বাড়ির ওপর তলাটা ভাড়া নিয়ে মালপত্রসহ এসে উঠেছেন।

ফাদারের ব্যর্থতার পরও মিস বারবারা'র বিশ্বাস, তিনি অবশ্যই মিসেস গ্র্যান্ট-এর মনে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবেন। তিনি নিঃসন্দেহ মিসেস গ্র্যাণ্ট তাঁর কথা এত সহজে ফেলতে পারবেন না। শহরের পরিচিত মহল জানে, মিস বারবারা কোন কাজে বিফলকাম হ'লে অন্য কারো পক্ষে তা অবশ্যই সম্ভব নয়। সব চেয়ে বড় কথা ব্যাপারটা খুবই জরুরী। এক্ষুণি ওপরে গিয়ে মিসেস গ্রাণ্ট'কে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার বাড়িটা খুবই অলক্ষুণে। কিছুদিনের মধ্যে পরপর ক'টা ভয়ঙ্কর হত্যা-কাণ্ড এ-বাড়িটায় ঘটে গেছে। তা নিয়ে শহরবাসীদের মধ্যে একটা আতঙ্কের সঞ্চার হয়েছে।

মিসেস গ্রাণ্ট মেনস্ট্রীটের অলক্ষুণে সে পুরনো বাড়িটা ভাড়া নিয়ে তাঁরা উঠে এসেছেন। সঙ্গে তাঁর ছোট বোনকে নিয়ে এসেছেন। খবরটা শোনামাত্র মিস বারবারা'র বুকের মধ্যে ধপাস্ করে উঠেছে। সপ্তাহ খানেকের ব্যাপার। খবরটা শহরবাসীদের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে চাউড় হয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে অনেকেই মিস বারবারা'র সঙ্গে দেখা করে অনুরোধ করেছে, তিনি যেন মিসেস গ্রাণ্ট-এর সঙ্গে দেখা করেন। বাড়িটার অতীত-কাহিনীর কথা জানিয়ে তাঁকে সতর্ক করে দেন। আর যেন তেন প্রকারেণ তাঁকে এ-বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র উঠে যেতে অনুরোধ করেন।

মিসেস গ্রাণ্ট সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ালেন। অপরিচিতা মিস বারবারা এ্যালান'কে দরজায় দেখে ভ্রূ কুচকে তাকালেন। মনে হ'ল নিতান্ত অনিচ্ছায় সিঁড়ি বেয়ে ধীর পায়ে নীচে নেমে এলেন। নেহাৎই ভদ্রতার খাতিরে তাঁকে ওপরে নিয়ে গিয়ে বৈঠকখানায় বসালেন।

মিস বারবারা এ্যালান একথা সেকথার পর বাড়িটার অতীত কেলেঙ্কারীর কথা বলতে শুরু করলেন। বাড়িটা ভাড়া নিয়ে তাঁদের স্থায়ীভাবে বসবাস সিদ্ধান্তকে যে শহরবাসীরা মোটেই স্বাভাবিকভাবে

ত নয়ই বরং আতঙ্কের চোখে দেখছে একথা বলতেও ভুল করলেন না তিনি। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার। মিসেস গ্রান্ট-এর চোখ-মুখ দেখে তার স্পষ্ট মনে হ'ল. ভদ্রমহিলা তাঁর কথাটাকে আমলই দিলেন না। নেহাৎই সৌজন্য বশতঃ মুচকি হাসলেন। চোখ থেকে পুরু কাঁচের চশমাটা খুলে গাউনের কাপড় দিয়ে মুছতে মুছতে তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন – আপনার কথার যে কি জবাব দেব, গুছিয়ে উঠতে পারছি না মিস এ্যালেন। কিছু মনে করবেন না, আপনার কথাগুলো বিশ্বাস বরতে আমি মোটেই উৎসাহ পাচ্ছিনে। সবচেয়ে বড় কথা আমার মত একজন স্বাধীন ও আধুনিক মতাবলম্বী মহিলার পক্ষে মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। আপনার অন্য কিছু বলার থাকলে বলতে পারেন।

অপ্রভিত হয়ে মিস বারবারা এ্যালেন ম্লান হাসলেন। শান্তস্বরে বললেন –'দেখুন মিসেস গ্রাণ্ট, এক সময় আমিও এ-অলক্ষুণে বাড়িটাতে বাস করে গেছি। তাই আপনাকে সতর্ক করে দেবার জন্য ছুটে আসতেই হ'ল।'

'—তবেই ভেবে দেখুন, আমি কিছুই ভুল করছি না।'

'—আমার নিজের কথা ভেবেই - '

মিস গ্রাণ্ট দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় প্রকাশ করে এবার বললেন - 'আপনি ত বলছেনই এক সময় এ-বাড়িতে বসবাস করে গেছেন। তাই যদি সত্যি হয় তবে ত দেখা যাচ্ছে আপনার কোনই ক্ষতি হয় নি। দিব্যি বহাল-তবিয়তে রয়েছেন। তবে মিছে কেন আমার মনে মিথ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে এসেছেন। বলুন ত ?'

'—হ্যাঁ, আমি সুস্থ-স্বাভাবিক আছি সত্য। কিন্তু এ-বাড়িতে আমার যে কী সর্বনাশ হয়ে গেছে সেকথা শুনলে আপনি চমকে উঠবেন মিসেস গ্রাণ্ট! আমার বোনকে হারাতে হয়েছিল। উঃ সে কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য! ভাবলে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, গলা পর্যন্ত শুকিয়ে আসে।' মিস এ্যালেন বিষন্নমুখে কথাটা বলেই চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তাঁর ধারণা ছিল, তাঁর বোনের মৃত্যুর কথা শোনামাত্র মিসেস গ্রাণ্ট ভয়ে কুঁকড়ে যাবেন। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সে-মুহূর্তেই অলক্ষুণে বাড়িটা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেবেন।

মিসেস গ্রাণ্ট অপলক চোখে মিস এ্যালেন-এর মুখের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখের তারায় বিদ্রূপের ছাপ। নীরব চাহনি মেলে তাকিয়ে তিনি

ভাবতে লাগলেন—'কী আশ্চর্য ব্যাপার! একে শহরের মানুষ মিস এ্যালেন। তার ওপর কিছু না কিছু কালির অক্ষর পেটে রয়েছে। সব চেয়ে বড় কথা, আজকের বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে দাঁড়িয়েও যেন তাঁর মন হাজার বছর পিছিয়ে কুসংস্কারের পাকে লুটোপুটি খাচ্ছে। ভূত-প্রেত বা ডাইনির ওপর আজও এদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তাজ্জব ব্যাপার! উদাস দৃষ্টিতে খোলা জানালা দিয়ে বাইরের নীল আকাশের টুকরোটার দিকে তাকিয়ে শান্তস্বরে আগের মতই দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বল্‌লেন—'মিস এ্যালেন, আপনার বোনের মৃত্যু হয়েছে। ব্যাপারটা সত্যি দুঃখজনক। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর জন্য মিছে বাড়িটার ওপর দোষারোপ করছেন কেন? এ-বাড়িটাই কি ষড়যন্ত্র ক'রে আপনার বোনের মৃত্যু ঘটিয়েছে, বলতে 'চাচ্ছেন?'

মিস এ্যালেন প্রবীণা। বয়স পঞ্চাশের ওপর ত অবশ্যই। মিস গ্রাণ্ট-এর ঔদাসিন্য ও তাচ্ছিল্যের ভাবটুক তাঁর নজর এড়াল না। তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অধিকতর দৃঢ়তার সঙ্গে বল্‌লেন—'আপনি যা-ই বলেন না কেন, আমি কিন্তু বলব তাঁর মৃত্যুর জন্য এ-অলক্ষুণে বাড়িটাই দায়ী। যদি না ভয়ঙ্কর কাণ্ডটা আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করতাম, তবে হয়ত আমিও আপনার মতই কথাটাকে হেসে উড়িয়ে দিতাম। আর আপনাকে সতর্ক ক'রে দেবার জন্য নিজের কাজ ফেলে এভাবে অবশ্যই ছুটে আসতাম না।

মিসেস গ্রাণ্ট নীরব চাহনি মেলে তাকিয়ে রইলেন।

মিস এ্যালেন ব'লে চল্‌লেন—সত্যি বলছি, বাড়ি বয়ে অবশ্যই আপনাকে বিরক্ত করতে আসতাম না। সব চেয়ে বড় কথা আমি বোনকে কথা দিয়েছিলাম, কোনদিন ভুলেও এ-বাড়ির চৌকাঠ ডিঙবো না। এবাড়ির প্যানেল্‌ড-রুমে একদিন আমার অদৃষ্টবিড়ম্বিতা অ্যাধির মৃতদেহ প'ড়ে থাকতে দেখেছিলাম। সে-ঘরটা ছিল আমাদের বৈঠকখানা।'

মিস গ্রাণ্ট ঘাড় ঘুরিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠলেন—'হার্টের ব্যামো ছিল বুঝি? তিনি হার্টফেল ক'রে—

'—না হার্টফেলের ব্যাপার মোটেই নয়। হার্টের ব্যামো ট্যামো কোনদিনই তার ছিল না। আমুদে হৈ হুল্লোড়প্রিয় মেয়ে ছিল আমার বোন অ্যাবি। বীভৎস অবস্থায় তার মৃতদেহ মেঝেতে এলিয়ে প'ড়ে থাকতে দেখে আমি উন্মাদিনীর প্রায় হয়ে ছুটলাম ডাক্তারখানার উদ্দেশে। ডাক্তার

এসে বহুভাবে পরীক্ষা করলেন। মন্তব্য করলেন, আচমকা শক্ পেয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। ঘরের মধ্যে এমন কিছু হঠাৎ তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল যা সহ্য করা তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল। আকস্মিক আতঙ্কই তাঁর মৃত্যুর একমাত্র কারণ।'

'—সে-ত নিশ্চিত ক'রে বলা মুশকিল মিসেস গ্রাণ্ট। তবে বাড়িটার ইতিহাস যা জানতে পেরেছিল তা হ'ল—বছর পঞ্চাশের আগের কথা। রিটার ম্যাসন নামে এক ভদ্রলোক এ-বাড়িতে বাস করতেন। তিনি এক রাতে ঐ ফাঁসি কক্ষে স্ত্রীকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। তারপর আত্মহত্যা করেন। সকাল হ'ল। বাড়িতে কারো সাড়াশব্দ না পেয়ে প্রতিবেশীদের কেমন সন্দেহ হয়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সন্দেহ প্রগাঢ় হতে থাকে। প্রতিবেশীদের কয়েকজন কৌতূহলী মন নিয়ে গুটিগুটি বাড়ির ভেতরে ঢুকে যায়। ডাকাডাকি ক'রে কারো সাড়া শব্দ পেল না। এঘর-সেঘর খুঁজে তারা ফাঁসি-কক্ষের দরজার কাছে গিয়েই থমকে যায়। দেখে, তার স্ত্রীর মৃতদেহ ঘরের মেঝেতে এলিয়ে পড়ে রয়েছে। আর তার দেহটা ঘরের ছাদের সঙ্গে ঝুলছে।'

মিসেস গ্রাণ্ট এবারও চোখের তারায় অবিশ্বাসের ছাপ এঁকেই মিস এ্যালেন-এর মুখের দিকে তাকালেন।

মিস এ্যালেন ব'লে চল্লেন—'মিসেস গ্রাণ্ট, আপনি হয়ত আমার এ-কথাটাকেও হেসে উড়িয়ে দেবেন। তবু আমি না ব'লে পারছি না—আজও এ-বাড়ির এ'ঘরটার পিটার ম্যাসন্-এর মৃতদেহটাকে ঝুলে থাকতে দেখা যায়। আর দেখা যায় এক স্ত্রীলোকের ফ্যাকাশে বিবর্ণ মৃতদেহ ঘরের মেঝেতে এলিয়ে প'ড়ে থাকতে দেখা যায়। বীভৎস-ভয়ঙ্কর সে-দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলে গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসতে বাধ্য।'

মিসেস গ্রাণ্ট ম্লান হেসে বল্লেন—'মিস এ্যালেন, আপনার বর্ণীত কাহিনীটা বটতলার লেখকদের সস্তা দামে ভূতের গল্পের মত নয় কি? নিছকই মামুলি একটা কাল্পনিক কাহিনী—'

'—আমিও এ-বাড়িতে আসার পর ঘটনাটাকে প্রথম প্রথম আপনার মতই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম মিসেস গ্রাণ্ট। তারপর একদিন নিজের চোখে পিটার ম্যাসন-এর ঝুলন্ত দেহটা আর মেঝেতে এলিয়ে প'ড়ে থাকা তাঁর স্ত্রীর দেহটা দেখে আমার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জণ হ'ল। বিকট আর্তনাদ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দীর্ঘ সময় বারান্দায় দাঁড়িয়ে

হাঁপাতে হয়েছিল আমাকে।

মিসেস গ্রাণ্ট-এর চোখে নেমে এল বিস্ময়ের ছাপ। চোখের তারায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল আতঙ্কের ছাপ। একটু আগের তাঁর সে-অবিশ্বাস আর বিদ্রূপটুকু যেন মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন —'তাই বুঝি ?'

'—ঠিক তা-ই। ফাঁসি-কক্ষের শিলিঙের আড়াআড়ি যে কড়িকাঠটা আছে তার সঙ্গে ঝুলছিল পিটার ম্যাসন-এর দেহটা। দুর্ঘটনার পরের দিন প্রতিবেশীরা নাকি মৃতদেহটাকে সেখানে ঠিক তেমনিভাবেই ঝুলে থাকতে দেখেছিল। সে-ঘরের ভয়ঙ্কর সে-দৃশ্যটার বিবরণ আপনাকে বুঝিয়ে বলার মত ভাষা আমার নেই। তারপর থেকে প্রায়ই সে-ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে ফুটে উঠতে দেখা যেত। যতবারই দেখতাম তত-বারই আতঙ্কে আমার সংজ্ঞা লোপ পাবার উপক্রম হ'ত। আর স্নায়ুর ওপর চাপ পড়ত অস্বাভাবিক। আপনার জায়গায় যদি আমি হতাম তবে লাখ টাকার বিনিময়েও এ-বাড়িতে একটা রাত্রি কাটাতেও রাজী হতাম না। আর মেঝেতে এলিয়ে প'ড়ে থাকা সে মহিলার দেহটার কথা না-ই বা বল্‌লাম! তাঁর মুখটা চকের মত সাদা। যাচ্ছেতাই রকম বিকৃত। চোখের মণি দুটো যেন ঠিকড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে এবার বল্‌লেন—'এই দেখুন ভয়ংকর সে-দৃশ্যটার কথা ভাবলেই আমার গায়ে কেমন কাঁটা দিয়ে উঠছে!

মিসেস গ্রাণ্ট-এর মুখে বিষাদের ছায়া নেমে এল। অকস্মাৎ তিনি যেন ফুটা বেলুনের মত চিপসে গেলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে কয়েকমুহূর্ত পায়ের বুড়ো আঙুল মেঝেতে ঘষতে ঘষতে নীরবে ভাবতে লাগলেন। এ-বাড়িটা ভাড়া নেবার পরিকল্পনার কথা শুনে আশপাশ থেকে অনেকেই উপযাচক হয়ে এগিয়ে এসেছিল। বাড়িটা ভাড়া না নেবার জন্য বহুভাবে পরামর্শ দিয়েছিল, সতর্ক করেছিল। কারো কথাতেই কর্ণপাত করেন নি তিনি। বাড়িটা পছন্দ হওয়ায় এখানেই উঠে এসেছিলেন!

মিসেস গ্রাণ্টকে আনমনা দেখে মিস এ্যালেন বিমর্ষ হলেন। ভাবলেন, ভদ্রমহিলাকে সতর্ক করতে যা-যা করা দরকার সবই তিনি করেছেন। আর কিছু করা তাঁর সাধ্যাতীত। অনন্যোপায় হয়ে হতাশ মনে দরজার দিকে দু'পা এগিয়ে গেলেন। কি ভাবে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ঘাড় ঘুরিয়ে

তাকালেন। বললেন –'যদি কথা দেন, রাখবেন, তবে একটা অনুরোধ করতাম।'

'– অনুরোধ? সম্ভব হ'লে অবশ্যই রাখার চেষ্টা করব। রীতিমত অধৈর্যভরে কথাটা জুড়ে দিলেন মিসেস গ্রাণ্ট।

'—আশাকরি এমন কিছু অসঙ্গত ও অসম্ভব কিছু বলব না যা আপনার পক্ষে রাখা সম্ভব নয়।

'–কি আপনার অনুরোধ বলুন?'

'—কথা দিন, ওই ফাঁসি-কক্ষে ঢুকে যদি কখনও দেখেন ঘরটা হঠাৎ অস্বাভাবিক দুলে উঠেছে। তারপর ওটা সচল হয়ে উঠেছে –

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মিসেস গ্রাণ্ট ব'লে উঠলেন –

'ঘরটা সচল হয়ে ওঠে - ঠিক বুঝলাম না-ত!'

'– যদি দেখেন ঘরটা চলতে শুরু করেছে ঠিক তখনই যত শীঘ্র সম্ভব ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন।

চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ এঁকে মিসেস গ্রাণ্ট তাকিয়ে রইলেন।

মিস এ্যালেন ব'লে চল্‌লেন –'এ-বাড়ির ওপর ভয়ঙ্কর একটা বিভীষিকা প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে চলেছে, সত্যি বলতে কি, ঘরটা সচল হয়ে ওঠার পর বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া বাস্তবিকই সাধ্যাতীত ব্যাপারই বটে। তবু চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে।'

'—মিস এ্যালেন, আপনার বক্তব্য কিন্তু আমার কাছে এখনও পরিষ্কার হ'ল না। যদি অনুগ্রহ ক'রে আরও একটু খোলসা করে বলেন—।

'—খোলসা ক'রে বলার আর কি-ই বা থাকতে পারে মিসেস এ্যালেন? যদি নেহাৎই এ-বাড়িতে থাকেন তবে ত সবকিছু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। তবে আমি এ-আশা নিয়ে যাচ্ছি, আপনার মত হয়ত বদলাতেও পারে। কথা বলতে বলতে মিস এ্যালেন চৌকাঠ ডিঙিয়ে বারান্দায় পা দিলেন।

মিস এ্যালেন বিদায় নিলে মিসেস গ্রাণ্ট পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল নিথরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর ফুসফুস নিঙড়ে চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। পাশের ঘরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে খাটের ওপর বসলেন। মিস এ্যালেন-এর কথাগুলো নিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন। আপন মনে ব'লে উঠলেন—'ভদ্রমহিলার কথাগুলো কি সত্যি অর্থপূর্ণ, নাকি নিছকই কাল্পনিক ঘটনা?'

মিসেস গ্রাণ্ট-এর বোন ইরমা পাশের চেয়ারে বসে তার দিদির দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। পাশে, মেঝেতে বসে তাঁর ছোট্ট মেয়ে কলিন পুতুল-খেলায় মত্ত। মিসেস গ্রাণ্ট বল্‌লেন—'ইরমা, ভদ্রমহিলা বাড়িটার ব্যাপারে আমাকে সতর্ক ক'রে দিতে এসেছিলেন'

মিসেস গ্রাণ্ট-এর কথাটা ছোট্ট মেয়ে কলিন-এর খুব ধরল। সে পুতুল ফেলে এক লাফে উঠে পড়ল। দেঁড়ে গিয়ে মিসেস গ্রাণ্ট'কে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল—'আমরা এ-বাড়ি ছেড়ে নতুন বাড়িতে যাব? বাঃ কী চমৎকারই হবে! আবার নতুন একটা বাড়ি! বাঃ কী মজা!

কলিন-এর গায়ে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে মিসেস গ্রাণ্ট ম্লান হেসে বল্‌লেন—'আমরা এ বাড়ি ছেড়ে নতুন বাড়িতে যাব, কে বল্‌লে তোমায় কলিন? কোথাও যাব না। এখানে, এ-বাড়িতেই থাকব আমরা।'

মিসেস গ্রাণ্ট-এর ছোট-বোন ইরমা বল্‌লেন—'ভদ্রমহিলা কি নতুন কিছু বললেন, নাকি পুরনো কাসুন্দিই ঘেঁটে গেলেন দিদি?'

'—হ্যাঁ, ওনার মুখে নতুন একটা কথা শোনলাম। সত্যি আজগুবি কথা বটে! ফাঁসি-কক্ষটা নাকি নড়ে ওঠে। আবার নাকি চলাফেরাও করে।'

ইরমা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বললেন 'ও কিছু না।'

কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত কাহিনী। শুনতে বেশ লাগে। কিন্তু সার বলতে তিলমাত্রও নেই। সবই মনের ভুল দিদি।' চেয়ার ছেড়ে উঠে তিনি এবার রীতিমত দৃঢ়তার সঙ্গেই বললেন—'একটা ব্যাপার কি জান? প্যানেল্‌ড রুমের নকসাগুলোর দিকে যদি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাক তবে তুমিও দেখবে সেগুলো হঠাৎ কেমন সচল হয়ে উঠেছে। দৃষ্টির বিভ্রমের ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়।'

'—তা অবশ্য হতে পারে। তবে মিস এ্যালেন যা বললেন, তার মধ্যে এমন একটা রহস্য লুকিয়ে রয়েছে যা আমার বোধগম্য হয়নি। আমাকে যদি এ-ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস কর তবে তোমাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। তবে একটা ব্যাপার আমি স্পষ্ট লক্ষ্য করেছি। ভদ্রমহিলার কথার মধ্যে নির্ঘাৎ আন্তরিকতা রয়েছে। তিনি সাধ্যাতীত চেষ্টা করেছেন ওই ঘরটার ব্যাপারে আমার মনে আস্থা স্থাপন করতে কিন্তু এমন একটা অবিশ্বাস্য ভয়ঙ্কর ব্যাপারকে পুরোপুরি মেনে নিতে আমি কিছুতেই

উৎসাহ পাচ্ছি না।'

'—বুঝেছি দিদি, ভদ্রমহিলার কথাগুলো তোমার মনকে দারুণভাবে আন্দোলিত করেছে। তোমার অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। তোমার ফ্যাকাসে-বিবর্ণ চোখ মুখই তোমার মনের কথা ব্যক্ত করছে। কিন্তু তুমি জেনে রাখ দিদি, আমি কিছুতেই তোমার পাগলামিকে প্রশ্রয় দিচ্ছি নে। যতই পীড়াপীড়ি কর না কেন এ-বাড়ি ছেড়ে এক পা-ও নড়ছি নে জেনে রেখো।

মিসেস গ্রাণ্ট বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে ভুগতে লাগলেন। ভাগ্য বিড়ম্বিত পিটার ম্যাসন ও তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর কাহিনীটা তাঁর মনের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেললেও তিনি শেষ পর্যন্ত নিজের মনকে শক্ত করে বাঁধলেন। না, ওসব আজগুবি ব্যাপার স্যাপার নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না। তিনি মনস্থির করে ফেললেন, কাউকে আর বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না। করলেনও তা-ই। যারা উপযাচক হয়ে বাড়ির দরজার কড়া নেড়েছেন, তাদেরকে কড়া সুরে সাফ কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

মিসেস গ্রান্ট-এর চোখে একটা ব্যাপার স্পষ্ট নজরে পড়ল। সন্ধ্যার পর তিনি বাড়ির বাইরে বের হ'লে বন্ধ-জানালার ফাঁক দিয়ে প্রতিবেশীদের কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলেন। তাকে ইদানিং সবাই যেন ছায়ার মত অনুসরণ করে চলেছে!

বাড়ি ঢুকে মিসেস গ্রাণ্ট বোনকে ডেকে বললেন—'বুঝলি ইরমা, বাড়িটার ব্যাপারে আমার মনটা যেন বাস্তবিকই কেমন দুর্বল হয়ে পড়ছে।

'—তুমি সত্যি যাচ্ছে তাই দিদি! তোমার কি মাথা খারাপ হ'ল! কোন্ একজন বাড়ি বয়ে আজগুবি গল্প শুনিয়ে গেল আর তুমি তা-ই নিয়ে ভেবে অস্থির? ওসব বাজে চিন্তা মন থেকে মুছে ফেল।'

মিসেস গ্রাণ্ট-এর উৎকণ্ঠা দিন দিন বেড়েই চলল। সর্বদা কেমন মনমড়া হয়ে বসে থাকেন। কাজে মন নেই। কাজ করতে করতে গোমড়া মুখে ভাবতে থাকেন পিটার ম্যাসন আর তাঁর স্ত্রীর ভয়ঙ্কর মৃত্যুর কাহিনী। এক সুতীব্র অনুভূতি তাঁর সত্ত্বাকে তিলে তিলে লোপ করে দিচ্ছে। তাঁর প্রতিটা মুহূর্ত কাটতে লাগল অবিশ্বাস্য কাহিনীটার ভাবনার মধ্য দিয়ে। তিনি ভয় পেয়েছেন, মুষড়ে পড়ছেন এটুকু বুঝতে বাকী রইল না তাঁর।

এক সন্ধ্যায় মিসেস গ্রাণ্ট ফাঁসি-কক্ষে গেলেন। ঘরে মৃদু আলো জ্বলছে। চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরের ভেতরে পা দিতেই তাঁকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল। শরীরের স্নায়ুগুলো অকস্মাৎ অস্বাভাবিক চঞ্চল হয়ে পড়ল। রক্তের গতি দ্রুততর হয়ে উঠল। বইয়ের তাকটার দিকে চোখ পড়তেই দেখলেন, কড়িকাঠ থেকে একটা পুরুষের দেহ ঝুলছে তার ঠিক নীচে মেঝের ওপর এলিয়ে পড়ে রয়েছে এক নারীর দেহ। মুখ ফ্যাকাসে, মুখটা বিকৃত। চোখ দুটো কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ভয়ঙ্কর বিকৃত তার চেহারা! মুহূর্তের জন্য চোখ দুটো বন্ধ হয়ে এল। চোখ মেলে তাকাতেই দেখলেন, ঘরটা ফাঁকা। সব ভোঁ ভাঁ। ব্যাপারটা নিয়ে ভাববার মত মানসিকতা তাঁর নেই। আতঙ্কে দৌড়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলেন।

মিসেস গ্রাণ্ট-এর ছোট বোন ইরমা বারান্দা দিয়ে যাবার সময় দেখলেন, তাঁর দিদি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। কাছে যেতেই মিসেস গ্রাণ্ট তাঁর পথ রোধ করলেন। ভীত-সন্ত্রস্ত কাঁপা কাঁপা গলায় ফাঁসি-কক্ষে সদ্য দেখা ভয়ঙ্কর দৃশ্যটার কথা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন। তিনি নিঃসন্দেহ তাঁর বোন কিছুতেই তাঁর কথাটাকে আমল দেবে না। বরং রসিকতা করে উড়িয়ে দেবে। দিদিকে ব্যাপারটা চেপে যেতে দেখে মিসেস ইরমাই প্রসঙ্গ পাড়লেন—কি ব্যাপার দিদি! তোমাকে কেমন বিমর্ষ দেখাচ্ছে যেন! কি হয়েছে, বলত?

মিসেস গ্রাণ্ট তবু বোনের কাছে প্যানেল্‌ড রুমের ঘটনাটা চেপে গেলেন। কাঁপা কাঁপা গলায় কোনরকমে উচ্চারণ করলেন—'না, তেমন কিছু নয়। হঠাৎ মাথাটা কেমন অস্বাভাবিক যন্ত্রণা হচ্ছে।'

'—তবে এখানে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কি করছ! ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। আর আমার ব্যাগে মাথা ধরার বড়ি আছে। এটা খেয়ে নিও।'

মিসেস গ্রাণ্ট আর কথা না বাড়িয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন। একটু পরে ইরমা তাঁর ব্যাগে হাত দিয়ে দেখেন, তাঁর দিদি বড়িটা নেন নি। সেটার দরকার পড়ে নি।

রাত্রে কিছু না খেয়েই মিসেস গ্রাণ্ট শুয়ে পড়লেন। অনেক রাত্রি পর্যন্ত অস্থিরতার মধ্যে কাটালেন। প্রায় মাঝ রাত্রি পর্যন্ত নিঘুম অবস্থায় কাটিয়ে এক সময় তন্দ্রাভাব এল। ফাঁসি-কক্ষের ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা স্বপ্নে

দেখলেন। তন্দ্রা কেটে গেল। এক লাফে অন্ধকার বিছানায় উঠে বসে পড়লেন, আর ঘুম এল না। বাকী রাত্রিটুকু নিরবচ্ছিন্ন আতঙ্কের মধ্যেই কাটাতে হ'ল তাঁকে।

আরও কয়েকদিন কেটে গেল। মিসেস গ্রাণ্ট ফাঁসী-কক্ষের ভয়ঙ্কর সে-দৃশ্যটা প্রায়ই দেখতে লাগলেন। ব্যাপারটা এতদিন ছোট-বোন ইরমা'র কাছে সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত এমন হ'ল যে, তাঁর কাছে আর সেটা গোপন করতে পারলেন না। এক বিকেলে বলেই ফেল্‌লেন ইরমা, আমে সত্যি দেখেছি! উঃ কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য! ভাবলেই আতঙ্কে আমার বুক পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়!'

'—দেখেছ? কি দেখেছ? কি ব্যাপার বলত দিদি?

'—পিটার ম্যাসন আর তাঁর স্ত্রীকে? যাকে পিটার ম্যাসন গলা টিপে হত্যা করে শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী হয়েছিলেন। ফাঁসি-কক্ষে তাদের ভয়ঙ্কর সে-দৃশ্য -'

ইরমা'র মধ্যে অকস্মাৎ এক ভাষান্তর ঘটে গেল। মিসেস গ্রাণ্ট তাঁর চোখ-মুখের পরিবর্তনটুকু লক্ষ্য করলেন না। আচমকা তাঁর বুকের মধ্যে কেমন একটা অনাবিল আনন্দের ঝিলিক খেলে গেল। তিনি ভাবলেন, দিদির মনের কোণে যে-দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, সে নিরবচ্ছিন্ন আতঙ্ক দানা বেঁধেছে তা যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় তবে তা হবে তাঁর পক্ষে ভগবানের আশীর্বাদস্বরূপ। আর তারই ফলে তাঁর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ব্যস, তখন আর তাঁকে পায় কে! দিদির যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন একমাত্র তিনিই। অতএব দিদির কথায় কর্ণপাত করা চলবে না। সে ঘরে যা ঘটছে ঘ'টে যাক। তার পরিণতি যা হয় হোক গে। তাই কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিকতাটুকু অব্যাহত রেখেই তিনি জোর ক'রে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে বল্‌লেন—'কেন মিছে ব্যাপারটাকে নিয়ে তুমি ভেবে আকুল হচ্ছ, আমি ভেবে পাচ্ছিনে দিদি! ব্যাপারটা নিছকই কল্পনা। তোমার মনের দুর্বলতা ছাড়া কিছুই নয়।

'—আমার কিন্তু ভাল ঠেকছে না ইরমা। মনে হয় বাড়িটা ছেড়ে অন্যত্র চ'লে গেলেই ভাল হ'ত।'

'—তোমাকে নিয়ে আর পারি নে দিদি। পাগলের মত তখন থেকে কী যে ব'কে চলেছ, আমার মাথায় আসছে না! কে, কি ব'লে গেল তা

নিয়ে পাগলের মত প্রলাপ বকতে শুরু ক'রে দিয়েছ।'

'—বিশ্বাস কর ইরমা। আমি নিজের চোখে দেখেছি! তাদের সে বীভৎস্য চেহারা আমি নিজের চোখে দেখেছি বলেই ত তোকে এমন ক'রে বলছি।' দৃঢ়তার সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো ব'লে গেলেন।

' তবুও তুমি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই এমন সব কথা বলছ দিদি। আসলে আমাদের পাশের রাস্তার বিজলী বাতির আলোকরশ্মি এমনভাবে ফাঁসি-কক্ষটায় ঢোকে যার ফলে লম্বাটে একটা ছায়ার সৃষ্টি হয়। তারই ফলে হঠাৎ দেখলে মনে হয় কড়িকাঠ থেকে কি যেন ঝুলছে। ছায়াটা আমিও যে দেখিনি তা নয়। আর সেটা দেখেই তুমি আতঙ্কে এমন মুষড়ে পড়বে আমি কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি। ঠিক আছে, আমি আজ সন্ধ্যায় তোমার সঙ্গে সে-ঘরে যাব। দেখব, কোথায় পিটার ম্যাসন আর কোথাই বা তাঁর স্ত্রীর দেহ।'

পরদিন ইরমা তাঁর দিদিকে নিয়ে ফাঁসি-কক্ষে দিদির হাত শক্ত ক'রে চেপে ধরলেন। ঘরের ভেতরে আবছা অন্ধকার। ইরমা ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। একটা ঝুলন্ত ছায়া তার চোখে পড়ল। ব্যাপারটা না দেখার ভান ক রে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। মিসেস গ্রাণ্ট তাঁকে শক্ত ক'রে জাপ্টে ধরে বল্লেন -'কিরে, এবার আমার কথার সত্যতা যাচাই হল ত? ইরমা জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে বললেন কই, আমি ত কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে! আমি এখনও বলছি, ওসব তোমার মনের ভুল। মিথ্যা আতঙ্কে তুমি নিজেকে পীড়া দিচ্ছ দিদি।'

'- সে কীরে! ওই ওই যে ওটা ঝুলছে! দেখতে পাচ্ছিস নে তুই!'

পর মুহূর্তেই ছায়া মূর্তিটা মিলিয়ে গেল। মিসেস গ্রাণ্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লেন—'এই যা! মিলিয়ে গেল মূর্তিটা! তোকে আর দেখাতে পারলাম না।

'—তুমি আতঙ্কের রোগে ভুগছ দিদি। এমন অবস্থা হয়েছে তোমার যে রজ্জুকেই সর্প ব'লে ভ্রম হচ্ছে।'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিসেস গ্রাণ্ট বল্লেন 'তুই যা খুশী বলতে পারিস ইরমা। আমিও ব'লে রাখছি, এ-বাড়িতে আমি আর থাকছি না।' উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বল্লেন—'এখান থেকে চলেই যাব! দরকার হ'লে গাছতলায় গিয়ে থাকব, তবু এ-বাড়িতে আর নয়!'

'—আমি কিন্তু তোমার প্রস্তাবকে মোটেই সাধুবাদ জানাতে পারছি না দিদি। যার আতঙ্কে তুমি বাড়ি ছেড়ে পালাতে যাচ্ছ তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমাধানের উপযুক্ত পথ একটা খুঁজে বের করতে পারছ না।'

মিসেস গ্রাণ্ট একটু দমে গেলেন। নিজের মনকে শক্ত ক'রে বাঁধলেন। জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে বল্‌লেন 'ঠিক আছে বোন, তোর কথাই মেনে নিলাম।' ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করলেন। এবারও বোনের প্রকৃত মনোভাব বোঝার চেষ্টা করলেন না।

সকাল হ'ল। মিস বারবার এ্যালেন আবার অলক্ষুণে বাড়িটার দরজায় হাজির হলেন। মিসেস গ্রাণ্ট-এর ঘরে গেলেন। মিস এ্যালেন হঠাৎ মিসেস গ্রাণ্ট-এর মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। লক্ষ্য করলেন, তাঁর মুখাবয়ব কেমন ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে গেছে। চোখের কোলে গাঢ় কালির প্রলেপ। চোখের মণি দুটো গর্তে বসে গেছে। মিস এ্যালেন সতর্কতার সঙ্গে বাড়িটার প্রসঙ্গ উত্থাপন না করে পারিবারিক ব্যাপার স্যাপার নিয়ে কথা বলতে লাগলেন। ইরমা পাশের ঘরে। এক সময় মিসেস গ্রাণ্ট'কে কেমন বেশী রকম বিমর্ষ দেখে বাড়িটার ব্যাপারে কথা বলার উপযুক্ত সময় জ্ঞান ক'রে বল্‌লেন 'মিসেস গ্রাণ্ট, এখনও বাড়িটা আঁকড়ে রয়েছেন, আমি কিন্তু খুবই অবাক হচ্ছি!'

'—হ্যাঁ, তা-ত দেখতেই পাচ্ছেন মিস এ্যালেন।' মিসেস গ্রাণ্ট-এর কণ্ঠস্বর আগের মত অতটা ঝাঁঝাল নয়, মিস এ্যালেন এটুকু অন্ততঃ লক্ষ্য করলেন। কেমন একটা নিরবচ্ছিন্ন ভীতি ও আতঙ্ক তাঁর ভেতরটাকে অনবরত কুরে কুরে খাচ্ছে, বুঝতে অসুবিধা হ'ল না তাঁর।

মিস এ্যালেন উৎসাহিত হয়ে এবার মোক্ষম অস্ত্রটা ছুঁড়ে দিলেন—'আমি শুনেছি, আপনি ভয়ঙ্কর সে দৃশ্যটা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। আমি আবারও উপযাচক হয়ে ছুটে এসেছি পুরনো সে অনুরোধটাই তুলে ধরতে—' আমি বলছি, আপনি অলক্ষুণে বাড়িটা ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। তার ঝুলন্ত দেহটাকে যখন একাধিকবার দেখেছেন তখন ফাঁসি কক্ষটাকেও সচল হয়ে উঠতে অবশ্যই দেখতে পাবেন। আপনাকে হয়ত আমি ঠিক বুঝিয়ে উঠতে পারছি না, কী বীভৎস দৃশ্য! ঠিক যেন দ্বিতীয় নরক। একবার যদি দৃশ্যটা আপনার মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে তবে কী' যে ভয়ঙ্কর পরিণতি হবে অনুমানও করতে পারছেন না!'

'—সে-কথা পরে হবে। আগে বলুন ত আমি যে যে দৃশ্য দেখেছি

তা আপনি জানলেন কি ক'রে ?'

'—বলে নি কেউ-ই। তবে কি আপনার চোখ-মুখই আমাকে একথা ভাবতে সাহায্য করছে মিসেস গ্রাণ্ট। আমি ত ভালই জানি, ভয়ঙ্কর সে দৃশ্যটা দ্রষ্টার ওপর কী অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে! আমি ঝুলন্ত সে বীভৎস লোকটাকে নিজের চোখে দেখেছি। আর মেঝেতে এলিয়ে প'ড়ে থাকা সে মহিলার বিকৃত চোখ্-মুখটাও প্রতিনিয়ত আমার চোখের ওপর ভাসছে। সব চেয়ে বড় কথা, আমার বোন অ্যাবি'র ভয়ঙ্কর সে মুখটার কথা আমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মন থেকে মুছে ফেলতে পারব না মিসেস গ্রাণ্ট। তার গলার বসে যাওয়া গাঢ় লাল দাগ, কোটর থেকে বেরিয়ে আসা বড় বড় চোখের মণি দুটো আর বিকৃত মুখে বেরিয়ে আসা জিভটাও যেন আমার চোখে আজও স্পষ্ট ভাসছে!'

কাঁপা কাঁপা গলায় মিসেস গ্রাণ্ট এবার বল্লেন—'হ্যাঁ, আমি তাদের দু'জনকেই দেখেছি মিস এ্যালেন। কিন্তু আমার এ-দেহটাকে কিছুতেই সত্য প্রমাণিত করতে পারছি না। আসলে আমার কোন ইরমা'র মধ্যে কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছি না।' এবার অধিকতর দৃঢ়তার সঙ্গে বল্লেন, —'গতকাল সে আমার সঙ্গেই ছিল, আমি স্পষ্ট দেখলাম রহস্য-জনক সে ঝুলন্ত দেহটাকে। কিন্তু সে কিছুতেই দেখতে পেল না। আশ্চর্য হতেই হ'ল।'

'—তিনি কি বল্লেন তখন ?

'—আগের মত তখনও ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দিল। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বল্ল, এ নাকি সম্পূর্ণ আমার দুর্বল মনের ব্যাপার স্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়।'

'—দেখুন মিসেস গ্রাণ্ট, তিনি যদি সত্যি সব কিছু দেখেও না দেখার ভান করেন, কিছুই দেখেন নি বলে থাকেন তবে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, তিনি অবশ্যই চান না আপনি এ-অলক্ষুণে বাড়িটা ছেড়ে অন্যত্র চ'লে যান। আমার বিশ্বাস, আপনার বোন ওই ঘরে খুব বেশী যাতায়াত করেন না। আমার কথার অর্থ, সতর্কতার সঙ্গে তিনি নিজে ওই ঘরটাকে এড়িয়ে চলেন। যদি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে একটু লক্ষ্য করেন তবে আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন। আমার মন্তব্য করা উচিত নয় জেনেও আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি মিসেস গ্রাণ্ট, আপনি এ-বাড়িতে থাকলে, দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যুর শিকার হলে কোন না কোনদিক থেকে

আপনার বোন ইরমা উপকৃত হবেন। সে এখন পূর্ণ যুবতী। যৌবনের লক্ষণগুলো তার মধ্যে সুপ্রকট। স্বামী হারা কিন্তু আপনি তার মাথার ওপরে থাকায় সে যৌবনের সুখ-সুধা উপভোগ করতে পারছে না। প্রধান অন্তরায় আপনি যদি দুনিয়া থেকে সরে যান তবে দু'দিক থেকে সে নিশ্চিত। প্রথমতঃ যথেচ্ছ জীবন যাপনের সুবিধা। দ্বিতীয়তঃ আপনার যাবতীয় সম্পত্তির অধিকারী হবে সে একাই। তাই ত আপনাকে এ-বাড়িতে রেখে দেয়া তার ঐকান্তিক আগ্রহ।

মিস এ্যালেন-এর তাৎপর্যপূর্ণ কথাগুলো মিসেস গ্রাণ্ট'এর মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করল। আকস্মিক ভীতি ও আতঙ্কে তাঁর মুখ চকের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল। চোখ দুটো নিষ্প্রভ হয়ে এল। মুহূর্তে কেমন যেন মিইয়ে গেলেন। কথা বলার মত সামান্যতম শক্তিও যেন তাঁর মধ্যে অবশিষ্ট নেই। তবু ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—'আমি বিশ্বাস করি না মিস এ্যালেন। আমার বোন ইরমা সম্বন্ধে এমন জঘন্য কথা ভাবতে আমি তিলমাত্র উৎসাহও পাচ্ছি না। আপনি ভবিষ্যতে এ ধরনের কোন কথা আমাদের বাড়ি ব'য়ে এসে বলেন, আমি চাই না। ইরমা সম্বন্ধে আপনি যা কিছু বল্‌লেন, সবই ডাহা মিথ্যা ও অচিন্ত্যনীয়!

মিস এ্যালেন এত সহজে দমবার পাত্রী নন। সাহসে ভর করে এবার বল্‌লেন—আপনি যা-ই বলুন না কেন মিসেস গ্রাণ্ট, আমি কিন্তু আমার বক্তব্যের একটা শব্দও উঠিয়ে নিতে উৎসাহী নই। আমি আবারও বলছি দয়া করে এ-অলক্ষুণে বাড়িটা ছেড়ে চলে যান। আগামীকাল ভয়ঙ্কর একটা দিন! আগামীকাল কিছুতেই আপনার এ-বাড়িতে থাকা উচিত নয়। কাল বার্ষিকী সে-অভিশপ্ত দিনটার প্লিজ—।

মিস এ্যালান-এর কথা শেষ হবার আগেই ইরমা ঘরে ঢুকল। মিস এ্যালান-এর দিকে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকাল। কোন কথা না বলে মুহূর্ত কাল দাঁড়িয়ে থেকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আমি এ্যালান ইঙ্গিতে মিস গ্রাণ্ট'কে ইরমা'র আচরণের এ-বিশেষ দিকটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেন।

মিসেস গ্রাণ্ট সেদিন দুপুরেই মিস এ্যালান-এর বাড়ি হাজির হলেন। একথা-সেকথার পর নিজেই উৎসাহী হয়ে অলক্ষুণে বাড়িটার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। তিনি কোনরকম ভূমিকা না ক'রেই বললেন—'মিস এ্যালান, আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিনে ইরমা কেন বাড়িটা ছাড়তে কিছুতেই

রাজী হচ্ছে না! আর কেনই বা সে কড়িকাঠের ঝুলন্ত বিকৃত দেহটাকে দেখতে পায় না। এসবের পিছনে কী যে গভীর রহস্য লুকিয়ে রয়েছে, কিছুই মাথায় আসছে না আমার।

'—আমি ত আজ সকালেই এর সামান্য ইঙ্গিত দিয়েছিলাম মিসেস গ্রাণ্ট। আমার সতর্কবাণীকে মাথায় রেখে যদি আপনি ব্যাপারটা নিয়ে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করেন তবেই তার উদ্দেশ্যটা আপনার কাছে ফাঁস হয়ে যাবে। এতে তার দু'দিক থেকে সুবিধে। প্রথমতঃ আপনার বোনের দুরভিসন্ধিটা ধরতে পারবেন, আর আপনার কিছু একটা ঘটে গেলে তাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে।'

'—আমি এখন উকিলের বাড়ি যাব। ভাবছি সময় থাকতে আমার স্থাবর-অস্থাবর যা কিছু আছে, উইল ক'রে ফেলব। আপনি সঙ্গে গেলে ভাল হয়।'

মিসেস গ্রাণ্ট'কে সঙ্গদান করতে মিস এ্যালান উকিলের বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

বিকেলের দিকে তাঁরা উইল তৈরী করে উকিলের বাড়ি থেকে ফিরে এলেন। ইরমা বাড়িতেই রয়েছে। মিস এ্যালান দু'চারটে মামুলি কথাবার্তার পরই তাকে বল্লেন—,তোমার দিদি তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি উইল করলেন শুনেছ?'

ইরমা উইলের কথাটা শোনামাত্র চমকে উঠল। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে ব'লে উঠল—'তাই বুঝি? কই, আমি ত কিছুই জানি না!'

'—উচিত ছিল। আমার মনে হয় কোন দুর্ঘটনা ঘটার আগে তোমাদের এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত ছিল। আমি নিঃসন্দেহে এ-বাড়িতে অশুভ আত্মা—।

'—বাজে কথা! কাল্পনিক ঘটনার জাল ছড়ানো হচ্ছে বলেই আমি মনে করি।' কথাটা মিস এ্যালান-এর উদ্দেশে ছুঁড়ে দিয়েই ইরমা দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তার বুকে আনন্দ-উচ্ছ্বাস, আপন মনে সে বলতে লাগল—'তবে সত্যি একটা অঘটন অদূর ভবিষ্যতে ঘটতে চলেছে! আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ হতে আর দেরী নেই দেখছি!

ইরমা ঘর ছেড়ে চলে যাবার উদ্যোগ করলে মিস এ্যালান বল্লেন—'শোন ইরমা, তোমার দিদির উইলের বক্তব্য শোনার কৌতূহল যদি থাকে

তবে একটু অপেক্ষা কর।' ইরমা ঘুরে দাঁড়াল। মিস এ্যালান—'তোমার দিদির উইলের সারমর্ম হচ্ছে, তোমার ইচ্ছায় যদি তাঁর পক্ষে এ-বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র যাওয়া সম্ভব না হয়, আর যদি কোন দুর্ঘটনায় তাঁর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে তবে সবকিছুর মালিকানা স্বত্বলাভ করবে তুমি। তবে একটা শর্ত, তোমার জীবনটাও এ-অলক্ষুণে বাড়িতেই কাটাতে হবে।' কথাগুলো ইরমা'র উদ্দেশে ছুঁড়ে দিয়েই তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

ইরমা কিছুতেই মিস এ্যালেন-এর কথাগুলোকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, এরকম একটা উইল তাঁর দিদি কিছুতেই করতে পারলেন না। ভদ্রমহিলা নির্ঘাৎ মনগড়া কথা বলে তাঁকে শাসিয়ে গেলেন। তবে হ্যাঁ, যদি সত্যি অঘটন কিছু ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয় তার আগেই তিনি বাড়ি ছেড়ে পালাতে চেষ্টা করবেন। রাত্রিটা কাটল নির্বিবাদেই। মানসিক উদ্বেক-উৎকণ্ঠা মাথায় নিয়ে মিসেস গ্রাণ্ট বিছানা ছেড়ে উঠলেন। দুপুরে খাবার টেবিলে বসে তিনি বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বললেন—'ইরমা, এ-বাড়িতে এক মুহূর্তও আমার মন টিকছে না। আজই আমি এ-অলক্ষুণে বাড়িটা ছেড়ে চলে যাব।'

'—দিদি, শেষ পর্যন্ত একটা কাল্পনিক অলৌকিক ঘটনাকেই তুমি পুরোপুরি মনে গেঁথে ফেললে! তুমি দেখছি একেবারে ভেঙ্গে পড়েছ! তোমার শরীর ও মন কোনটাই সুস্থ নয়। আমার মনে হয় ডাক্তারকে খবর দিয়ে আনা দরকার।'

মিসেস গ্রাণ্ট শেষ পর্যন্ত ইরমা'র কাছে আত্মসমর্পণ না করে পারলেন না। বাড়ি ছাড়ার সিদ্ধান্ত তাঁকে ত্যাগ করতেই হ'ল। এদিকে ইরমা অধীর অপেক্ষায় রয়েছেন, তাঁর দিদি কখন ফাঁসি-কক্ষে গিয়ে ঢুকবেন। তাঁর মন এতই দুর্বল হয়ে পড়েছে ভয়ঙ্কর সে দৃশ্যটা আবার চোখের সামনে দেখার পর আজই তাঁর মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়ে যেতে পারে। ব্যস, তবেই ব্যাঙ্কের টাকাকড়ি ও অন্যান্য যাবতীয় সম্পত্তি তাঁর হাতের মুঠোয় চলে আসবে। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিয়ে এক সময় কাতর মিনতি স্বরে বললেন—'দিদি, একটা কাজ করে দেবে—প্যানেল্‌ড রুমে আমার আংটিটা ফেলে চলে এসেছি। যদি দয়া করে এনে দাও খুব উপকার হয়।' সেলাই করতে করতে কথাটা বললেন। এমন একটা ভাব দেখালেন যেন সেলাই ফেলে মিনিট খানেকের জন্য উঠলেও বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে।

মিসেস গ্রাণ্ট ভাবলেন, ফাঁসি কক্ষের ব্যাপারটা হয়ত মনের ভুলও হতে পারে। অবুঝ মনের ব্যাপার। অন্ধ কুসংস্কারের বশবর্তী হয়েই তিনি আতঙ্কে এমন মুষড়ে পড়েছেন। তাই তিনি একটা জ্বলন্ত মোম হাতে নিয়ে এগিয়ে চললেন ঘরটার দিকে। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন।

বাড়িটা হঠাৎ যেন অস্বাভাবিক নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল। ঠিক সে মুহূর্তেই ভয়ার্ত চীৎকার ইরমা'র কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটিল ফাঁসি-কক্ষের দিকে। দরজার কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দেখলেন ঘরের মাঝখানে মিসেস গ্রাণ্ট পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল নিথরভাবে দাঁড়িয়ে। বড় বড় চোখ করে কড়িকাঠের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। শ্বাস রুদ্ধ প্রায়। কোন রকমে গোঙাতে গোঙাতে কি যেন বলার চেষ্টা করছেন। খুবই ক্ষীণ সে কণ্ঠস্বর! কোন অদৃশ্য হাত যেন সজোরে তাঁর কণ্ঠনালীটা চেপে ধরেছে। দেহ থেকে মুণ্ডটাকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছে। ইরমা ব্যস্ত পায়ে ঘরে ঢুকে তাঁকে ধরার আগেই আচমকা আছাড় খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন। ইরমা এমন কোন অলৌকিক শক্তির উপস্থিতি অনুমান করলেন যার ফলে তিনি বারবার শিউরে উঠতে লাগলেন। স্পষ্ট বুঝতে পারলেন তার দিদির শ্বাসক্রিয়া হঠাৎ কেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। এবার হয়ত তাঁর পালা। দ্রুত ঘর ছেড়ে পালাতে না পারলে তার পরিণতিও তাঁর দিদিরই মত হয়ে যাবে। বরফ শীতল একটা হাত হয়ত তার কণ্ঠ লক্ষ্য করে এগিয়ে আসবে। ব্যস, তারপরই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে। আতঙ্ক মাখানো অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে সে আবার তার দিদির নিশ্চল নিথর দেহটার দিকে তাকাল। স্পষ্ট দেখতে পেল, তাঁর গলার বন্ধনীটা আলগা হয়ে গেছে, আর গলায় সুস্পষ্ট একটা কালসিটে পড়া দাগ। সবেমাত্র কেউ যেন তাঁকে গলা টিপে হত্যা করে গেছে।

ইতিমধ্যে ছোট্ট মেয়ে কলিন ইরমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে কৌতূহলাপন্ন হয়ে বলে উঠল—'আবার কি প্যানেল্‌ড রুমটাকে ঘোরাবে? বল না, ঘোরাবে নাকি? আমি এটাকে ঘুরতে দেখেছি। এই ত একটু আগেই দেখলাম, দু'তিনবার দুলেই ঘুরতে লাগল।

'—বাজে কথা! চুপ কর কলিন! এখানে কিছুই ঘোরে নি।' কথা বলতে বলতে সে ছোট্ট মেয়ে কলিন-এর ওপর উন্মাদিনীর মত

ঝাঁপিয়ে পড়ল। কলিন তীব্র আর্তনাদ ক'রে উঠল। তাকে বারবার ঝাঁকুনি দিয়ে তীব্র আর্তনাদ করে বলে উঠল—না, ঘোরে নি। দোলেনি! কিছুই দেখিস নি কলিন! কিছুই দেখিস নি! সব ভুল, সব মিথ্যা! না—না কলিন! শোন, আমার কথা শোন, বিশ্বাস কর—কিছু দেখিস নি তুই। কিছুই না।' ইরমা করুণ আর্তনাদ করতে করতে কলিন-এর হাত দুটো শক্ত করে চেপে ধরে তাকে সজোরে ঝাঁকুনি দিতে লাগল।

———

রিচার্ড স্মিথ! আমার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু রিচার্ড স্মিথ।

লণ্ডনে পড়তে আসায় আমার হোস্টেল জীবন শুরু হ'ল। এখানে পড়তে আসার পর সহাধ্যায়ীদের মধ্যে রিচার্ড স্মিথকেই সব চেয়ে বেশী পছন্দ হয়েছিল আমার। কি জানি কেন রিচার্ডও আমাকে খুব ভালবেসে ফেলে। সত্যি বলতে কি আমার হোস্টেলের বন্ধুদের মধ্যে সে-ই ছিল আমার সব চেয়ে কাছের আত্মার আত্মীয়। আমরা সমবয়সী ছিলাম না। বয়সেই বেশ পার্থক্য থাকলেও আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিল।

রিচার্ড-এর সাহচর্যে আমার হোস্টেল-জীবন বেশ সুখেই কাটতে লাগল। এক সকালে প্রাতরাশ সেরে আমি ও রিচার্ড বাড়ির গাড়ী বারান্দায় দাঁড়িয়ে পথচারী মানুষ ও গাড়ীগুলোকে দেখছি। আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা স্মিথ আমাকে আলতোভাবে ধাক্কা দিয়ে বল্‌ল—'শুনছিস?'

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে তাকালাম। চোখের তারায় জিজ্ঞাসার ছাপ এঁকে বললাম—'কি? কিছু বলছিস?'

রিচার্ড পথের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বলল—'ঐ যে লোকটা হেঁটে যাচ্ছে. দেখতে পাচ্ছিস?'

'—হ্যাঁ। হয়েছে কি?'

'—চিনিস? লোকটাকে চিনিস?'

আমি ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বল্‌লাম—'না চেনার কি হ'ল?'

'—কে?'

'—ভদ্রলোক ত প্রায়ই আমার কাছে আসেন। তুই আমার ঘরে ওনাকে দেখিস নি কোনদিন? ভদ্রলোকের নাম থিয়োফাইল ম্যাগন্যান্। মনে করে দেখ, নির্ঘাৎ তাকে এখানে দেখে থাকবি।'

থিয়োফাইল ম্যাগন্যান্ সম্বন্ধে রিচার্ড-এর আগ্রহের প্রাবল্য দেখে আমি ভাবলাম, সে হয়ত তাঁর অগাধ ধন-দৌলত, নগদ অর্থ আর রমরমা ব্যবসা সম্বন্ধে গল্পের ঝোলার মুখ খুলে দেবে।

রিচার্ড আমাকে রীতিমত অবাকই ক'রে দিল। থিয়োফাইল ম্যাগন্যান-এর বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে একটা শব্দও উচ্চারণ করল না। বরং মুচকি হেসে আমার একটা হাত জড়িয়ে ধ'রে বলে উঠল—'তোকে একটা অনুরোধ করতে চাই, রাখবি ত?

'—আমি ভালই জানি, তুই এমন অনুরোধ অবশ্যই করবি না যা আমার সামর্থের বাইরে। যাক, তোর অনুরোধটা কি জানতে পারি কি?'

'—আজ আমার সঙ্গে তোকে নৈশ-ভোজ সারতে হবে।'

আমি হেসে বল্‌লাম—'এ-ত আনন্দের কথা। পাশাপাশি বসে দুই বন্ধু গল্প করতে করতে খাওয়া যাবে। কী মজাই না হবে, কি বলিস।'

'—হ্যাঁ খেতে খেতে তোকে আমার জীবনের অতীত-স্মৃতির পাতা থেকে টুকরো টুকরো বিস্ময়কর কিছু ঘটনার কথা বলব। তবে মনে থাকে যেন, যা কিছু বলব সবই গোপনীয় কিন্তু। তবে একটু

দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি, যা-যা বলব তার ফলে বিশ্বের বহু বিস্ময়কর ঘটনাকেই জোলো ব'লে মনে হবে। দেখে নিস একেবারে চমকে যাবি।'

রিচার্ড হোস্টেলের পাঁচ তলার একটা ঘরে থাকে। তার কথাবার্তা ও ব্যবহারে তার মার্জিত ও সৌখীন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তার ঘরের কারুকার্য খচিত ফুলদানি, অত্যাধুনিক চমৎকার বৈদ্যুতিক আলো, নক্সাকরা আবলুশ কাঠের, তুলতুলে বিছানায় নক্সাকরা দামী চাদর আর সৌখীন চেয়ার-টেবিল প্রভৃতির প্রত্যেকটাতে আর রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

নৈশ-ভোজ সেরে রিচার্ড আমাকে নিয়ে জ্বলন্ত চুল্লির ধারে বসল। আমরা চেয়ার পেতে উভয়ে মুখোমুখি বসে আগুন পোহাতে লাগলাম।' রিচার্ড তার অতীত জীবনের কথা টুকরো টুকরো ঘটনার কথা আমাকে গল্পাকারে শোনাতে লাগল। আগুনের দিকে হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে সে বল্‌ল 'বেশ কিছুদিন আগের কথা অবশ্য—'আমি খুবই গরীব ছিলাম। ফরাসীদের গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি এঁকে বেড়াতাম। মনে করতে পার এটাই ছিল তখন আমার পেশা। সে সময়ে আরও দু'জন শিল্পীর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তারা ছবি আঁকত বটে। কিন্তু পেটের ভাত জোগাড় হত না।

তাদের একজনের নাম ছিল পল—পল গ্র্যাজে। আর দ্বিতীয় জনের নাম ছিল কার্ল বোল্যাঞ্জার। আমার জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে কূল কিনারা খুঁজে পেতাম না, এত ভাল ছবি আঁকত তারা অথচ খদ্দের জোগাড় হত না। ফলে অর্থাভাবে জর্জরিত হতে লাগল। আমাদের ভ্রাম্যমান চিত্র-শিল্পীর দলটাকে যখন দিনের পর দিন অনাহার আর অর্ধাহারের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছিল তখন এক সহৃদয় গ্রামবাসী আমাদের দিকে সদয় হাত বাড়িয়ে দিল। তবে এর একটা বিশেষ কারণও ছিল। গরীব সে লোকটারও আমাদের মতই ছবি আঁকার বাতিক ছিল। কাজের ফাঁকে একটু ফুরসত পেলেই রঙ-তুলি নিয়ে বসে পড়ত আমাদের আশ্রয়দাতা চাষীটি। তার নাম কি জান?—ফ্রাঞ্জ মাইটেল।

'—কি নাম বল্‌লে, ফ্র্যাঞ্জ মাইটেল? পৃথিবী বিখ্যাত চিত্রশিল্পী মাইটেল-এর কথা বলছ কি?'

'—হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ। পৃথিবীর সেরা চিত্রকর ফ্র্যাঞ্জ মাইটেল-এর

কথাই বলছি। আমি যখনকার কথা বলছি তখন কিন্তু তাঁর নাম ডাক মোটেই ছিল না। পৃথিবী বিখ্যাত ত দূরের কথা আশেপাশে গ্রামের মানুষগুলোর কাছেও চিত্রশিল্পী হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল না।

'—তাঁর জীবনের একেবারে গোড়ার দিককার কথা বলছ, তাই না?'

'—হ্যাঁ, ঠিক তা-ই।'

'—হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, যে সময়ের কথা বলছি তখন মাইটেল-এর আর্থিক স্বচ্ছলতাও ছিলই না, বরং অভাব-অনটনের মধ্যেই তাকে দিন গুজরান করতে হত। চিত্রকর মাইটেল আর আমরা তিন বন্ধু মিলে রাতের পর রাত নিরবচ্ছিন্ন ধৈর্য ও অধ্যবসায় সম্বল ক'রে একের পর এক ছবি এঁকে জমা করতে লাগলাম। ক্রমে ছবির স্তূপ প'ড়ে গেল। আর পাল্লা দিয়ে বাজারে সর্বত্র আমাদের দেনার পাহাড় জমতে লাগল। ধোপা নাপিত, মুদি, গয়লা প্রভৃতি সবাই আমাদের কাছে মোটা অর্থ পায়। ধারের বোঝা-ক্রমে বেড়েই চল্‌ল। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়াল যে, পাওনাদারদের তাগাদার ভয়ে বাড়ি থেকে বেরনোই আমাদের পক্ষে দুষ্কর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। ঘরের কোণে বসে ছবি আঁকলে মন ভরে বটে, কিন্তু পেট মানবে কেন?

আমাদের জীবনধারণ যখন কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়াল তখন আমরা চার চিত্রশিল্পী মিলে এক বৈঠকে সামিল হলাম! সবচেয়ে বেশী সমস্যায় পড়তে হল কার্ল বোল্যাঞ্জার'কে নিয়ে। কখনও আধবেলা খেয়ে আবার কখনও বা নিরম্ব উপবাসে কাটিয়ে কাটিয়ে তার মেজাজ একেবারে তিড়িক্কী হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত তার পরিস্থিতি এমন হ'ল যে, ভাল কথাতেও রেগেমেগে কাঁই হয়ে যেত। যাক, বৈঠকে সামিল হলাম আমরা। একথা-সেকথার পর কার্ল বোল্যাঞ্জার বেশ একটু চড়া সুরেই ব'লে উঠল —'কি ব্যাপার কিছুই মাথায় আসছে না! একটা কথা বুঝছি না, আমাদের আঁকা ছবিগুলি কি সত্যি সুদৃশ্য ও তারিফ পাওয়ার মত হচ্ছে না? নইলে—'

তাকে মুখের কথা শেষ করতে না দিয়ে পল গ্র্যাজে ব'লে উঠল— 'অবশ্যই। এতে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশও নেই বন্ধু।

'—এক কাজ করলে কেমন হয়?'

'—কি! কিসের কথা বলছিস কার্ল?'

'—আমাদের আঁকা ছবিগুলোকে যদি অন্য কারো নামে চালাবার

চেষ্টা করা যায় ?' পল গ্র্যাজে কপালের চামড়ায় ভাঁজ ফেলে সবিস্ময়ে বল্‌ল—'অন্য কারো নামে। কি বলতে চাচ্ছিস একটু খোলসা করে বলত কার্ল।'

'—এ-ত খুবই সহজ-সরল কথা। আমাদের আঁকা ছবিগুলোর নীচে কোন প্রখ্যাত শিল্পীর নাম লিখে তাঁর আঁকা ছবি বলে চালিয়ে দিলে ত আর বিক্রির সমস্যা থাকে না। বরং চড়া দামে হুড়মুড় করে বিক্রি হয়ে যাবে। আমি ভেবে নিয়েছি, তা-ই করব। ছবির নীচে বিখ্যাত কোন শিল্পীর নাম লিখে দেব।'

উপস্থিত সবার নজর এবার কার্ল-এর ওপর নিবদ্ধ হল। কার্ল কিন্তু কোনদিকে না তাকিয়ে, তাদের মনের কথা বোঝার চেষ্টা না করেই বলে চল্‌ল—'আজ পরম সত্যোপলব্ধি আমার হয়েছে।'

আমাদের সবার চোখে বিস্ময়ের ছাপ। অপলক চোখে কার্ল-এর দিকে তাকিয়ে রইলাম আমরা সবাই।

কার্ল বলে চল্‌ল—'হ্যাঁ, এক পরম সত্যের সন্ধান আমি আজ পেয়েছি।'

'—কি সে সত্য বন্ধু ?'

'—মানব ইতিহাসের ভিত্তির ওপর পতিষ্ঠিত এক পরম সত্য।'

'—কি সে নিগূঢ় সত্য কার্ল ?'

'—ইতিহাসে ভুরিভুরি প্রমাণ আছে, অখ্যাত, অবজ্ঞাত ও অবহেলিত শিল্পীরা মৃত্যুর পর যথাযোগ্য মর্যাদা পায়। সবাই তখন তার শিল্প-কীর্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে।'

,—হ্যাঁ, এমন ঘটনা ইতিহাসে বিরল নয় বটে।'

'—তাই বলছি কি, আমাদের মধ্যে একজনকে বাকী তিনজনের স্বার্থের কথা ভেবে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতে হবে।'

আমরা সবাই চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে কার্ল-এর মুখের দিকে তাকালাম।

কার্ল বলে চল্‌ল—'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছি বন্ধুগণ। এছাড়া অন্য কোন পথ দেখছি নে। একজনের প্রাণনাশের মধ্য দিয়েই কেবল বাকী তিন-জনের জীবন রক্ষা পেতে পারে।

পল গ্র্যাজে সচকিত হয়ে বল্‌ল 'কার্ল !'

,—হ্যাঁ পল, ঠিকই বলেছি। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে চারজনের মধ্যে

কে মারবে তাই না ? কে নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগে উৎসাহী হবে ?'

উপস্থিত সবাই নির্বাক।

কার্ল এবার অধিকতর দৃঢ়তার সঙ্গে বলল —'কে মরবে তা নির্দ্ধারণের উপায়ও আমি ভেবে নিয়েছি। লটারীর মাধ্যমে আমরা অনায়াসেই তা স্থির করে নিতে পারি। আজ রাত্রেই লটারী করে ব্যাপারটার একটা হিল্লে ক'রে ফেলা যাক, কি বলিস তোরা ?'

ফ্র্যাঞ্জ মাইটেল চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লেন—'চমৎকার প্রস্তাব। আমি কিন্তু বলব, দিনের পর দিন অনাহারে অর্দ্ধাহারে কষ্ট পেয়ে এভাবে তিলে তিলে শুকিয়ে মরার চেয়ে এ-পথ বেছে নেয়া অনেকাংশে শ্রেয়। কার্ল-এর পরিকল্পনার প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে!'

কার্ল হাতের খালি গ্লাসটা টেবিলে সশব্দে রেখে সোল্লাসে বলে উঠল —'এই ত চাই!'

পল আর আমি কি বলব, সহসা ভেবে উঠতে পারলাম না।

কার্ল এবার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলতে লাগল— 'আমি কেবলমাত্র আমার পরিকল্পনার কথাই বলেছি। কিন্তু তার পরও অনেক কথা থেকে যায়।'

ফ্রাঞ্জে মাইটেল সোজা হয়ে বসে অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করে বললেন—

'—আর কি ? কি কথা ?'

'—আমার পরিকল্পনার সব কথা বল্লে আশাকরি আর কারো কিছু জিজ্ঞাসা থাকবে না।'

'—আমরা ত তা-ই শুনতে চাচ্ছি। বল, তোর সমস্ত পরিকল্পনাটা আমাদের কাছে বল কার্ল।'

'—লটারীর মাধ্যমে নির্দ্ধারণ করা হবে, কে মরবে এটুকু বলেছি। এবার বলছি, তাকে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করতে হবে না।'

'—তবে ?'

'—তিন মাস সময় পাবে সে।'

'—কারণ ? মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনেও তাকে কেন আবার তিনমাস জীবন ধারণের সুযোগ দেয়া হবে ?'

'—যে তিনমাস সে জীবিত থাকবে আমাদের স্বার্থেই তাকে এ-সুযোগ দেওয়া হবে। উক্ত তিনমাসের মধ্যে যত বেশী সম্ভব ছবি আঁকতে হবে তাকে। তবে আমরা আপাত দৃষ্টিতে যেসব ছবি দেখতে

পাই সেরকম মামুলি ছবি অবশ্যই নয়।

'—তবে?' মাইটেল সামনের দিকে ঝুঁকে আগ্রহ প্রকাশ ক'রে বললেন।

'—মামুলি ছবি বলতে আমি গাছপালা নদী-নালা বা পাহাড়-পর্বতের ছবির কথা বলতে চাইছি।'

'—তুমি তবে কিরকম ছবির ইঙ্গিত দিচ্ছ?'

'—যেমন কঙ্কালের ছবি, মানুষের মাথার খুলি, কঙ্কালের অংশ—বিশেষ, বিশালায়তন ও বিকট দর্শন কোন জন্তু জানোয়ারের ছবি।'

'...এরপর? তারপর আর কিছু?'

'—আর কিছু বলতে এমন সব ছবি আঁকতে হবে যার অর্থ উদ্ধার করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।'

'—তুই কি তবে বিচিত্র, মানে অর্থহীন উদ্ভট সব ছবির আঁকার কথা বলতে চাইছিস?'

'—ঠিক তা-ই। সে ছবির মাথামুণ্ডু কেউ বুঝতে পারবে না। এক কথায় ধরে নিতে পারিস ছবি বলতে থাকবে কেবল কতগুলো তুলির টান, ব্যস। প্রত্যেকটা ছবির নীচে তার স্বাক্ষর থাকবে। কেবলমাত্র তার স্বাক্ষরটা দেখেই সভ্য মানুষেরা তার মৃত্যুর পর তাঁর আঁকা ছবি বহু-মূল্য দিয়ে কিনতে উৎসাহী হয়ে উঠবে। শুধু কি তা-ই—'

'—আর কিছু?'

'—শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের কথাই বা বলি কেন? বিশ্বের সেরা যাদুঘরগুলো মৃত শিল্পীর আঁকা ছবিগুলো কেনার জন্য তীব্র প্রতি-যোগিতায় লিপ্ত হবে। ব্যস, আর দেখতে হবে না, ছবির দাম চড়চড় করে যাবে বেড়ে। অবশিষ্ট তিনজন, অর্থাৎ যারা জীবিত থাকবে তারা ফ্রান্সের বড় বড় শহরগুলোতে ঘুরে ঘুরে তার ছবির জোর প্রচার কার্যে লিপ্ত হবে। তার সুখ্যাতি গড়ে তোলার ব্রত উদ্‌যাপন করবে। তারপর যখন বুঝব, আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধির পথে অর্থাৎ শিল্পীর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে ঠিক তখনই আমরা তার মৃত্যু-সংবাদ দেব প্রচার করে। তারপর? তারপর তাঁর ভৌতিক শবযাত্রা বের করব।

ভৌতিক শবযাত্রা কথাটা কানে যাওয়ামাত্র আমরা সবাই সচকিত হয়ে এক সঙ্গে বলে উঠলাম—'সে কী রে। ভৌতিক শবযাত্রা আবার কি কথা রে!'

—হ্যাঁ। ঠিকই বলেছি। আমি আবারও বলছি, ভৌতিক শবযাত্রা।

'—ব্যাপারটা কি, খোল্‌সা করে বলছি ত কার্ল?'

কার্ল চোখে-মুখে দুষ্টুমিভরা হাসি ফুটিয়ে তুলে এবার বলল —'শোন তবে কেন ভৌতিক শবযাত্রার কথা বলছি। মিথ্যে মিথ্যে শবযাত্রা এবার বুঝতে পারছিস?

আমরা সবাই ফ্যাল ফ্যাল করে কার্ল-এর মুখের দিকে তাকালাম।

কার্ল বলে চলল —'আরে ভাই, যার শবযাত্রার কথা বলছি, সে—ত আসলে মরবে না। সে—ত ছদ্মনামে আমাদের সঙ্গেই এভাবেই মিলে-মিশে থেকে যাবে।'

'—তবে? কফিনে শবদেহ, কবর দেওয়া প্রভৃতি ব্যাপার স্যাপার-গুলোর কি হবে?'

' সেসব কথাও আমি ভেবে রেখেছি।'

' - তোর পরিকল্পনার পুরো ছবিটা আমাদের কাছে বলবি ত?' পল অধৈর্য হয়ে বলল।

কার্ল স্বাভাবিক স্বরেই জবাব দিল 'বলব। সবই ত এক এক করে বলছিলাম। তোরাই ত কথার মাঝখানে বার বার গেড়ো বাঁধাচ্ছিস। মোম দিয়ে একটা প্রমাণ সাইজের মনুষ্যমূর্তি তৈরী করব। কফিনে ভরে সেটাকে নিয়ে সবযাত্রা হবে। আর কবরস্থ করব সেটাকেই। তারপর কিছু কাজ বাকী রয়ে যাবে। যেমন কবর দেবার সময় আমরা আচ্ছাদিত মোমের পুতুলটার ওপর কেঁদে লুটিয়ে পড়ব। কবরস্থ করার পরও লুটোপুটি খেয়ে, বিলাপ করে কান্নাকাটি করব। সোজা কথা হচ্ছে, রীতিমত একটা শোকের পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে আমাদের।

'—আর? আর কিছু?'

'—ব্যস, এটুকুই। আমাদের খেয়াল থাকবে শোক প্রকাশের সময় যেন শিল্পক্ষেত্রে তার দক্ষতা, ভার গুণাবলীর কথাই সবার কাছে তুলে ধরা মুখ্য উদ্দেশ্য হয়।'

'—চমৎকার! চমৎকার পরিকল্পনা। এর চেয়ে ভাল কোন পরিকল্পনাই হতে পারে না। বেড়ে মতলব বের করেছ কার্ল"!' কথাটা বলেই ফ্রাঞ্জ ও মাইটেল সোল্লাসে নৃত্য জুড়ে দিলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে গলা জড়াজড়ি করে উদ্দাম নৃত্যে মেতে গেলাম ক্ষুধা-তৃষ্ণার

কথা আমাদের মন থেকে উবে গেল। আমরা সারা রাত্রি নির্ঘুম অবস্থায় কাটিয়ে পরিকল্পনাটা সম্বন্ধে আলোচনায় মগ্ন রইলাম।

লটারীর মাধ্যমে স্থির করতে হবে কে মৃত্যুবরণ করে বাকী শিল্পীদের জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করবে। কার্ল-এর ওপরই লটারীর ব্যাপারটা সম্পন্ন করার দায়িত্ব বর্তাল। হ'ল লটারী। ফ্রাঞ্জও মাইটেলই আমাদের পরিকল্পিত মৃত্যুবরণের জন্য তৈরী হলেন। লটারীতে তাঁর নামই উঠল।

কাহিনীর এ-পর্যন্ত ব'লে রিচার্ড স্মিথ গ্লাসের তলানিটুকু গলায় ঢেলে দিল। এবার গ্লাসটাকে সশব্দে টেবিলে রেখে বল্‌ল—আমার নিজের কথা কিছু এবার বলছি, শুনুন! আমি অলিন্সে হাজির হলাম। স্থানীয় মেয়রের বাড়ির সামনে এক ফালি ফাঁকা জায়গা পেয়ে সেটাকেই বেছে নিলাম আমার কর্মক্ষেত্র হিসেবে। আমার আঁকার সরঞ্জামাদি পেতে জুঁত করে বসে গেলাম। সামনেই সুন্দর একটা গীর্জা। আমি নিবিষ্ট চিত্তে গীর্জাটার ছবি আঁকার কাজে মেতে গেলাম। কৌশলটা কার্যকরী হচ্ছে, বুঝতে পারলাম যখন দেখলাম গৃহকর্তা ওপরের গাড়ীবারান্দা থেকে আমার কাজ দেখছেন। গভীর নিষ্ঠা সহকারেই দীর্ঘ সময় ধ'রে আমার কাজটা দেখে চলেছেন মেয়র মশাই। শেষে কৌতূহলের শিকার হয়ে গুটিগুটি নেমে এসে আমার পিছনে দাঁড়ালেন। ব্যাপারটা আমার নজরে পড়তেই আমি দিলাম তুলির গতি বাড়িয়ে। সে সঙ্গে এমন ভান করলাম, তাঁর উপস্থিতি বুঝতে পারা ও দূরের কথা অন্য কোন দিকেও যেন আমার তিলমাত্র খেয়াল নেই।

মেয়র মশাই ধীরে ধীরে আমার পাশে একটু জায়গা করে নিয়ে ব'সে পড়লেন। আমার বুঝতে অসুবিধে হ'ল না, তিনি গায়ে পড়ে আমার সঙ্গে গল্প জমাতে চাচ্ছেন। আমি তাঁকে আমল না দিয়ে ছবি আঁকার মধ্যে ডুবে রইলাম। আর মনে মনে বল্‌লাম—দেখাই যাক না ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত কি করেন। হ্যাঁ, আমার অভিপ্রায় মতই কাজ হল। ভদ্রলোক আগ্রহান্বিত হয়ে আমার খবরাখবর নিতে একের পর এক টুকরো টুকরো প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে লাগলেন। আমি তুলি টানার কাজ অব্যাহত রেখেই উত্তরদানের মাধ্যমে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করলাম। তিনি নানাভাবে আমার আঁকা ছবি ও শিল্প প্রতিভার প্রশংসা করতে লাগলেন। আমি কোনরকম আবেগ উচ্ছ্বাস প্রকাশ না ক'রে মুচকি হেসে তার কথায় সায়

দিয়ে চল্‌লাম।

আমি এতক্ষণ সুযোগের প্রত্যাশায় ছিলাম। এবার আমার অভীষ্ট সিদ্ধির সময় সমাগত ভেবে ব্যাগ থেকে একটা ছবি বের করলাম। ভদ্রলোক চোখের তারায় কৌতূহলের ছাপ এঁকে বল্‌লেন—'কার ছবি এটা?'

'—আশা করি ফ্র্যাঞ্জ মাইটেল-এর নাম অবশ্যই শুনেছেন?'

বিস্ময় ভরা চোখের মেয়র ভদ্রলোক আমার দিকে তাকালেন।

আমি ব'লে চল্‌লাম—'এটা সেই প্রখ্যাত চিত্র-শিল্পী ফ্র্যাঞ্জ মাইটেল-এর ছবি। আমার গুরু। আমি তাঁরই প্রিয় ছাত্র।

মেয়র মশাই নিজের অজ্ঞতার পরিচয় দিতে নিরুৎসাহী হলেন। আমার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই তিনি ব'লে উঠলেন—'সে কী মশাই! ফ্র্যাঞ্জ মাইটেল এত বড় একজন শিল্পী! তাঁর খ্যাতি ত আজ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এমন একজন কৃতী শিল্পীর নাম জানব না সে কী ক'রে হয়!

'—অবশ্যই। অবশ্যই।'

'—ফ্র্যাঞ্জ মাইটেল-এর নাম শুধুমাত্র যে কানেই শুনেছি তা-ই নয়।

'—তবে?'

'—আমার বৈঠকখানার শোভা বৃদ্ধি করছে প্রখ্যাত সে শিল্পীর আঁকা বেশ কয়েকটা ছবি। ভারী চমৎকার শিল্প কর্ম মশাই! তুলির টানে কোন দৃশ্যকে যে কত মনোরম ক'রে ভোলা যায় তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করলে অনুমান করা যায় না।'

'—দেখুন, আমার মহান গুরুদেবের আঁকা একটামাত্র শিল্পকর্মই আমার কাছে আছে। আপনার সঙ্গে কথা ব'লে বুঝতে পারলাম আপনি যথার্থই সমঝদার। চিত্রশিল্পের বিশেষ ক'রে আমার গুরুদেবের ছবির দিকে আপনার খুবই ঝোঁক। আমার কাছে তাঁর আঁকা যে ছবিটা রয়েছে তা আপনি আগ্রহী হলে বিক্রী করতে পারি। আপনাকে ব'লে রাখছি, গুরুদেব মাইটেল এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা ল'ড়ে চলেছেন। মৃত্যুর পর তাঁর আঁকা ছবির দাম হুহু ক'রে বেড়ে যাবে। আট শ ফ্রাঙ্ক পেলেই আমি মাইটেল-এর আঁকা ছবিটা আপনার হাতে তুলে দিতে পারি।

ব্যস, ওষুধে কাজ হয়েছে বুঝলাম। মেয়র মশাই সোজা কোটের পকেটে হাত চালান করে দিলেন। বের করে আনলেন একগাদা নোট।

তা থেকে আটশ' ফ্রাঙ্ক আমার হাতে গুঁজে দিলেন। আর একমুহূর্তও দেরী নয়। আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাঞ্ছিত ছবিটা হাতে করে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেলেন। শুধুমাত্র মেয়র মশাইকেই নয় ফরাসীর বহু ধনীর কাছে মাইটেল-এর আঁকা বিক্রি ক'রে অর্থোপার্জন করতে লাগলাম। তবে একটা কথা, একটার বেশী ছবি কিন্তু কারো কাছেই বিক্রি করিনি। বলতে চাইছি, কারো একেবারে মাথায় বাড়ি দেয়ার মত কাজ মোটেই করিনি। একটা কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করতেই হবে কার্ল-এর উপস্থিত বুদ্ধি আমাদের বাঁচার পথ দেখিয়ে দিল।

'—আর কিছু? তার পর আর কি করলি? রিচার্ড কৌতূহলাপন্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'—হ্যাঁ, আরও আছে। সত্যি বলতে কি, পরিকল্পনাকে পরিপূর্ণ রূপ দিতে গিয়ে যা কিছু কাজ তার অধিকাংশ কার্ল-ই করল। তারপর কি করল শোন—কার্ল ডেনমার্ক, প্যারিস, ভার্সাই লিয়ন্স প্রভৃতি শহরে প্রচলিত বিখ্যাত পত্রিকাগুলোতে ঘন ঘন বিজ্ঞাপন দিতে লাগল—প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ফ্রাঞ্জে মাইটেল আজ হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। তার চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের জন্য দেশবাসী মুক্ত হস্তে সাহায্য করুন। কেবলমাত্র ফরাসী খবরের কাগজগুলোতেই নয়। ইওরোপের বড় বড় শহরের বিখ্যাত খবরের কাগজগুলোতেও কার্ল উপরোক্ত মর্মে বিজ্ঞাপন দিতে লাগল। ফল হাতে হাতে পাওয়া গেল। চারদিক থেকে ফ্রাঞ্জ মাইটেল-এর চিকিৎসার নামে অগাধ অর্থাগম হতে লাগল। বাস্তবিকই আশাতীত ফল পাওয়া গেল।

একদিন কাগজে কাগজে ফ্রাঞ্জ মাইটেল-এর মৃত্যু-সংবাদ প্রচার করা হল। কথা বলতে বলতে রিচার্ড কয়েক মুহূর্তের জন্য থামল। একটু দম নিয়ে এবার বল্‌ল—'আশা করি শুনে থাকবি, দেশ-বিদেশের হাজার হাজার শিল্পরসিক ফ্রাঞ্জ মাইটেল-এর শবযাত্রায় যোগ দিয়েছিল।

ম্লানহেসে রিচার্ড এবার বল্‌ল—'শোকবিহ্বল শবযাত্রীদের অনেকেই কফিনে কাঁধ লাগানোর জন্য আগ্রহী হয়ে এগিয়ে এসেছিল। কাতর মিনতিও জানিয়েছিল বহুবার। আমরা সতর্কতার সঙ্গে তাদের কাকুতি মিনতি এগিয়ে গিয়েছিলাম। কারণ, বলা ত যায় না, কফিন ধরার সুযোগ পেলে তাদের কাছে আমাদের গোমর ফাঁস হয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল।'

'—তবে কি চার বন্ধু মিলেই কফিনটা বহন ক'রে নিয়ে গিয়েছিলি ?

'—ঠিক তা-ই। তাছাড়া উপায়ও ছিল না. বল্‌লামই ত।

'—কী কেলেঙ্কারী কথা রে বাবা! নিজের কফিন ফ্রাঞ্জ মাইটেল নিজেই বহন ক'রে কবরস্থলে নিয়ে গিয়েছিলেন ?

'—একেবারে শতকরা একশ' ভাগই সত্যি। তবে আশা করি বুঝতেই পারছিস, নিজের পরিচয়ে অবশ্যই নয়।'

'—সে-ত অবশ্যই হতে হবে। কিন্তু কি পরিচয় দিয়েছিলি তাঁর ?

'—ফ্রাঞ্জ মাইটেল-এর শোকবিহ্বল এক নিকট আত্মীয়ের পরিচয়ে তিনি নিজের কফিন নিজেই অবলীলাক্রমে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

'—সত্যই রোমাঞ্চকর। কেবলমাত্র আশ্চর্য বললে মনের ভাব যথাযথ ব্যক্ত করা হবে না। একেবারেই অকল্পনীয়!

'—সবই ত বুঝলাম, কিন্তু ফ্রাঞ্জ মাইটেল-এর পরিণতি কি হয়ে ছিল, বলবি কি ?'

'—বলব। তার আগে তোকে একটা কথা দিতে হবে।'

'—কি, কি কথা ?

কথা দে যা বলব গোপন রাখবি। কারো কাছে, কোন অবস্থাতেই কথাটা ফাঁস করতে পারবি না।'

'—কথা দিলাম। কারো কাছেই প্রকাশ করব না।'

'—সকালে গাড়ী-বারান্দায় দাঁড়িয়ে যে-ভদ্রলোককে দেখিয়েছিলাম, মনে পড়ছে ? থিয়োফাইল ম্যাগন্যান-এর কথা বলছি।'

'—লম্বা-লম্বা পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন যে-প্রৌঢ়, তাঁর কথা ত ?'

'—হ্যাঁ। ঐ ভদ্রলোকই চিত্রশিল্পী ফ্রাঞ্জ মাইলেট।

রিচার্ড স্মিথ-এর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই আমার শরীরের সব ক'টা স্নায়ু যেন এক সঙ্গে সচকিত হয়ে উঠল। মাথার ভেতরে আচহকা বিদ্যুতের শিহরণ খেলে গেল। চেয়ারটা অকস্মাৎ ট'লে উঠল। ভাগ্য ভাল যে, জ্বলন্ত চুল্লির ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়িনি। মাথাটা চক্কর মেরে উঠল। টাল সামলাতে না পেরে চেয়ারটা নিয়েই পড়ে গেলাম। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কতক্ষণ যে পড়েছিলাম নিশ্চিত বলতে পারব না।

———

আর্তনাদ

এ্যাডগার এলান পো

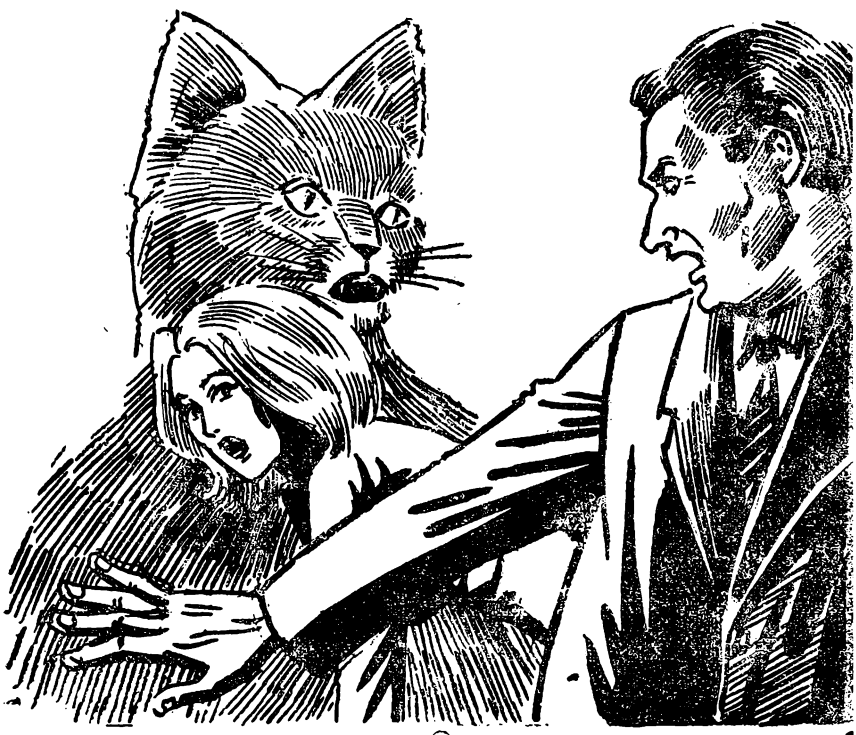

আমি পাগল নই !

বিশ্বাস করুন, সত্যি বলছি, আমি পাগল নই। অন্য দশজনের মতই আমি সুস্থ স্বাভাবিক। তাই এ-কাহিনীর অবতারণা করা আজ আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে। তা সত্ত্বেও অনেকের পক্ষে সহজে এটা বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। কিন্তু এর প্রমাণ যে আমার হাতেই রয়েছে। তবে কিছু না কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আমার মনের কোণেও উঁকি মারে। আমার ভবিষ্যৎ কি ? পৃথিবীর জল, মাটি আর বাতাস আমার পক্ষে আর ভোগ করা সম্ভব হবে কিনা তা-ই বা কে জানে ? তাই আগে ভাগে সবকিছু বলে নিজেকে হাল্কা করে নেবার প্রয়াসও একে মনে করতে পারেন।

আমার পারিবারিক কিছু ঘটনাই আমাকে আতঙ্কের যাঁতাকলে ফেলে তিলে তিলে পিষ্ট করেছে। আর তারই কিছু এলোমেলো ভয়ঙ্কর ভাবনা আমাকে কুরে কুরে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে।

আজ আমি জীবন্মৃত! দেহে প্রাণের অস্তিত্ব বর্তমান সত্য। ব্যস, এটুকুই। কথা দিচ্ছি, কিছু গোপন করব না। এক তিলও বাড়িয়ে বলারও চেষ্টা করব না। এটা ত ঠিকই, আমি যাকে ভয়াবহ বলে মনে করছি অন্যের কাছে তা-ই মামুলি একটা ব্যাপার বলেই মনে হতে পারে। তাঁরা হয়ত একে একটা নিছকই অস্বাভাবিক ঘটনা আখ্যা দিয়ে দায়মুক্ত হবেন। এমনও হতে পারে তথাকথিত শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ভবিষ্যতে রহস্যজনক বা অলৌকিক ব্যাপার বলে স্বীকার করবে না। কিন্তু এ-ও বিশ্বাস করুন, কাহিনীটা বর্ণনা করতে গিয়েই আমার মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার হচ্ছে। ভয়-ভীতিতে আমার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হচ্ছে! আমি সত্যি জীবন্মৃত।

শৈশবে আমি ছিলাম বড়ই দুর্বলচিত্ত। স্নেহ-মায়া-মমতা আমার মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত থাকায় আমার সঙ্গী-সাথীরা আমাকে নিয়ে হাসি-মস্করাও কম করত না। যাকে বলে একেবারে অতীষ্ট করে তুলত।

অতি শৈশব থেকেই পশুপাখী জীবজন্তুর প্রতি আমার মনে বিশেষ আকর্ষণ ছিল। আমি অত্যুৎসাহে তাদের পোষতাম। আমার বাবা-মা একাজে আমাকে বকাবকি না করে বরং উৎসাহই দিতেন। তাদের রক্ষণা-বেক্ষণেই আমার সারাদিনের বড় একটা ভগ্নাংশ কেটে যেত। বয়স বেড়ে গায়ে-গতরে বড় হয়ে ওঠার পরও আমার ভেতরের জীবজন্তু পোষার প্রবণতা কিছুমাত্র লোপ পায় নি। বরং ওটা আমার চরিত্রের বিশেষ একটা অঙ্গ হয়েই দাঁড়িয়েছিল। যারা চালাক চতুর আর বিশ্বস্ত কুকুর পোষেন তারা অবশ্যই স্বীকার করবেন, এর আনন্দ মনের কতখানি জায়গা জুড়ে থাকে। আর যাঁরা বন্ধুর কাছ থেকে অবিশ্বাস আর বিশ্বস্ততার অভাবের পরিচয় পেয়েছেন-তাঁরা পোষা জীবজন্তুর কাছ থেকে পাওয়া নিঃস্বার্থ আন্তরিকতা ও অনাবিল আনন্দকে আরও বেশী ক'রে উপলব্ধি করতে পারেন।

খুব অল্পবয়সেই আমি দারপরিগ্রহ করি। সব চেয়ে বড় কথা স্ত্রীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই মধুর ছিল। জীবজন্তুর প্রতি আমার প্রবণ-তাকে সে বরং আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিল এবং নানা ভাবে

আমাকে উৎসাহ দান করত।

আমাদের বাড়িতে রঙ-বেরঙের কত সব পাখী, কিছু সোনালী মাছ, ইঁদুর সুন্দর একটা কুকুর, একটা বিড়াল আর ছোট্ট একটা বানর ছিল।

আমাদের পোষা বিড়ালটা বেশ বড়সড় ছিল। বুদ্ধিও ধরত যথেষ্ট গায়ের লোমগুলো ছিল কুচকুচে কালো। আমার স্ত্রী কুসংস্কারের ধার ধারত না। তবু বিড়ালটা নিয়ে কথা উঠলে তার মুখটা কেমন যেন হঠাৎ মিইয়ে যেতে দেখতাম। বিষণ্ণমুখে বলত, আগেকার দিনে কালো বিড়ালকে লোকে ডাইনীর চর বলত।

আমি আদর ক'রে পোষা বিড়ালটাকে 'প্লুটো ব'লে ডাকতাম। আমার পোশা পশু পাখীর মধ্যে সে ছিল কাছের, সবচেয়ে আদরের। সব সময় আমার পাশাপাশি কাছাকাছি থাকত। এমন কি বাড়ি থেকে কোথাও যেতে হলে তাকে ছাড়া বেরনো ছিল খুবই সম্যার ব্যাপার।

কালো বিড়ালটার সঙ্গে আমার সত্যিকারের হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই তখন আমার মধ্যে কেমন যেন একটা শয়তানি খিটমিটে ভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। সবেতেই অধৈর্য— অল্পেতেই মাথা গরম করে ফেলতাম। আমার ভালবাসার পাত্রী স্ত্রীর প্রতিও খুবই অসহিষ্ণু ও উদাসীন হয়ে পড়েছিলাম। তার প্রতি অপ্রিয় উক্তি করতেও দ্বিধা করতাম না। ক্রমে এটাই আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ক্রমে অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকল, তার প্রতি দৈহিক অত্যাচার করতেও আমি মোটেই পিছপা হতাম না। শুধু কি এ-ই? আমার অন্যান্য যেসব পশু-পাখী ছিল তাদের প্রতি কেমন যেন একটা অবজ্ঞার ভাব আমার মধ্যে জেগে উঠল। প্লুটো'র সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত ভাল ব্যবহার করতে গিয়ে অন্যান্যদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লাম। কুকুর বা বাঁদর যে-ই আমার কাছে ঘেঁষে আদর পেতে চাইত আমি তেড়ে গিয়ে তাকেই ঘা কতক বসিয়ে দিতাম।

বিড়াল প্রীতি আমার মধ্যে এমন উগ্র হয়ে উঠল যাকে বিকার বল্‌লেও এতটুকু বাড়িয়ে বলা হবে না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এটাই যে, শেষ পর্যন্ত পোষা বিড়াল প্লুটোও আমার উগ্র আচরণ ও মারধোরের হাত থেকে বাদ পড়ল না। আমার চারিত্রিক পরিবর্তনটুকু তার নজরে পড়ে থাকবে।

একবার জরুরী কাজের তাগিদে শহরে যেতে হয়েছিল। ফেরার সময়

ভাঁটি থেকে গলা পর্যন্ত মদ গিলে বাড়ি ফিরলাম। দেখি, প্লুটোর ভাব কেমন বদলে গেছে। সে যেন আমার সংস্রব অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে চলতেই উৎসাহী। ব্যাপারটা আমার মনঃপূত হ'ল না। আমি দৌড়ে গিয়ে তাকে ধ'রে ফেল্‌লাম। আমার আকস্মিক এরকম কাজ সে বিরক্ত হ'ল, ক্ষুব্ধও হল খুবই। নিজের নিরাপত্তার তাগিদে আমার হাতে দিল জোর সে কামড়ে! ক্ষতের সৃষ্টি হ'ল। আমি নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না। আমার মধ্যে হিংস্র শয়তান মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলার উপক্রম হল। আদিম হিংস্রে মানসিকতা আমাকে উশকানি দিতে লাগল। মদের নেশায় আমার ভেতরের শয়তানটা হিংস্র পশুর প্রবৃত্তি লাভ করল। মনে হ'ল আমি যেন মানুষের প্রবৃত্তি হারিয়ে একটা হিংস্র পশুতে পরিণত হয়ে গেছি।

আমার ক্ষোভের ফলস্বরূপ পকেট থেকে ঝট্‌করে ভাঁজকরা ছোরাটাকে বের করে ফেল্‌লাম। ছুরিটার ধার সম্বন্ধে আমার মনে তিলমাত্র দ্বিধাও ছিল না। আমার জান্তব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে আমি অনুশোচনার জ্বালায় কম দগ্ধ হচ্ছি না। যা-ই হোক, ক্রোধোন্মত্ত অবস্থায় হাতের ছুরিটাকে বিড়ালটার চোখে গেঁথে দিলাম। তেমনি ক্রুদ্ধ-আক্রোশে তার সে-চোখটা বের ক'রে আনলাম। তার রক্তাপ্লুত দেহটা যন্ত্রণায় কাৎড়াতে লাগল।

রাত্রে সুনিদ্রা হ'ল না। সারারাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় কাটিয়ে শেষ রাত্রের দিকে কখন যে একটু তন্দ্রাভাব এসেছিল নিশ্চিত ক'রে বলতে পারব না। সকাল বিছানা ছেড়ে আসতে একটু দেরীই হয়েছিল। গতরাত্রের ঘটনাটা আমার বুকের মধ্যে খচখচিয়ে উঠল। আতঙ্ক ও অকথিত ব্যথা-বেদনায় নিজেকে অপরাধী মনে হতে লাগল। কিন্তু আমার বিবেকের ওপর তার কোন ছায়া পড়ল না। ফলে ঘটনাটা সহজেই মন থেকে মুছে ফেলা সম্ভব হ'ল। অনায়াসেই পূর্বের স্বভাব ফিরে পেলাম। মদের মাত্রা দিলাম বাড়িয়ে। মদের নেশায় সে-ঘটনাটা আমার অন্তরের একেবারে গভীরে ডুবে গেল।

বিড়ালটা একটা চোখ খোয়াল বটে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সে সুস্থ হয়ে উঠল। তার মণিহীন চক্ষুকোটরটার দিকে চোখ পড়লে আমার সর্বাঙ্গে কেমন একটা শিহরণ অনুভব করতাম। মনটা অস্বাভাবিক রকম বিষিয়ে উঠত। তবে এটা অবশ্য ঠিক, আমার যেন মনে হ'ত তার জ্বালা-

যন্ত্রণার অবসান ঘটে গেছে। সে আগের মত বাড়ির আনাচে কানাচে সর্বত্র খুরে বেড়াতে লাগল। তবে তার মধ্যে একটা আচরণ দেখা দিল। আমাকে দূর থেকে দেখামাত্রই সতর্কতার সঙ্গে অন্যদিকে সরে পড়তে লাগল। আমার পোষা বিড়ালের কাছ থেকে এরকম আচরণ আমার মোটেই বাঞ্ছিত নয়। খুবই খারাপ লাগল। বিরক্তির উদ্রেক ঘটল। আমার পোষা বিড়াল আমাকেই এড়িয়ে চললে এরকম একটা অশোভন আচরণকে অবশ্যই মন থেকে মেনে নেয়াও যায় না।

আরও কিছুদিন কেটে গেল। মদ আমাকে বশ ক'রে ফেলেছে। ক্রমে আমার বিবেকের একেবারে অপমৃত্যু ঘটে গেল। আমি সম্পূর্ণ বিবেকহীন মানুষে পরিণত হয়ে গেলাম। বিবেককে তাড়িয়ে তার জায়গা দখল করল জান্তব প্রবৃত্তিগুলো। তারা ক্রমে দৃঢ়তর হয়ে উঠলে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, আদিম প্রবৃত্তি মানুষকে কতখানি নির্মম-নিষ্ঠুর ক'রে তুলতে পারে। ন্যায়-অন্যায় বোধ মানুষের মন থেকে নিঃশেষে মিলিয়ে যায়। আর তখনই সে নির্দ্বিধায় অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত হয়। ঠিক সেরকম আমার নিজস্ব স্বত্তা লোপ ক'রে দিয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার মূর্ত প্রতীক ক'রে তুল্‌ল আমাকে। জান্তব প্রবৃত্তির প্রেরণায় আমি সোল্লাসে একের পর এক অন্যায়, নির্মম ও নিষ্ঠুর কাজ করতে লাগলাম। কিন্তু কাদের বিরুদ্ধে আমার জ্বলন্ত রোষ বর্ষিত হ'ত? যারা কোন অন্যায় করে নি, যারা আমার সামান্যতম ক্ষতিও করেনি তাদেরই অনিষ্ট সাধনে ব্রতী হলাম আমি। মদের নেশা কেটে গেলে, সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলে কৃতকর্মের কথা স্মরণ করে' অন্তর্জ্বালায় দগ্ধে মরতাম। এমনি জোয়ার-ভাঁটায় দোল খেতে লাগলাম আমি।

একদিন আমি উন্মাদ প্রায় হয়ে গেলাম। বিড়ালটাকে ধরে তার গলায় দড়ির ফাঁস পরিয়ে দিলাম। এবার তাকে নিয়ে একটা গাছের ডালে ঢুকিয়ে দিলাম। তবে হ্যাঁ, তাকে ফাঁসি দেবার সময় আমার বুকের মধ্যে উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্রের ঝড় বয়ে যেতে লাগল। চোখ দিয়ে নেমে এল উষ্ণ জলস্রোত। ব্যথা-বেদনায় বুকের ভেতরে অব্যক্ত যন্ত্রণা বোধ করতে লাগলাম। এক সময় সে আমাকে খুবই ভালবাসত, সামান্যতম ক্ষতিও কোনদিন করেনি। নিঃসন্দেহ ছিলাম আমি, যে-পাপ আমি করেছি, যে-অপরাধে আমি লিপ্ত হয়েছি, তার জন্য আমার আত্মাকে মাসুল দিতে হবে। কোনদিন শান্তি পাব না। আমার বুঝতে বাকী রইল না, আমার

জন্য চরমতম শাস্তি অপেক্ষা করছে। কৃতকর্মের প্রাপ্য শাস্তির হাত থেকে অব্যাহতি পাব না, কোনদিনই না। সব কিছু জেনে শুনেও আমি পাশবিক চরিতার্থ ক'রে ফেল্‌লাম।

আমার জান্তব প্রবৃত্তির তাগিদে যে রাত্রে বিড়ালটাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম, সে-রাত্রেই আগুনের উত্তাপে আমার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। সচকিত হয়ে বিছানায় উঠে বসি। ভয়ঙ্কর এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হ'ল আমাকে। আতঙ্কগ্রস্ত চোখ দুটো মেলতেই দেখতে পেলাম, আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে লকলকে আগুনের শিখা বেরোচ্ছে। আমি জ্বলছি! শুধু কি তা-ই? আমার সম্পূর্ণ বাড়িটাকে আগুনে গ্রাস করতে চলেছে। ঘরের ভেতরে বাইরে দাউদাউ ক'রে আগুন জ্বলছে। সমস্যা চারিদিকে। মশারীর ভেতর থেকে বেরবো কি করে! মশারীটাও যে আগুনের কোপদৃষ্টি থেকে রেহাই পায় নি। কোনরকমে আমার স্ত্রী আর পরিচারিকাকে নিয়ে বাড়ির বাইরে এলাম। আমার যাবতীয় সম্পত্তি চোখের সামনে ভস্মীভূত হয়ে গেল। আমি একেবারে সর্বশান্ত হয়ে গেলাম।

চরম দুরবস্থার মধ্যে আমার দিন কাটতে লাগল। ইতিপূর্বে কোনদিন আমি দুঃখ-কষ্টের কারণ খোঁজার জন্য উৎসাহী হইনি। আজও কিন্তু আমার স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ করলাম না। আমাকে কৃতকর্মের ফলই আজ ভোগ করতে হচ্ছে, এরকম বিশ্বাসকে ভুলেও মনের কোণে স্থান দিলাম না।

ধ্বংস কান্ডের পরের দিন সকালে বিষণ্ণ মনে হাঁটতে হাঁটতে আমার বাড়ির কাছে গিয়ে হাজির হলাম। ফ্যাকাশে-বিবর্ণ মুখে, হতাশ দৃষ্টিতে অগ্নিদগ্ধ বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলাম অপলক চোখে। দেখলাম, আমার শোবার ঘরের মাথার দিককার দেয়ালটাই। কেবলমাত্র দাঁড়িয়ে আছে। ক'দিন আগেই যেটা মেরামত করেছিলাম বলেই হয়ত ধকল সহ্য ক'রে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছে।

আমার ধবংসপ্রাপ্ত শোবার ঘরটার কাছে একটা বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে পেলাম। কয়েকজন অপরিচিত লোক ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে। তারা হন্যে হয়ে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে আর অদ্ভুত শব্দ ক'রে একে অন্যকে কি যেন সব বলছে। আমি গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেলাম। তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে অর্ধদগ্ধ-দেয়ালটার দিকে তাকালাম। যা দেখলাম তাতে

আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম হ'ল। দেখি, দেয়ালের গায়ে কোন্ দক্ষ শিল্পী যেন একটা বিড়ালের মুখ যত্নসহকারে খোদাই ক'রে রেখেছে। আর? একটা দড়ি বিড়ালটার গলায় জড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ভাস্কর্যটা চোখে পড়া মাত্র আমি সর্বাঙ্গে কম্পন অনুভব করলাম। নিলের অজান্তে পা দুটো বার কয়েক কেঁপে উঠল। মনে মনে বল্লাম—'হায় ঈশ্বর! একী দেখালে!'

আমি বিশ্বাস না ক'রে পারলাম না, দেয়ালের গায়ে বিড়ালের মূর্তিটা ভৌতিক মূর্তি ছাড়া আর কিছুই না। এবার আর নিজের ওপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারলাম না। মন দুর্বল হয়ে পড়ল। কেমন একটা ভয় আমার মনের কোণে পাকাপাকিভাবে বসে গেল। বারবারই মনে হতে লাগল, গতরাত্রের অগ্নিকাণ্ডের সময় কে যেন বিড়ালের গলায় ফাঁসি দেয়া দড়িটাকে আমার বাড়ির মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিল। ঠিক সে-মুহূর্তে একটা দেয়াল হুড়মুড় ক'রে ভেঙ্গে পড়ে। আর তারই চাপে দড়িসহ বিড়ালটা থ্যাৎলে গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে যায়। আর সেই চিহ্নটা এমন ভাস্কর্যে পরিণত হয়ে গেছে।

ব্যস, বিড়ালের মূর্তিটা এবার থেকে আমার মন-প্রাণ জুড়ে বসল। এক মুহূর্তের জন্যও তাকে মন থেকে ঝেড়ে-মুছে ফেলে দেয়া সম্ভব হয় নি। তবে এটাও ঠিক, ঘটনাটা আমার মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার করল বটে। কিন্তু আমাকে তিলমাত্রও বিষাদগ্রস্ত করতে পারে নি। তবে অস্বীকার করব না, আমার সে-পোষা কালো বিড়ালটাকে হত্যা করার পর আর একটা বিড়ালের জন্য মনটা বড্ড নিসপিস করছিল। তাই আমার পরিচিত মদের আখড়ায় আর একটা বিড়ালের খোঁজ করতে লাগলাম।

দুর্ঘটনার কিছুদিন পর ঘটল এক অভাবনীয় ব্যাপার। মদের আখড়ায় হঠাৎ একটা কালো বস্তু চোখে পড়ল। ঘরের ভেতরে একটা মদের পিপে ছাড়া দ্বিতীয় কোন বস্তু ছিল না। কৌতূহলাপন্ন হয়ে এগিয়ে গেলাম। দেখি, আমার প্লুটোর মতই কালো একটা বিড়াল লেজ নাড়ছে। তবে পার্থক্য যেটুকু চোখে পড়ল, এটার বুকের কাছে বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে সাদা লোম রয়েছে। আমি আগ্রহান্বিত হয়ে হাত বাড়াতেই সে আহ্লাদে আমার হাতে বার বার গা-ঘষতে লাগল। দোকানের মালিকের কাছে বিড়ালটা চাইতেই তিনি বল্লেন—'কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, বিড়ালটার মালিক আমি নই। কোত্থেকে যে হঠাৎ এখানে এসে আশ্রয়

নিয়েছে কিছুই জানি না।

যেহেতু বিড়ালটার মালিক খুঁজে পাওয়া গেল না তাই সেটাকে আমার ক'রে পাবার পক্ষে কোন বাধাই রইল না। ব্যস, আর দেরী নয়। বিড়ালটাকে বগল দাবা ক'রে বাড়িতে নিয়ে এলাম। আমার স্ত্রীও তাকে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করল!

সদ্য সংগৃহীত বিড়ালটার প্রতি আমার ভালবাসা ও আন্তরিকতা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হ'ল না। আমি ক'দিনের মধ্যেই তার প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়লাম। আর সে বিরক্তি এক সময় জ্বলন্ত ঘৃণায় পরিণত হ'ল। পূর্বকৃত ঘটনাটার জন্য আমি দুঃখিত ও লজ্জিত ছিলাম। তাই তার ওপর পাশবিক অত্যাচার করলাম না। সেরকম কিছু যাতে না ঘটে সেদিকে খুবই সতর্ক ছিলাম। তাই সম্পূর্ণ নতুন একটা পথ অবলম্বন করলাম। তাকে সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে চলতে লাগলাম। কিন্তু তাতেও স্বস্তি পেলাম না।

কেন? কেন, আমি নিজে সোৎসাহে বিড়ালটাকে বাড়িতে নিয়ে এসেও আবার এমন ঘৃণা করতে লাগলাম? হ্যাঁ, সঙ্গত কারণ একটা অবশ্যই আছে! পরের দিনই হঠাৎ আমার চোখে পড়েছিল প্লুটোর মতই তার একটা চোখ নেই। অবিকল তারই মত মণিহীন চোখের কোটরটা মেলে আমার দিকে তাকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছিলাম। আর একমাত্র একারণেই আমার স্ত্রী তাকে খুবই সহৃদয়তার দৃষ্টিতে দেখত।

আশ্চর্য ব্যাপার। বিড়ালটার আচরণ আমাকে স্তম্ভিত করল। আমি তাকে যত ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখতে লাগলাম সে ততই আমার সঙ্গে মাখামাখি করার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করতে লাগল। আমার পাশে গিয়ে বসে, কোলে ওঠার চেষ্টা করে—আরও কত কি। তার আচরণে অতিষ্ট হয়ে মাঝে মাঝে এমন রেগে যেতাম যে, ইচ্ছা করত কষে একটা চড় বসিয়ে দিই। কিন্তু এ-পর্যন্তই। তার গায়ে হাত তোলার কথা ভাবলেই আচমকা আতঙ্কে শিউরে উঠতাম, তাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে আনতাম। আর? তার শরীরের সাদা অংশটা ফাঁসির দড়ির ইঙ্গিত দিচ্ছিল। সেদিকে চোখে পড়লেই আমি একেবারে মিইয়ে যেতাম। আমার অপরাধ-ভীতির ওপর তার প্রভাব যে কী ভয়ঙ্কর তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আজ যে আমার ওপর দুষ্টগ্রহ ক্রিয়া ক'রে চলেছে! এর একমাত্র কারণ বিড়াল। একটা কালো বিড়াল। আর তাকে আমি হত্যা করেছি। নিজে হাতে

নির্মমভাবে হত্যা করেছি। আজ আমার মন থেকে শান্তি নির্বাসিত হয়েছে। প্রতিনিয়ত অন্তর্জ্বালায় দগ্ধে মরছি। রাত্রে ঘুমোতে পারি না। দুঃস্বপ্ন দেখি প্রায়ই। হুড়মুড় করে উঠে বসি। আতঙ্কিত চোখে চারিদিকে তাকাই। তারপর বাকী রাত্রিটুকু আতঙ্ক আর বিষাদের মধ্যে নির্ঘুমভাবে বসে কাটাতে হয়। স্বপ্নের ঘোরে আমার মনে হয় একটা ভারী জন্তু আমার বুকের ওপর চেপে বসেছে। আর? ঘন ঘন তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলে চলেছে।

আমি ক্রমেই আশ্চর্যজনক ভাবে মানসিক দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে পড়তে লাগলাম। এরই ফলে নিষ্ঠুরতা ও জ্বলন্ত ঘৃণা যেন আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গেল। আর তা যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছল তখন সমগ্র মনুষ্য জাতির ওপর ঘৃণা জন্মাল। সেই ঘৃণা আমার পত্নীর ওপরও ক্রিয়া করল।

প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত আমার সে বাড়িটার মাটির নীচে একটা কুঠুরি ছিল। সমস্যায় পড়ে সে প্রায়ান্ধকার ঘরটায় গিয়ে মাথা-গুঁজতেই হল। সিঁড়ি দিয়ে ঘরটায় নামতে হ'ত!

একদিন আমি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছি তখন বিড়ালটা আমার সঙ্গে সঙ্গে নামতে লাগল। আমি বিরক্ত হলাম। রাগও হল খুবই। আমি নিজেকে সামলাতে না পেরে ঘরের কোণ থেকে কুড়ুলটা বের করে আনলাম। বিড়ালটাকে আঘাত করার জন্য কুড়ুলটা মাথার ওপরে সবে তুলেছি ঠিক তখনই আমার স্ত্রী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। আমার হাত চেপে ধরে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করল। আমি রেগে একেবারে কাঁই হয়ে গেলাম। কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে তাকেই আঘাত করে বসলাম। চোখের পলকে ঘটে গেল একটা বীভৎস নারকীয় কাণ্ড। আর্তনাদ করারও সুযোগ পেল না আমার অভাগিনী স্ত্রী। তার নিষ্প্রাণ দেহটা রক্তে মাখামাখি হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

স্ত্রীকে হত্যা করার পর আমি কয়েক মুহূর্ত স্থবিরের মত দাঁড়িয়ে থাকলাম। তারপরই আমার আকস্মিক পৈশাচিক কাণ্ডটা সম্বন্ধে সচেতন হলাম। তার মৃত দেহটা গোপন করার জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। একবার ভাবলাম, তাঁর দেহটাকে কুঁচিয়ে তাড়াতাড়ি পুড়িয়ে ফেলি। পর মুহূর্তেই ভাবলাম, পোড়াবার দরকার হবে না। আমার ঘরটা ত মাটির তলায়। অত মাটি খুঁড়ে সমাধিস্থ ক'র ফেল্‌লে কার সাধ্য তাকে খুঁজে বের করবে? না, সমাধিস্থ করব না। উঠোনের কুয়োর মধ্যে

ফেলে দিলেই ত ঝামেলা চুকে যায়। না, তাতেও মন সরল না। এবার ভাবলাম, কাঠের বাক্সে পুরে কুলির মাথায় চাপিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিলে মন্দ হয় না। একবার বাড়ির বাইরে পাঠাতে পারলে আমার ঘাড় থেকে ব্যাপারটা নেমে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাটির তলার ঘরটাতে পুঁতে ফেরারই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম! সে-কুঠুরির দেয়াল ভেঙে তার মধ্যে মৃতদেহটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে আবার সিমেণ্ট, বালি আর ইট গেঁথে দিলাম। কাজটা আমার খুব মনের মত হল। বিপদ সম্বন্ধে আর কিছু-মাত্র সন্দেহ রইল না।

আমার মৃত স্ত্রীর একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করার পর আমি অপকর্মের নায়ক বিড়ালটাকে খুঁজে বের করার জন্য উঠে পড়ে লাগলাম। শয়তান-টাকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমার রক্ত ঠাণ্ডা হবার নয়। কিন্তু শয়তান বিড়ালটা যেন আমার মনের কথা বুঝে ফেলেছে। সে খুবই সতর্কতার সঙ্গে আমাকে এড়িয়ে চলতে লাগল। তাকে হত্যা করতে পারলাম না বটে, কিন্তু আমার চোখের আড়ালে চলে যাওয়ার জন্যও কম খুশী হইনি আমি। সত্যি সে একেবারে উধাও হয়ে গেল। অনেকে অনেকরকম প্রশ্ন করতে লাগল আমাকে। একেবারে অতিষ্ট হয়ে গেলাম। শেষ পর্যন্ত আমার ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজল। সন্দেহজনক কিছুই পেল না। কৃত অপরাধের জন্য আমি তেমন মর্মাহত হইনি।

দুর্ঘটনার চতুর্থদিনে পুলিশ এসে আমার বাড়ি ঘেরাও করে ফেলল। তল্লাসী চলল দীর্ঘ সময় ধরে। কিছুই পেল না। পুলিশ অফিসার আমাকে তাঁদের সঙ্গে থাকার জন্য নির্দেশ দিলেন। চার-চার বার তারা আমাকে নিয়ে মাটির তলার ঘরটাকে তল্লাসী করার জন্য গেলেন।

পুলিশ অফিসার ও অন্যান্যরা আমার ঘর তল্লাসী করে কিছু না পেয়ে হতাশ মনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। আমি বেঁচে গেলাম। পুলিশ আমার কৌশল ধরতে না পারায় আমি মনে মনে খুবই উল্লসিত হলাম। যুদ্ধজয়ের আনন্দও বুঝি এর কাছে হার মানবে। আবেগ-উচ্ছাসে অধীর হয়ে আমি বলেই ফেললাম—'দেখলেন ত, যা বলেছিলাম, ঠিক কিনা? আসলে আমার ঘরের গাঁথুনি খুবই মজবুত। ঈশ্বর আমার প্রতি অমানবিক আচরণ থেকে রক্ষা করুন।' কথা ক'টা বলতে বলতে আমি হাতের ছোট্ট ছড়িটা দিয়ে বার বার মৃতদেহটা লুকিয়ে রাখা দেয়ালটা ঠুকতে লাগলাম। সব শেষে বললাম—'গাঁথুনি না—ত যেন

পাহাড়ের গায়ে লাঠি ঠুকছি! আপনারা কী করে দেওয়ালগুলোর কথা ভাবলেই, হাসি পায়।

বরাতের ফের। শেষবার দেওয়ালটার ছড়ির ঘা মারার সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেল অবিশ্বাস্য কারবার। দেয়ালের ভেতর থেকে চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এল। শিশুরা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলে ঠিক যেমনটি শোনায় ঠিক সেরকমই আর্তস্বর আমার কর্ণকুহরে আচমকা আঘাত করল। আমি সচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। হাতের ছড়িটা আচমকা কেঁপে কেঁপে উঠল। পা দুটো অবশ হয়ে আসতে লাগল। দাঁড়িয়ে থাকার মত সামান্যতম শক্তিও আমার রইল না। পা দুটোর বিশ্বাসঘাতকতা প্রতিশোধ করার ক্ষমতা না থাকায় নিতান্ত অনন্যোপায় হয়েই দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল। আমার সে সময়কার মানসিক পরিস্থিতির কথা বুঝিয়ে বলা বাস্তবিকই সাধ্যাতীত, আমার চোখে ভয় মিশ্রিত বিস্ময়।

তদন্তকারী পুলিশের লোকেরা পিছন ফিরে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে মুহূর্তের জন্য আমার দিকে তাকাল। ম্লান হাসল। গাঁইতি শাবলের ঘা মেরে মেরে দেওয়ালটা ভেঙে ফেলার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। আমি আতঙ্কে জড়োসড়ো হয়ে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

বার দু'-তিন শাবলের ঘা মারার পর আবার সেই অবাঞ্ছিত রহস্য জনক চাপা আর্তনাদ ভেসে এল। পুলিশ অফিসার তার সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন—'কে কাঁদে!' পরমুহূর্তেই এক পলক আমার দিকে তাকিয়ে নিয়ে সহকর্মীদের তাড়া দিলেন—'করছ কি! এতগুলো লোক—একটা দেওয়াল ভাঙতে এত সময় লাগে কেন? হাত চালাও। ঘন ঘন শাবলের ঘা মার হে।'

সত্যি সিমেণ্ট-বালি দিয়ে ভাঙা দেওয়ালের অংশটা আমি খুবই শক্ত করে গেঁথেছিলাম। নইলে চার-পাঁচটা জোয়ান মরদ এটুকু দেওয়াল ভাঙতে একেবারে ঘেমে-নেয়ে একাকার হয়ে গেল!

অতর্কিতে শেষ ইট ক'টা শাবলের আঘাতে হুড়মুড় করে খসে পড়ে গেল। ব্যস, রক্তমাখা বিকৃত মৃতদেহটা সবার চোখের সামনে ভেসে উঠল। পুলিশ অফিসার বিস্ময়-আতঙ্কে একবার মৃতদেহটার দিকে পরমুহূর্তেই আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। আর যে জন্তুটার

জন্য এত কিছু সে মৃতদেহটার মাথার কাছে বসে! তার সক্রিয় চোখটা দিয়ে অত্যুজ্জ্বল আগুনের উল্কা বেরিয়ে আসছে। সে আগুনের শিখায় সবকিছু পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়ার জন্য সে-যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বিড়ালটার কুচকুচে কালো রঙের পাশে চোখের আগুনের উল্কাকে যেন অধিকতর জ্বলজ্বলে দেখাতে লাগল। তার জ্বলজ্বলে চোখটার দিকে চোখ পড়তেই আমার বুকের ভেতরে ফুসফুস দুটো যেন আচমকা ডিগবাজি খেয়ে গেল।

কালো বিড়ালটার আর্তস্বর আমাকে টেনে নিয়ে গেল ফাঁসির মঞ্চের দিকে জ্বলজ্বলে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসতে লাগল। আমি নিতান্ত অপরাধীর দৃষ্টিতে নীরবে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।

আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না। আমার মৃত্যু স্ত্রীর শিয়রে জন্তুটা গেল কি করে! না. কিছুতেই নির্ভরযোগ্য একটা সূত্র বের করতে পারলাম না। দুঃছাই! আর ভাবতে পারছি না! মাথার ভেতরে কোন অদৃশ্য হাত যেন অনবরত হাতুড়ি পিটে চলেছে। কি জানি, মৃতদেহটা জায়গামত রেখে দেওয়াল গাঁথার সময় কোন অসতর্ক মুহূর্তে বিড়ালটা আচমকা ঢুকে মৃতার শিয়রে ঠাই নিয়েছিল কিনা তা-ই বা কে জানে? অদৃষ্টের ওপর সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে নিজেকে হাল্কা করার চেষ্টা করলাম।

———

এক শীতের রাত্রি। শীত রীতিমত জাঁকিয়ে পড়েছে।

আমি আর আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু শার্লক হোমস জ্বলন্ত চুল্লির ধারে মুখোমুখি বসে কথা বলছি।

কথা বলতে বলতে হোমস সহসা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। পাশ থেকে একটা বাক্স টেনে কাছে আনল। তার ভেতর থেকে ছোট্ট আর একটা বাক্স বের করল। এবার তালা খুলে তার ভেতর দলামোচড়া করা একটা কাগজ তুলে নিল। আর? আর একটা আগেকার দিনের পেতলের চাবি, একটা কাঠের টুকরো যার সঙ্গে তারের আঙটা লাগানো। আরও

আছে। মরচে পড়া কয়েকটা ধাতুর চাকতি বের করে, আমার মুখের সামনে ধরে বলল—'কি ডাক্তার, এগুলো দেখে তোমার কি ধারণা হচ্ছে, বল ত?'

'—তোমার সংগ্রহের বৈচিত্র্যটুকুই আমার কাছে বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে বন্ধু।'

'—বৈচিত্র্য?' মুচকি হেসে সে এবার বলল—'বৈচিত্র্য? কিন্তু এগুলোর সম্পর্কযুক্ত যে-গল্পটা তা শুনলে তুমি বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে যাবে।' চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—'ম্যাসগ্রেভ পরিবারের স্মৃতিচিহ্নও বলতে পার এগুলোকে। সে পরিবারে সংঘটিত কাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দেবার মত ক্ষমতা রাখে এ-জিনিসগুলো। আর তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাত্র একটা জিনিসই আজ আমার সংগ্রহে অবশিষ্ট আছে। আর সবই কালের কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে।'

ইতিপূর্বেও আমি বন্ধুর মুখে একাধিকবার ম্যাসগ্রেভ পরিবারের নাম শুনেছি। কিন্তু সে-কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ আমার পক্ষে তার মুখ থেকে বের করা সম্ভব হয় নি!

সে এবার বলল—'বন্ধু ওয়াটসন, তোমার ইতিহাস বইতে যদি আমার এ-কাহিনীর জন্য একটু জায়গা করে দাও তবে কিন্তু আমি আনন্দিতই হব।'

আমি মুচকি হেসে বললাম—'তাই বুঝি?'

'—অবশ্যই। এর মধ্যে যে-সম্পদ রয়েছে তা কেবলমাত্র দেশেই নয়, অন্য যে কোন দেশের অপরাধ বিবরণীতে এটা হবে একসেবা দ্বিতীয়ম্। একেবারেই অনন্য। সত্য বলতে কি বৈশিষ্টপূর্ণ ঘটনাটা যদি তোমার ইতিহাসে স্থান না পায় তবে আমার কার্যাবলীর সংকলন সম্পূর্ণত্ব লাভ করবে না অবশ্যই।'

তোমার কাছে আমি আগেই গ্লোরিয়া স্কট-এর অদৃষ্ট বিড়ম্বিত লোকটার মর্মান্তিক পরিণামের কথা ব্যক্ত করেছি। তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে কেমন করে সে পেশা আমার জীবনের উল্লেখযোগ্য অবলম্বন হয়ে উঠেছে, তার প্রতি আমি প্রথম আকৃষ্ট হয়েছিলাম সে-কথা আশাকরি তোমার স্মৃতি ভ্রষ্ট হয় নি ওয়াটসন,, আমি বিশ্বাস করি। সরকারী বিভাগই বল, আর জনসাধারণের কথাই বল—সর্বত্রই আজ সন্দেহজনক ঘটনার ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বিচার বলে জ্ঞান

করা হয়! আমার রক্ত সমীক্ষার যে ঘটনাকে তুমি লিপিবদ্ধ করে অমরত্ব দান করেছ তখনও আমি টাকাকড়ির দিক থেকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ না করলেও মোটামুটি খ্যাতির অধিকারী হয়েছি, এটা স্বীকারের অপেক্ষা রাখে না।

আমি লণ্ডনে এলাম। বাসা ভাড়া করে বসবাস করতে লাগলাম। অখণ্ড অবসর। আমার প্রাক্তন সহাধ্যায়ী ছাত্র-বন্ধুদের সহযোগীতায় মাঝে-মধ্যে দু'চারটে কেস পেতাম। এর কারণও ছিল যথেষ্ট। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়, বিশেষ করে শেষের দিকে এ-ব্যাপারে আমার একটু নাম ডাক হয়। তখনকার পাওয়া কেসগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে ম্যাসগ্রেভ-এর পূজা পদ্ধতির ঘটনা সংক্রান্ত। সে অবর্ণনীয় ঘটনাবলী তখন যেভাবে বাজার গরম করে তুলেছিল আর যেভাবে বিশেষ বিশেষ ঘটনা এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল তার পর থেকেই আমার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ক্রমে প্রসারলাভ করতে থাকে।

আমার সহাধ্যায়ী ছিল রেজিনাল্ড ম্যাসগ্রেভ। এখানকার এক প্রাচীন বংশে তার জন্ম হয়েছিল। তার আচার আচরণে আভিজাত্যের ছাপ ছিল। মিষ্টি স্বভাব ও মার্জিত রুচি যা আমাকে তার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল।

রেজিনাল্ড ম্যাসগ্রেভ-এর পূর্বসূরীরা ষোলশ'শতকে উত্তরাঞ্চলের ম্যাসগ্রেভ বংশ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে পশ্চিম সাসেক্সে বসতি গড়ে তোলে। সেখানকার হার্লস্টোনের জমিদার বাড়িটা সব চেয়ে পুরনো বাড়ি। কিন্তু রেজিনাল্ড তার জন্মভূমিকে এক মুহূর্তের জন্যও মন থেকে মুছে ফেলতে পারে নি। সময় সুযোগ পেলেই আমার সঙ্গে দেশের বাড়ির গল্প করত। আর সে সঙ্গে আমার পর্যবেক্ষণ ও অনুমান নির্ভর কাজ ও কথা অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে শুনত। তার আগ্রহের প্রাবল্য আমাকে প্রেরণা জোগাত, অস্বীকার করতে পারব না।

তারপর কি হ'ল বলছি—দীর্ঘ চার বৎসর আমরা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিলাম। হঠাৎ ভোরে আমার বাড়ি এসে হাজির। দরজা খুলে তাকে দেখেই উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলাম। আদর ক'রে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালাম। তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। অল্পবিস্তর পরিবর্তন হয়েছে, লক্ষ্য করলাম। পোশাক আষাক ধোপদুরস্তই আছে বটে।

চেয়ার টেনে বসতে দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম—'ম্যাসগ্রেভ আছ।

কেমন ? তারপর খবরাখবর কি, বল ?

'আশা করি বাবার পরলোকগমনের খবর শুনে থাকবে। দু'বছর হ'ল। সেই থেকে হার্লস্টোনের স্থাবর-অস্থাবর রক্ষণা বেক্ষণের দায়িত্ব আমার ওপরেই বর্তেছে। হোমস, শুনলাম, তোমার সে অনন্য সাধারণ ক্ষমতাকে আজকাল নাকি বাস্তবে প্রয়োগ করছ ?

আমি ছোট্ট করে জবাব দিলাম—'ঠিকই শুনেছ। বুদ্ধিকে অন্ন সংস্থানের কাজে লাগাচ্ছি ।

'বড় আনন্দ পেলাম। কারণ এ-মুহূর্তে তোমার যুক্তি বুদ্ধি ও সহযোগিতা আমার ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে হোমস।'

'—কি ব্যাপার বল ত রেজিনাল্ড ?'

'—হার্লস্টোনে কয়েকটা অপ্রত্যাশিত ও অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে চলেছে। পুলিশের লোকেরা কোন হিল্লেই করতে পারছে-না। বিশ্বাস কর, ব্যাপারগুলো সবার জ্ঞান-বুদ্ধিবহির্ভূত ত বটেই, তার ওপর একেবারেই বিচিত্র।'

কথা বলতে বলতে হোমস মুখোমুখি বসে থাকা আমার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। বল্‌ল—'ডাক্তার, আশাকরি বুঝতেই পারছ আমি খুবই নিবিষ্ট মনে এবং অত্যুগ্র আগ্রহের সংগে তার কথাগুলো হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করছিলাম। কয়েক মাস হাত গুটিয়ে বসে থাকার পর আমি যখন একটা কেস হাতে পাবার জন্য ছটফট করছিলাম ঠিক তখনই ভগবানের আশীর্বাদের মতই কেসটা যেন অযাচিত ভাবে আমার হাতে এল। আমার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ছিল অন্যরা যে-কেসটায় ব্যর্থ হয়েছে সেখানে আমি অবশ্যই সাফল্য লাভ করবই। আত্মপরীক্ষার প্রকৃত সুযোগ আজ এসেছে। আমি উৎসাহিত হয়ে বল্‌লাম—'কেসটা কি একটু খোলসা করে বল রেজিনাল্ড।'

'—আমি অকৃতদার সত্য। কিন্তু হার্লস্টোনের বিশালায়তন বাড়িটাকে গোছগাছ করে রাখার জন্য আমাকে অনেক পরিচারক-পরিচারিকা রাখতে হচ্ছে। আর শিকারের ধুম পড়ে গেলে বহুলোকের সমাগমে বাড়িটা গমগম করতে থাকে। ফল-ফুলের বাগান ও আস্তাবল পরিচর্যা করার লোকজন ছাড়াও আটটা পরিচারিকা, দু'জন পাচিকা, দু'জন পরিচারক দু'জন খানসামা ত রয়েছেই, সে সঙ্গে এক বালকভৃত্যও ফাইফরমাসের জন্য কাজে নিযুক্ত। এদের মধ্যে খানসামা ব্রাণ্টন সব চেয়ে পুরনো।

এক সময় বেকার স্কুল শিক্ষক ছিল। বাবা তখন তাকে ডেকে কাজে নিযুক্ত করেছিলেন! উদ্যমী ও চারিত্রিক গুণের সমাবেশ তার মধ্যে ছিল বলে সে আমাদের পরিবারের চোখের মণি হয়ে উঠেছিল। তখন তার যুবক-বয়স, বিশ বছর পরও এখন চল্লিশের বেশী বয়স ত হবেই না। গুণের দিক থেকেও অসাধারণত্বের দাবী রাখে। বহু ভাষায় কথা বলতে ও লিখতে পারে। আর যাবতীয় তারের বাদ্যযন্ত্রে তার নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। এত গুণ থাকা সত্ত্বেও সে খানসামার চাকরিতে সন্তুষ্ট। বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে। উন্নত চাকরির জন্য চেষ্টা উদ্যমও তার নেই। এতেই আত্মতৃপ্ত। আত্মীয় বন্ধুরা আমাদের বাড়ি থেকে ফিরে তার গুণের কথা মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না।

ব্র্যাণ্টন-এর দোষের মধ্যে একটাই, ডন জোয়ানের ভাব তার মনের কোণে সযত্নে পুষে চলেছে যার বহিঃপ্রকাশ সেরকম একটা অজপাড়া গাঁয়ে খুবই দুষ্কর। কিন্তু বিয়েথা করার পর তার মতিগতি পরিবর্তন হয়। কিছুদিনের মধ্যেই তার স্ত্রী মারা গেল। আমাদের দুর্গতি চরমে উঠল। কিছুদিন আগে আমাদের এক পরিচারিকাকে র‍্যাশেল হাউয়েল্‌স, বিয়ে করতে আগ্রহী হয়। ভাবলাম, আবার ঘর বেঁধে থিতু হবে। কিন্তু তা আর হ'ল না। তাকে ছেড়ে আমাদের পাখি-পালকের মেয়ে জ্যানেট ট্যাগেলিস-এর পিছনে ঝুলে পড়ল। র‍্যাশেল একদিকে যেমন শান্ত-ভদ্র অন্যদিকে ওয়েলসের মানুষের মতই রগচটা।—রাগলে আর রক্ষে নেই।

আমি আগ্রহান্বিত হয়ে বল্‌লাম—'লোকটা বিচিত্র চরিত্রের ত দেখছি!'

'—তারপর কি হ'ল শোন হঠাৎ লক্ষ্য করা গেল র‍্যাশেল-এর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। এখন রহস্যজনক এক কালো-চোখ ছায়ার মত সারা বাড়ি চষে বেড়াচ্ছে। ব্যস শুরু হয়ে গেল নাটকের প্রথম দৃশ্য। তারপরই দ্বিতীয় দৃশ্য উঁকি দিল। এবার আমরা প্রথম দৃশ্যটার কথা আর ভাববার অবসর পেলাম না। আগের যা কিছু, সবই এটা ম্লান করে দিল। তার সূত্রপাত হল খানসামা ব্রাণ্টন'কে অপমান করার মধ্য দিয়ে। তাকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করার কারণটাও এ-ব্যাপারে কম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল না। ঘটনাটার এভাবেই শুরু হয়। তোমাকে ত আগেই বলেছি হোমস, লোকটা খুবই চালাক-চতুর। ধূর্তও বলতে পার। আসলে প্রখর বুদ্ধিই তাকে সর্বনাশের শেষ সিঁড়িতে নিয়ে গেছে। আর অপ্রয়োজনীয়

ব্যাপার স্যাপার নিয়েও তার মনে কম কৌতূহল ছিল না। এর পরিণাম কতদূর গড়াতে পারে, আমি অন্ততঃ ভেবে কূলকিনারা পাইনি। কিন্তু অতি সম্প্রতিকালে অকস্মাৎ ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা আমাকে যার-পর-নাই বিস্মিত করল।

গত বৃহস্পতিবার রাত্রে খাবার পর আমি একটা আহাম্মকি কাজ করে ফেললাম। ভরপেট খাবার পর এক কাপ কড়া কফি পান করলাম। ব্যস, হাতে হাতে ফল পেয়ে গেলাম। ঘুম আসা ত দূরের কথা চোখের পাতা এক করতেই পারছিলাম না। দেখতে দেখতে রাত্রি দুটো বেজে গেল। ধৈর্যচ্যুতি ঘটে গেল। হুড়মুড় করে উঠে বসে পড়লাম। আধ-পড়া উপন্যাসটাকে শেষ করে ফেলব ভেবে মোমবাতিটা জ্বাল্‌লাম। বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে বইটি রাখা ছিল। ড্রেসিং-গাউনটা গায়ে দিয়ে সিঁড়ির দিকে গেলাম। বন্দুক রাখার ঘর ও লাইব্রেরী ডিঙিয়ে ব্রিলিয়ার্ডের ঘরটা। সিঁড়ি বেয়ে নেমে সবে কয়েক পা গিয়েছি। দেখি লাইব্রেরীর দরজা আধ-খোলা। ফাঁক দিয়ে আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে। ব্যাপারটা আমাকে স্তম্ভিত করে দিল। মনে মনে বল্‌লাম, শুতে যাবার আগে আমি ত নিজে-হাতে মোমবাতি নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে গেছি। আবার আলো জ্বালল কে! তবে কি চোর টোরের ব্যাপার। বুঝতেই পারছ, এ-অবস্থায় সবার আগে চোরের কথাই মনে আসা স্বাভাবিক। এরকমটা ভাবার কারণও ছিল যথেষ্ট। সে ঘরে বিশেষ করে হার্লস্টোনের বারান্দার দেয়ালগুলোতে প্রাচীন যুগের অস্ত্রশস্ত্র ঝুলিয়ে রাখা হত। আমি ব্যস্ত-হাতে সেখান থেকে একটা কুড়োল টেনে নিলাম। বলা ত যায় না, আত্মরক্ষার ব্যাপারে কাজে লাগতে পারে। চোর নির্ঘাৎ খালি হাতে বাড়ির মধ্যে ঢোকে নি। আমি হাতের মোমবাতিটা রেখে কুড়োল কাঁধে অতি সন্তর্পণে লাইব্রেরীর দিকে এগিয়ে গেলাম। দরজার সামনে দাঁড়ালাম। দরজা স্পর্শ না করে কোনরকম আওয়াজ যাতে না হয় ঠিক তেমনিভাবে গলা বাড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিলাম। দেখি, আমার খানসামা ব্র্যাণ্টন চেয়ারে বসে। নিজের চোখ দুটোকেও বিশ্বাস করতে দ্বিধা হচ্ছিল। এত রাতে তাকে লাইব্রেরীতে, আমারই চেয়ারে বসে পা-নাচাতে দেখব, ভাবতেই পারিনি।

ব্যাণ্টন চেয়ারে বসে হাঁটুর ওপরে একটুকরো কাগজ মেলে রেখেছে। ঠিক যেমন করে মানচিত্র দেখতে গিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে থাকি আমরা।

তার চোখের পলক পর্যন্ত পড়ছে না। গালে হাত। আমি কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়িয়ে তার অবিশ্বাস্য কাণ্ডটা দেখলাম। আর একটা ব্যাপার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। পোষাক-আশাকে সে রীতিমত ফিটফাট।

আমি দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকব ভাবলাম। হাত বাড়াতে গিয়েও থমকে গেলাম। দেখলাম, ব্র্যাণ্টন চেয়ার ছেড়ে উঠল। হেঁটে পাশের টেবিলের কাছে গেল। চাবি দিয়ে ড্রয়ারের তালা খুলল। কোনরকম আওয়াজ না হয় এমন সন্তর্পণে ড্রয়ারটা খুলল। তার ভেতর থেকে একটা কাগজ বের করল। চোখের সামনে ধরে নিঃসন্দেহ হ'ল বাঞ্ছিত কাগজই বটে এটা। এবার চেয়ারে ফিরে গেল। কাগজটাকে মোমবাতির আলোয় খুঁটিয়ে খুটিয়ে দেখতে লাগল। বার বার এদিক-ওদিক কাৎ করে কাগজটাকে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখল অনেকক্ষণ ধরে।

আমার বুঝতে অসুবিধা হ'ল না, আমাদের পারিবারিক দলিলপত্রেরই কোন একটা কাগজ সেটা। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, আমাদের দলিলপত্রে তার কি দরকার পড়তে পারে। আমি রেগে ফেটে পড়ার উপক্রম হলাম। দরজার আড়ালে আর স্থবিরের মত দাঁড়িয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হ'ল না দরজা ঠেলে দ্রুত ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলাম।

আমাকে সামনে দেখে ব্র্যাণ্টন আচমকা ভূত দেখার মত থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল! তার চোখের তারায় বিস্ময়। অকস্মাৎ তার মুখ চকের মত সাদা হয়ে গেল। মুহূর্তে তার মুখের রক্ত যেন ভোজবাজির মত শরীরের অন্যত্র চালান হয়ে গেল। আমি নীরবে রোষপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আসলে কি দিয়ে বক্তব্য শুরু করব, হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম।

একটু আগে হাঁটুর ওপর রেখে যে কাগজটা সে পড়ছিল সেটাকে ত্বরিতে বুক পকেটে চালান দিয়ে দিল।

আমি গর্জে উঠলাম—'বাঃ ব্র্যাণ্টন। চমৎকার আচরণ তোমার! তোমার ওপর বিশ্বাস করে যে দায়িত্ব দিয়ে রেখেছি তার প্রতিদান এভাবেই দিচ্ছ! কাল সকালে যেন এ-বাড়িতে তোমাকে আর দেখা না যায়'

ব্র্যাণ্টন-এর ব্যবহারে আমি আরও বিস্মিত হলাম। টুঁ শব্দটিও সে করল না। নিতান্ত অপরাধীর দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত মেঝের দিকে নীরব

চাহনি মেলে তাকিয়ে রইল। এক সময় আমাকে যথোপোযুক্ত অভিবাদন করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করল। ড্রয়ার থেকে বের করে আনা কাগজটা ঘাড় ঘুরিয়ে টেবিলের ওপর রেখে দিল। এবার ধীর পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

আমি ব্রাণ্টন-এর ফেলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে চোখের আড়ালে চলে গেলে আমি টেবিলটার কাছে এগিয়ে গেলাম। হাত বাড়িয়ে কাগজটা টেবিল থেকে তুলে নিলাম। কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

আমি হাতের কাগজটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই আপন মনে বলে উঠলাম—'আশ্চর্য ব্যাপার ত! এটা তার এমন কি দরকার পড়তে পারে।'

আমি আগ্রহান্বিত হয়ে বললাম—'কিসের কাগজ ছিল সেটা?'

'—খুবই সাধারণ একটা কাগজ। ম্যাসগ্রেভ পরিবারের অনুষ্ঠান নামে আমাদের পরিবারের অতি প্রাচীন কাল থেকে একটা লোকাচার প্রচলিত রয়েছে, তারই প্রশ্নোত্তরের নকল।' ম্যাসগ্রেভ পরিবারের অনুষ্ঠান' নামক অনুষ্ঠানটা আমাদের পরিবারের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পরিবারের কাউকে প্রাপ্ত-বয়স্ক বলে চিহ্নিত করার পূর্বে এ-অনুষ্ঠানটা পালন করতেই হয়। শ' শ' বছর ধরে আমাদের পরিবারে এ-প্রথাটা পালিত হচ্ছে।'

'— নিছকই পারিবারিক একটা ব্যাপার?'

'—ঠিক তা-ই।

'—আচ্ছা, এ-প্রসঙ্গে পরে না হয় শোনা যাবে। এবার তোমার আর কি বক্তব্য রয়েছে, বল।'

'—ভাল কথা। তুমি যখন বলছ, ম্যাসগ্রেভ পরিবারের অনুষ্ঠানের ব্যাপারটা আপাততঃ চাপা দিচ্ছি।

'—হ্যাঁ, সে-রাত্রে খানসামা ব্র্যাণ্টন-এর ব্যাপারে যা-যা বলার বল।'

'—ব্র্যাণ্টন ড্রয়ারের চাবিটা ফেলে গিয়েছিল। আমি তালা বন্ধ করে ঘর থেকে বেরোবার উদ্যোগ করলাম। ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার দিকে চোখ ফেরাতেই সচকিত হয়ে পড়লাম। দেখি, ব্র্যাণ্টন আবার ফিরে এসেছে। গম্ভীর মুখে দরজায় দাঁড়িয়ে। আমি বিস্ময়মাখানো দৃষ্টিতে তার দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলাম।

ব্র্যাণ্টস সবিনয় নিবেদন রাখল—'প্রভু মিঃ ম্যাসগ্রেভ, অসম্মান সহ্য করা আমার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। আমি যখন, যে কাজই করি না কেন তার চেয়ে ঢের ঢের গর্ব নিয়ে আমি চলাফেরা করে থাকি। অসম্মানকে আমি মৃত্যুর সমান মনে করি।'

আমি চোখের তারায় বিস্ময়টুকু বজায় রেখেই তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কি বলব, ভেবে পাচ্ছিলাম না।

ব্র্যাণ্টন পূর্বস্বর অনুসরণ করেই এবার বল্‌ল—'সত্যি বলছি অসম্মান সহ্য করার চেয়ে মৃত্যুবরণকেই আমি শ্রেয় জ্ঞান করি। একটা কথা মনে রাখবেন, আমাকে হতাশার মুখে ছুঁড়ে দিলে কিন্তু আমার ধমনীর রক্ত আপনার মাথায় পড়বে। যে-ঘটনা নিজের চোখে দেখলেন, তারপর যদি আপনি আমাকে আর চাকরিতে বহাল রাখতে না চান, তাই মেনে নেব। তবে একটা অনুরোধ প্রভু, আমাকে একমাসের সময় দিন। তারপর আমি স্বেচ্ছায় এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। কিন্তু পরিচিত লোকজনের চোখের সামনে আমাকে দূরদূর ক'রে তাড়িয়ে দিলে তা হবে নিতান্তই অসহনীয় ব্যাপার। আমার অনুরোধটা একটু বিবেচনা করে দেখবেন।'

আমি এবার মুখ খুল্‌লাম—'ব্র্যাণ্টন, তুমি যে-কাজ করেছ তা চরম বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া কিছু নয়। এ-ঘটনার পর তোমার প্রতি কোনরকম সহানুভূতি প্রদর্শনের প্রয়োজন বোধ করি না আমি।' নিজেকে একটু সামলে নিয়ে আবার বল্‌লাম—'তুমি দীর্ঘদিন আমাদের পরিবারের সঙ্গে জড়িয়েছিলে। তাই তুমি লজ্জা-সঙ্কোচের মধ্যে পড় এটা আমার কাম্য নয়। তবে এক মাস সময় দেওয়া সম্ভব নয়। বড় জোর এক সপ্তাহ—হ্যাঁ এক সপ্তাহের মধ্যে তোমাকে আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে, মনে থাকে যেন। আর এর জন্য যেকোন কারণ তুমি তুলে ধরতে পার, আপত্তি করব না।'

কাঁপা কাঁপা হতাশ স্বরে সে উচ্চারণ করল—'এক সপ্তাহ! মাত্র এক সপ্তাহ! অন্ততঃ পনের দিন—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে আমি ব'লে উঠলাম—'না, এক সপ্তাহের মধ্যেই চলে যেতে হবে তোমাকে। মনে করবে, এতেই আমি তোমার প্রতি যথেষ্ট ঔদার্যের পরিচয় দিলাম।'

বাজপড়া রোগীর মত কয়েকমুহূর্ত নীরবে দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর ধীর-পায়ে বারান্দা দিয়ে হেঁটে গেল। আমি মোমবাতিটা নিভিয়ে

দিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলাম।

এ-ঘটনার পর ব্র্যাণ্টন খুবই যত্ন নিয়ে কাজ করল। আমিও এ প্রসঙ্গে একটা কথা উত্থাপন করলাম না। নীরবে লক্ষ্য রেখে চল্‌লাম, সে কি ক'রে অসম্মানের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে চাইছে। তৃতীয় দিন সকালে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। সারা দিনের কাজের তালিকা জানতে চাইল। একটু পরে পরিচারিকা র‍্যাশেল হাউয়েল-এর সঙ্গে আমার মুখো-মুখি দেখা হয়ে গেল। একটু আগে ত তোমাকে বলেছিই হোমস সে মাত্র ক'দিন আগে রোগ থেকে উঠেছে। তাই এত তাড়াতাড়ি কাজে যোগ দেবার জন্য তাকে খুব বকাবকি করলাম।

সে এমন বিচিত্র এক ভঙ্গিমায় আমার দিকে তাকাল যে, আমার কেমন ভয় হল। ভাবলাম, তার বুঝি মাথাই খারাপ হয়ে গেছে। আমি বেশ রাগত স্বরেই এবার বল্‌লাম—'ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চলবে। কাজ বন্ধ করে এক্ষনি নিজের ঘরে যাও। আর ব্র্যাণ্টন'কে বলবে, আমার সঙ্গে যেন দেখা করে।'

'—সে-ত চলে গেছে হুজুর।' র‍্যাশেল বল্‌ল।

'—কোথায় গেছে? কখন গেছে?

'—তা বলতে পারব না। তাকে কেউ দেখেনি—কেউ না। চলে গেছে হা-হা-হা—সে চলে গেছে—হা-হা-হা—হাসতে হাসতে সে দেয়ালে আছাড় খেয়ে পড়ল। তারপর তার অবশ দেহটা দেয়াল বেয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। তার আকস্মিক বিকার আমাকে ভীত-সন্ত্রস্ত ক'রে তুল্‌ল। আমি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে লোকজন ডাকতে ঘণ্টা বাজাবার জন্য ছুটে গেলাম।

ধরাধরি করে র‍্যাশেল'কে তার ঘরে নিয়ে গেলাম। তখনও সে প্রলাপ বকছে। বিড়বিড় করে আগের কথাগুলোই বার বার আউড়ে যেতে লাগল।

খানসামা ব্র্যাণ্টন'কে সত্যি খুঁজে পাওয়া গেল না। এতদিনের পুরনো কর্মচারী, বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, কেউ জানতেও পারল না। ব্যাপারটা বড়ই আশ্চর্যজনক নয় কি হোমস? গত রাত্রে সে তার ঘরে শুতে যাবার পর কেউ তাকে দেখে নি। তার ঘরে কেউ শোয় নি। কিন্তু কি করে সে বাড়ি ছেড়ে গেল—সকালে জানালা বন্ধ ছিল। তার পোষাক-পরিচ্ছদ ঘড়ি, জুতো আর টাকাকড়ি সবই ঘরে ঠিকঠাক রয়ে গেছে।

একমাত্র মাঝে-মধ্যে যে-কালো স্যুট-কোট পরে সেটাই ঘরে নেই। আর চটি জোড়া পাওয়া যাচ্ছে না। আশ্চর্য ব্যাপার ত! লোকটা কর্পূরের মত উবে গেল নাকি।

বাড়ির সব ক'টা ঘরে তন্নতন্ন করে তার খোঁজ করেছি। এমন কি বাড়ির গলিটলিগুলোও খুঁজতে বাদ দেই নি। না, কোথাও তার চিহ্নমাত্রও পাওয়া গেল না।

হোমস, অনন্যোপায় হয়ে স্থানীয় পুলিশের শরণাপন্নও হয়েছিলাম। নিষ্ফল প্রয়াস। ঘটনার আগের রাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল। বাড়ির চারদিকে, বিশেষ ক'রে বাগানের দিকটা পরীক্ষা করে দেখেছি। কোন পায়ের ছাপই পাওয়া যায় নি।

আমরা যখন খানসামা ব্র্যাণ্টন-এর অন্তর্ধানের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনা-চিন্তায় ব্যস্ত ছিলাম ঠিক তখনই নতুনতর একটা রহস্যজনক ব্যাপার ঘটে যাওয়ায় আমাদের মন আসল রহস্য থেকে দূরে সরে গেল।

পরিচারিকা র‍্যাশেল বিকারগ্রস্ত। তার জন্য একটা নার্স রাখা হ'ল। রাত্রে তার পাশেই থাকে ব্র্যাণ্টন চলে যাবার পর তৃতীয় রাত্রে র‍্যাশেলকে একটু সুস্থ-স্বাভাবিক দেখে নার্স চেয়ারে হেলান দিয়ে একটু ঘুমোল। শেষ রাত্রে ঘুম ভাঙতেই তার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। দেখে, র‍্যাশেল-এর বিছানা খালি। ঘরের জানলাটা খোলা। রোগী বে-পাত্তা। নার্সের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম হয়ে গেল। সে দৌড়ে আমার খোঁজে ওপরে গেল। আমি দরজা দিয়ে ঘুমোচ্ছি তখনও। কড়া নেড়ে আমাকে তুল্‌ল। কাঁদো কাঁদো মুখে আমাকে অবিশ্বাস্য ঘটনাটা জানাল।

নার্সের কথায় আমি যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম। আর এক মুহূর্তও দেরী না করে আমি দু'জন পরিচারককে নিয়ে র‍্যাশেল-এর খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম!

তার পথ অনুসরণ করতে আমাদের বেগ পেতে হয়নি। ঘরের জানালার পর থেকেই তার পায়ের ছাপ পড়েছিল। আমরা সেগুলো ধরে ধরে হ্রদের ধারে পৌঁছে গেলাম। সেখানে গিয়ে আমাদের হতাশ হতে হল। কারণ তারপর থেকে পীচের রাস্তা শুরু হয়েছে। পায়ের ছাপ সে পর্যন্ত গিয়ে মিলিয়ে গেছে। হোমস, হ্রদের ধারে গিয়ে পায়ের ছাপ মিলিয়ে যাওয়ায় আমাদের তখনকার মানসিক পরিস্থিতির কথা আশাকরি

অবশ্যই ধরতে পারছ ?

লোক পাঠিয়ে জেলেদের ডেকে আনা হল। জাল নিয়ে জল তোলপাড় করল। বৃথা চেষ্টা। শেষ পর্যন্ত হতাশ হতেই হল। মৃতদেহটাকে উদ্ধার করা গেল না। আরও কিছুক্ষণ জেলেরা হ্রদের জলে দাপাদাপি করে জালে তুলল একটা অবিশ্বাস্য অবাঞ্ছিত জিনিস।

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার প্রাক্তন সুভানুধ্যায়ীটির মুখের দিকে তাকালাম।

সে বলে চলল - 'হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য ব্যাপারই বটে। জালে উঠল একটা কাপড়ের পুটুলি। তার মধ্যে ছিল জং-ধরা এক টুকরো ধাতু, ধূসর রঙের কয়েকটা পাথরের টুকরো আর কয়েকটা স্ফটিকের ছোট-বড় টুকরো।

তারপর চারদিকে লোকজন লাগিয়ে সাধ্যমত তল্লাসি চালানো হল। সবই বিফলে গেল। পুলিশ কম চেষ্টা করেনি। তারাও ব্যাপারটা নিয়ে ভাবিত ও বিস্মিত। শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে তোমার শরণাপন্ন হলাম।'

ডাক্তার ওয়াটসন, আশাকরি অনুমান করতে পারছ, কী অসীম ধৈর্য ও মনোযোগের সঙ্গে আমি তার কথা শুনেছিলাম। আর তার টুকরো ঘটনাগুলোকে জোড়া দিয়ে দিয়ে একটা সূত্র খুঁজে বের করার চেষ্টায় আত্মোনিয়োগ করেছিলাম।

ব্যাপারটা দাঁড়াল, খানসামা ব্র্যাণ্টন উধাও, পরিচারিকা র‍্যাশেল বেপাত্তা। পরিচারিকা খানসামাকে ভালবাসত! পরবর্তীকালে তাকে ঘৃণার চোখে দেখত। তার ধমনীতে ওয়েলসীয়দের রক্ত। ফলে সে খুবই রগচটা। তারই ফল স্বরূপ অদ্ভূত সব জিনিসপত্র কাপড়ে পোঁটলা বেঁধে হ্রদের জলে ছুঁড়ে দিয়েছিল। কাজ করার সময় এগুলোকে মাথায় রাখতে হবে। আবার এ-ও মনে রাখতে হবে এদের কোনটাই আসল ব্যাপার নয়। ঘটনার সূত্রপাত কোথায় খুঁজে বের করতে পারলেই শেষ পরিণতি চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে।

আমি বন্ধুটিকে বললাম—'দেখ, চাকরি খোয়া যেতে পারে ভেবেও খানসামা যে কাজটাকে পড়ার ঝুঁকি নিয়েছিল সেটা একবারটি আমার দেখা দরকার।'

'—দেখ, আমাদের সে-অনুষ্ঠানটা বাস্তবিকই একটা অযৌক্তিক ব্যাপার। তার একটা নকল আমার কাছে রয়েছে। তুমি চাইলে আমি

দিতে পারি।'

হোমস এবার বলল—'ওয়াটসন, এই কাগজটাই সে আমাকে দিয়েছিল। আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি, শোন—

'—কার ছিল এটা? যে চলে গেছে তার।' 'কে পাবে এটা? যে আসবে।' কোন্ মাস ছিল? প্রথম থেকে ষষ্ঠ।' 'সূর্য তখন কোথায় ছিল? ওক গাছের শীর্ষে। 'ছায়া ছিল কোথায়? দেবদারু গাছের তলায়। 'কি করে এসেছিল? উত্তরে দশ ও দশ, পূর্বে পাঁচ ও পাঁচ, দক্ষিণে দুই ও দুই, পশ্চিমে এক ও এক। এবং নীচেও তাই।' 'আমরা এর বিনিময়ে কি দেব? আমাদের যা কিছু আছে সবই।' 'কেন দিতে যাব? নির্ভরতার জন্য।'

আমার পাঠ শেষ হলে ম্যাসগ্রেভ এবার বলল—'হোমস আসল কাগজটায় কোন তারিখ ব্যবহার করা হয় নি। তবে বানান দেখে ধরে নিতে অসুবিধে হয় না সতের শতকের মধ্যভাগে সেটা লেখা হয়েছিল। তবে আকস্মিক রহস্যটার হিল্লে করতে গিয়ে এ-কাগজটা তোমার কোন উপকারে আসবে বলে আমার মনে হয় না।'

'—তবে একটা রহস্য ত পাওয়া গেল। আর এটা গোড়া থেকেই বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে। আবার একটার সমাধান করতে পারলে অন্য রহস্যটার হিল্লে করতে বেগ পেতে হবে না। আমার অপরাধ নিও না, তোমার পূর্বসূরীদের চেয়ে খানসামা ব্রাণ্টন কিন্তু বেশী চালাক।'

'—কথাটা আমার মাথায় আসছে না, হোমস। অনুষ্ঠানের এ-কাগজটা রহস্যটার সমাধানের ব্যাপারে কি কাজে লাগবে, জানতে পারি কি?'

'—আমি তবু বলব, কাগজটার গুরুত্ব আমি যতটা বুঝছি ব্রাণ্টনও ঠিক ততটাই আকর্ষণীয় বলে মনে করেছিল। তোমার হাতে সে রাত্রে ধরা পড়ার আগেই সে কিন্তু কোন না কোনভাবে সেটা দেখার সুযোগ পেয়েছিল।

'—তা-ত হতেই পারে। কারণ কাগজটাকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে না করায় সেটাকে গোপনে রক্ষণা বেক্ষণের চিন্তাও কোনদিন করিনি আমরা।'

'—তুমি ত বললে, তার হাঁটুর ওপর একটা কাগজ ছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ, বলেছিই ত। সেটাকে গভীর মনোযোগসহকারে দেখছিল।'

'—আমার মন বলছে, সেটা ছিল কোন মানচিত্র বা চার্ট। আর সেটার সঙ্গে ড্রয়ার থেকে বের করা অনুষ্ঠান সূচীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল। ঠিক তখনই তুমি দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়। ব্যস, চোখের পলকে সেটাকে পকেটে চালান দিয়ে দিল।'

'—সবই বুঝলাম। কিন্তু আমাদের পারিবারিক অনুষ্ঠানের কাগজটা তার কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে? কতগুলো অর্থহীন বাক্যের একত্র সমাবেশ। এগুলোর অর্থ ত কিছুই আমার মাথায় আসছে না হোমস।'

'—তার অর্থ সহজেই বের করে নেওয়া যাবে। চল, সাসেক্স যাবার প্রথম ট্রেনটা ধরি।'

আমি বন্ধুবর ম্যাসগ্রেভ-এর সঙ্গে হার্লস্টোনে পেঁছিলাম। ইংরেজী বড় হাতের 'L' অক্ষরের মত বাড়িটার ঢঙ। বাড়ির সদর-দরজায় ষোল শ' সাত বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে দেখলাম। বাড়িটার পাথর ও কড়ি-বড়গা দেখে বিশেষজ্ঞরা বলেন, এটা আরও অনেক বেশী পুরনো। বাড়ির তিনদিক ঘিরে ফলের বাগান। আর সামনের দিকে দেশী ও বিদেশী ফুল গাছের বিচিত্র সমারোহ। পিছনের দিকে, বাগানটা পেরিয়েই সুন্দর একটা হ্রদ।'

এ পর্যন্ত বলে, হোমস পকেট থেকে পাইপ বের করল। তাতে তামাক পুরে অগ্নিসংযোগ করল। এক গাল ধোঁয়া ঘরময় ছড়িয়ে দিয়ে এবার বলল 'ডাক্তার ওয়াটসন, আমি গোড়ায় ভেবেছিলাম, এর মধ্যে একটামাত্র রহস্য রয়েছে। কিন্তু আসলে যে তিন-তিনটে ভিন্ন ভিন্ন রহস্য লুকিয়ে রয়েছে ভাবতেই পারি নি। আমি ম্যাসগ্রেভ পরিবারের অনুষ্ঠান লিপিটার প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করতে পারলে খানসামা ব্র্যাণ্টন এবং পরিচারিকা র‍্যাশেল-এর প্রকৃত উদ্দেশ্যটা ধরে ফেলতে পারব। আমি প্রথমেই ভাবতে বসলাম, ব্র্যাণ্টন কেন ম্যাসগ্রেভ পরিবারের অনুষ্ঠান-লিপির অর্থ উদ্ধারে প্রয়াসী হ'ল? সিদ্ধান্তে পেঁছিলাম, অনুষ্ঠান লিপিটার মধ্যে সে এমন কোন বিশেষ অর্থের গন্ধ পেয়েছে ম্যাসগ্রেভ বংশের কেউ যার হদিস আজ পর্যন্ত পায় নি। তার তা দিয়ে সে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করতে পারবে। কিন্তু কি তার গূঢ় অর্থ? আর কিভাবেই বা এটা তার ভাগ্যের চাকা ফেরাতে পারবে? আমি কাগজটা পড়ে বুঝতে

পেরেছিলাম, লিপিগুলোর মধ্যে বিশেষ একটা স্থানের উল্লেখ রয়েছে! সেটাকে বের করতে পারলে বুঝতে পারব, ম্যাসগ্রেভ বংশের পূর্বসূরীরা কোন রহস্যকে একটা বিচিত্র অনুষ্ঠানের পবিত্রতার অন্তরালে লুকিয়ে রাখতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

পাইপে পর পর দু'-তিনবার টান দিয়ে মিঃ হোমস এবার বলল—'এবার ভেবে দেখ ডাক্তার, প্রথমেই আমরা দুটো নির্দেশ পেয়ে গেছি। তাদের একটা দেবদারু গাছ আর দ্বিতীয়টা ওকগাছ। তাদের বাড়ির সামনেই বিশাল একটা ওক গাছ পেয়ে গেছি। বহু পুরনো গাছ। গাছটার নীচে দিয়ে যাবার সময় আমি বন্ধু ম্যাসগ্রেভকে জিজ্ঞেস করলাম—অনুষ্ঠান-লিপির কাগজটা লেখার সময়ে ওক গাছটা কি এখানে ছিল?' আমার বন্ধু উত্তর দিল, হয়ত। নর্মান বিজয়ের সময়েও গাছটা এখানে ছিল। মাপলে দেখবে, এর গাড়ির ঘের তেইশ ফুট।' আমি একটা পয়েন্ট হাতের মুঠোয় পেয়ে মনে মনে পুলকিত হলাম। এবার তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, তোমাদের কি এরকম প্রাচীন কোন দেবদারু গাছ আছে?'

আমার বন্ধুটি বিষণ্ণমুখে বলল—'ঐ যে, ঐখানে বহু পুরনো একটা দেবদারু গাছ ছিল বটে। বাজ পড়ে মরে গেছে। গুড়িটা মাটির নীচে রয়ে গেছে।'

আমাকে নিয়ে সে দেবদারু গাছের গুড়িটা দেখাবার জন্য অদূরবর্তী মাঠে নিয়ে গেল। পথে যেতে যেতে সে আমাকে বলল—'গাছটা যেমন মোটা ছিল, উঁচুও ছিল ঠিক তেমনি। চৌষট্টি ফুট উঁচু ছিল। তার শীর্ষদেশ দেখতে হলে মাথার পিছনদিকটা পিঠে ঠেকে যেত।'

'—কিন্তু চৌষট্টি ফুটই যে ছিল' কম-বেশী নয়—কি করে বুঝলে?'

'—আমার গৃহ-শিক্ষক ত্রিকোণমিতি অঙ্ক ও উচ্চতা পরিমাপের পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন। তার ফলে আমি বাগানের সব গাছের উচ্চতা পরিমাপ করে ফেলেছিলাম। আসলে এতে খুবই মজাই পেতাম আমি।

ঠোঁট থেকে পাইপটা নামিয়ে হোমস এবার বলল—'বুঝলে ওয়াটসন একেই বলে বরাতের ছোঁয়া, অপ্রত্যাশিত ছোঁয়া। একের পর এক প্রমাণপত্র আমার হাতে এসে যেতে লাগল। আমি এবার বন্ধু ম্যাসগ্রেভকে প্রশ্ন করলাম—'ভেবে দেখ ত, তোমার খানসামা ব্রাণ্টন কোনদিন তোমাকে এরকম কোন প্রশ্ন করেছিল কিনা? ম্যাসগ্রেভ চোখের তারায় বিস্ময়ের

ছাপ এঁকে বল্‌ল—'আমাদের সহিসের সঙ্গে এ-ব্যাপারে তার একবার জোর কথা কাটাকাটি হয়েছিল। তখন সে আমার শরণাপন্ন হয়েছিল।' বন্ধুর কথায় আমার মনে নতুন করে খুশির ঝিলিক খেলে গেল। আমি সঠিক পথই অনুসরণ করে চলেছি, বুঝতে পারলাম—

ফিরে এলাম ওক-গাছটার কাছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্য সে-গাছটার মাথার ওপরে উঠে গেল। কাগজে বর্ণিত দেবদারু গাছের ছায়ায় বলতে ছায়ার শেষ প্রান্তকেই বুঝাচ্ছে। এবার দেখতে হবে, সূর্য ওক গাছের ছায়া ছাড়িয়ে যাবার পর দেবদারু ছায়া কোথায় গিয়ে পড়তে পারে।'

আমি বল্‌লাম—'দেবদারু গাছটার অস্তিত্বই ত নেই, ছায়া পাবে কোথায়?'

'—হ্যাঁ, কাজটা কঠিন, সন্দেহ নেই। তবে এটুকু অতন্তঃ আমার মনের জোর ছিল, খানসামা ব্র্যাণ্টন যদি পেরে থাকে আমি কেন পারব না? যাক, আমি একটা কাঠের গোঁজ তৈরি করে নিলাম। তাতে একটা লম্বা দড়ি বেঁধে নিলাম যার এক গজ বাদে বাদে গিঁট দেয়া। এবার একটা মাছধরা ছিপের ডগায় সেটাকে বেঁধে নিলাম। ওক-গাছের ছায়াটা মেপে দেখলাম, ন'ফুট তার দৈর্ঘ্য। সোজা হিসেব। ছ'ফুট লাঠির ছায়ার দৈর্ঘ্য যদি ন'ফুট হয় তবে চৌষট্টি ফুট গাছের ছায়া ছিয়ানব্বই ফুট হবে। এবার তা মেপে দেখলাম, আমি প্রায় বাড়ির দেয়ালে পেঁছে এবার কাঠের গোঁজটাকে সেখানে গেঁথে দিলাম। গোঁজটার ঠিক দু'ইঞ্চি ওপরে একটা নীচু জায়গা আমার চোখের ওপরে ভেসে উঠল। আমার বুকের ভেতরে তখন এক অনাস্বাদিত আনন্দের জোয়ার বয়ে চলেছে ওয়াটসন। বুঝতে অসুবিধে হল না, ব্র্যাণ্টনই মেপে চিহ্নটা করে রেখে ছিল। তারপর কি করলাম শোন—এবার দেয়াল বরাবর হেঁটে প্রতি দশ পা দূরে দূরে একটা করে গোঁজ পুঁতে দিতে লাগলাম। এভাবে মেপে-মেপে একেবারে চৌকাঠের কাছে পেঁছে গেলাম। আবার অনুষ্ঠান মন্ত্রটা মনে মনে আওড়ে নিলাম। পশ্চিম দিকে দু'পা, অর্থাৎ পাথরের রাস্তা ধরে দু'পা এগোতে হবে। তবেই নির্দিষ্ট স্থানে পেঁছে যাব।

আমার বন্ধুবর ম্যাসগ্রেভ কাগজটা বের করে বলল—'হোমস দেখ, এখানে লেখা রয়েছে, 'আর তাই নীচে।' তুমি এটুকু বাদ দিয়েছো।'

ম্যাসগ্রেভ-এর কথায় আমার ভুল বুঝতে পারলাম। এবার উল্লসিত হয়ে বল্‌লাম, তবে এর নীচে অবশ্যই কোন ছোট ঘর রয়েছে, ঠিক কিনা ?'

'—হ্যাঁ। এ-বাড়িটা যখন তৈরী করা হয়েছিল তখনই ভূগর্ভস্থ ছোট ঘরটা তৈরী করা হয়েছিল। এই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেই সিঁড়ি বেয়ে নীচের সে-ঘরে যাওয়া যায়।'

আমরা ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নীচের অন্ধকার ঘরটায় পেঁছে গেলাম। ম্যাসগ্রেভ দেশলাই জ্বালল। বুঝলাম, আমাদের অব্যবহিত আগেও কেউ না কেউ এখানে এসেছিল। কাঠকুটোর ঘর এটা। মাঝখানের কাঠের টুকরোটা সরিয়ে পরিষ্কার করা দেখলাম। মরচে ধরা লোহার রিং লাগানো বেশ বড়সড় একটা পাথরের চাঁই সেখানে রয়েছে। একটা পশমের গলা-বন্ধ দিয়ে সেটা জড়ানো।

গলাবন্ধটা দেখেই আমার বন্ধু ম্যাসগ্রেভ রীতিমত হায় হায় করে উঠল - একী! এটাত আমার খানসামা ব্র্যাণ্টন-এর গলাবন্ধ! শয়তানটার এখানে কি দরকার ছিল! হায় ঈশ্বর! একী—।

'ঈশ্বরকে পরে ডাকলেও চলবে, আপাতত পুলিশ ডাকা দরকার ম্যাসগ্রেভ।'

দু'জন সশস্ত্র পুলিশ চেয়ে থানায় খবর পাঠানো হ'ল। আমরা দুজনে টানাটানি করে পাথরটাকে সরাতে চেষ্টা করলাম। পারলাম না। পুলিশ এলে তাদের সাহায্যে পাথরটাকে সরানো গেল। একটা সুড়ঙ্গের মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল। ভেতরে জমাট বাঁধা অন্ধকার। ম্যাসগ্রেভ হাতের লন্ঠনটা সুড়ঙ্গের ভেতরে নামিয়ে দিল। চার বর্গফুট মাপের একটা ঘর দেখা গেল। তার গভীরতা ফুট সাতেক হবে। তার একপাশে পেতলে মোড়া একটা কাঠের বাক্স নজরে পড়ল। ওপরের দিকে একটা আংটা। তার গা থেকে একটা চাবির অংশবিশেষ বেরিয়ে রয়েছে। বাক্স-টার ভেতর থেকে কয়েকটা চাকতির মত ধাতুর টুকরো পাওয়া গেল। পুরনো আমলের মুদ্রা সেগুলো। ব্যস, আর কিছু নয়।

আচমকা আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। বাক্স বা মুদ্রা সব কিছু মুহূর্তে আমাদের মন থেকে মুছে গেল। পাশে পড়ে থাকা একটা বস্তু আমাদের সব চিন্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে এল। কালো স্যুটপরা একটা মানুষকে মরে কুঁকড়ে পড়ে থাকতে দেখলাম। হাঁটুর উপর উপুড় হয়ে পড়ে।

হাত দুটো বাক্সটার দু'পাশে ছড়ানো। আমার বন্ধুর বুঝতে দেরী হল না, হতভাগ্যটা তারই খানসামা ব্র্যাণ্টন। কদিন আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! তার গায়ে কোন ক্ষতের চিহ্নমাত্রও নেই।

খানসামা ব্র্যাণ্টন-এর মৃতদেহটা তুলে এনে রহস্যটার মীমাংসার জন্য চেষ্টা করতে যাব অমনি আর একটা রহস্য আমার চোখের সামনে হাজির হ'ল।

ওয়াটসন, অনুষ্ঠান-লিপির বক্তব্য অনুসরণ করে যা পেলাম তাতে আমাকে হতাশই হতে হল। ভেবেছিলাম, উক্ত কাগজে উল্লিখিত স্থানটার সন্ধান পেলেই রহস্যটারও সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু এমন কঠিন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমার বন্ধুটির পূর্বসূরীরা এমন কোন মূল্যবান সামগ্রী লুকিয়ে রেখেছিল, তার হদিস ত পাওয়া গেল না। তবে খানসামা ব্র্যাণ্টন-এর অন্তিম অবস্থার হিল্লে করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু কি করে তার মৃত্যু হ'ল? পরিচারিকাটিই বা গেল কোথায়? এতে তার কি ভূমিকা ছিল, জানা গেল না। ওয়াটসন, আমি আমার পুরনো পদ্ধতি অনুযায়ী নিজেকে খানসামা ব্র্যাণ্টন-এর জায়গায় দাঁড় করালাম। ভেবে দেখলাম, ব্র্যাণ্টন জানতে পেরেছিল মূল্যবান কোন না কোন দ্রব্য এখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। জায়গাটা বের করল বটে, কিন্তু বিশালায়তন পাথরটাকে সরানো সম্ভব হ'ল না। বাইরের কোন সাহায্য সহযোগিতা নিতে হলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ভেতর থেকেই কারো সাহায্য নিতে হবে। পরিচারিকা র‍্যাশেল-এর সঙ্গে প্রেম জমাল। ভাবল তাকে নিয়ে পাথরটা সরিয়ে ফেলতে হবে। আসলে বিশালায়তন পাথরটা দু'জনের পক্ষেও যে সরানো সম্ভব নয়, গোড়ায় এটা ভাবে নি মোটেই। তারা দু'জনে অন্ধকার ঘরটায় যায়। পাথরটাকে তুলতে না পেরে পাথরটার ফাঁকে মোটা শক্ত একটা কাঠের টুকরো ঢুকিয়ে দিয়ে শরীর ঢোকার মত একটা রাস্তা তৈরী করে নিল। এবার খানসামা ব্র্যাণ্টন সে পথে নীচে নেমে গেল। আর পরিচারিকা র‍্যাশেল রয়ে গেল ওপরে। ব্র্যাণ্টন এবার বাক্সটার তালা খুলল। তার ভেতর থেকে চাকতির মত মুদ্রাগুলো বের করল। আর ভেতরের জিনিসগুলো পরিচারিকাকে দিল, নইলে মুদ্রাগুলো কি করে বাইরে পড়ল। এবার ধরা যাক, ব্র্যাণ্টন কি করে ছোট্ট অন্ধকার ঘরটায় আটকা

পড়ল, তাই না? ব্যাপারটা মোটামুটি এরকম। এমনও হতে পারে, ঈর্ষার জন্য পরিচারিকা কাঠটা সরিয়ে পাথরটা ফেলে ঘরে ঢোকার পথটা বন্ধ করে দিয়েছিল, নতুবা অসতর্কতা বশতঃ কাঠটা থেকে পাথরটা হড়কে পড়ে গিয়েছিল। যে করেই হোক খানসামা র‍্যাণ্টন অন্ধকার ছোট্ট ঘরটায় আটকা পড়ে দম বন্ধ হয়ে মারা পড়ে। পরিচারিকা র‍্যাণ্টনের হাত থেকে পাওয়া জিনিসগুলো নিয়ে সেখান থেকে চম্পট দিল। তার পরই নিজের কৃতকর্মের কথা স্মরণ করে সে উন্মাদিনীর মত হয়ে যায়। বিকারগ্রস্ত রোগীর মত প্রলাপ বকতে থাকে। আমার বন্ধু ম্যাসগ্রেভ জেলে লাগিয়ে পোঁটলা তুলে যেসব জিনিস তুলেছিল সেগুলো হয়ত পরিচারিকা বাক্সটা থেকেই পেয়েছিল। যা-ই হোক, মেয়েটার বিকারের কারণ হিসেবে এ-কারণগুলোর উল্লেখ করা যেতে পারে।

ম্যাসগ্রেভ ছোট্ট ঘরটার সে-বাক্সটার পাশে পড়ে থাকা মুদ্রাগুলোর দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বল্‌ল—এগুলো প্রথম চার্লস-এর আমলের মুদ্রা।' আমি উল্লসিত হয়ে বল্‌লাম—'ম্যাসগ্রেভ, প্রথম চার্লস-এর আরও জিনিস আমরা পেলেও পেতে পারি। হ্রদ থেকে উদ্ধার করা পোঁটলাটার জিনিসগুলো আমি একবারটি দেখতে চাই।'

ম্যাসগ্রেভ আমাকে নিয়ে তার বৈঠকখানায় গেল। শ্যাওলা পড়া জিনিসগুলোর একটাকে নিয়ে কোটের ওপর বার করেক ঘষতেই ঝকমকিয়ে উঠল।'

বন্ধুবর ম্যাসগ্রেভ বল্‌ল—'আমাদের পূর্বপুরুষ স্যার র‍্যালফ একজন সুদক্ষ অশ্বারোহী যোদ্ধা ছিলেন। এবং দ্বিতীয় চার্লস-এর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন।'

আমি মুচকি হেসে বল্‌লাম—'এবারই সে-প্রমাণ আমরা পেতে চলেছি বন্ধু। তুমি এমন এক অমূল্য সম্পদ পাচ্ছ যার মূল্য দু'দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক মূল্যের সঙ্গে ঐতিহাসিক গুরুত্বও এর যথেষ্ট। অনুষ্ঠান-লিপির কথাগুলো স্মরণ কর—'কার ছিল এটা? তার যে চলে গেছে।' কার কথা বলা হয়েছে? রাজা চার্লসের কথা। এবার পরবর্তী ছত্রে কি আছে? কে পাবে এটা সে-ই পাবে যে আসবে। এতে দ্বিতীয় চার্লস-এর ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় চার্লস-এর কথা তখনই অনুমান করা হয়েছিল। এটা দুমড়ে মুচড়ে গেলেও বোঝা যায় একটা মুকুট ছিল এক সময়। আর এটা স্টুয়ার্ট রাজাদের ছিল। পরে রাজা চার্লস-এর

হাতে আসে।

'—ভাল কথা। কিন্তু রাজা চার্লস-এর প্রত্যাবর্তনের পর এটা আবার অবশ্যই তাঁর হস্তগত হওয়া উচিত ছিল।

'—খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বটে। তবে ব্যাপারটা এমনও হতে পারে ম্যাসগ্রেভ পরিবারের গোপন তথ্যাদি যিনি জানতেন ইতিমধ্যে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তিনি যোগ্যপাত্র হাতের কাছে না পেয়ে কৌশলে বংশধরদের জন্য এ-অমূল্য সম্পদ রেখে যান। কাহিনী শেষ করে হোমস নিভে যাওয়া পাইপটার ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বল্‌ল—'ডাক্তার ওয়াটসন্‌, ম্যাসগ্রেভ পরিবারের অমূল্য সম্পদ সে-মুকুটটা এখনও হার্লস্টোন প্রাসাদে রক্ষিত আছে। সুযোগ পেলে গিয়ে দেখে এসো। আর সে-পরিচারিকাটি? তার খোঁজ আর পাওয়া যায় নি। এমনও হতে পারে, সমুদ্র পাড়ি দিয়ে অন্যকোন দেশে চলে গেছে।

সমাপ্ত

Collect More Books >
From Here